প্রথম প্রকাশ : ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

প্রকাশ করেছেন :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা-১
বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ এঁকেছেন :
কালাম মাহমুদ

ছেপেছেন :
মোঃ মোবারক আলী
প্যারামাউণ্ট প্রেস
৯, হাটখোলা রোড
ঢাকা-৩

উৎসর্গ

শামসুর রাহমান
হাসান হাফিজুর রহমান

অগ্রজপ্রতিমেষু

লেখকের অন্যান্য বই

জুলেখার মন (কাব্যগ্রন্থ)
অন্ধকারে একা (কাব্যগ্রন্থ)
রক্তিম হৃদয় (কাব্যগ্রন্থ)
আপন ভুবনে (কাব্যগ্রন্থ)
সমকালীন সাহিত্যের ধারা
বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য
মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ
নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ
নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা
সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাতীয়তা

প্রসঙ্গ-কথা

'কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা' কবিতাবিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সংগ্রহ। অধিকাংশ প্রবন্ধই গত পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে লেখা এবং বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। 'নাটক ও কাব্যনাটক' এবং 'কবি ও পাঠক' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটি অবশ্য পনেরো-ষোল বছর আগে লেখা এবং সে-সময়েই সাহিত্য-পত্রে প্রকাশিত।

সাময়িকপত্রের অনুরোধেই বিভিন্ন সময়ে প্রায় একই বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। তাই, পরিপ্রেক্ষিত এবং দৃষ্টিকোণের ভিন্নতা সত্ত্বেও, বর্তমান সংগ্রহেও লক্ষ্য করা যাবে বিষয় এবং ভাষার কিছুটা পুনরাবৃত্তি।

এ-বই প্রকাশে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন কবি-বন্ধু আবদুস সাত্তার এবং অনুজপ্রতিম কবি, কথাশিল্পী ও প্রবন্ধকার আহমদ ছফা। এঁদের উদ্যোগ এবং 'মুক্তধারা'র স্বত্বাধিকারী শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহার আগ্রহেই বইটি প্রকাশিত হলো। প্রচ্ছদচিত্র এঁকেছেন শিল্পী কালাম মাহমুদ। এঁদের সবার কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

সূচি

কবিতা : ভাষা ও ছন্দ/১
উৎস থেকে, উৎসে ফেরা/৪২
কবিতা ও অভিজ্ঞতা/৫১
কবিতা : দেশ ও সমাজ/৫৫
কবিতা ও স্বাদেশিক পটভূমি/৬৫
'বৈশাখ' এর কবিতা/৭০
সাহিত্যে প্রভাব ও পরিগ্রহণ/৭৬
কবিতায় শব্দ/৮২
সনেট ও চতুর্দশপদী/৮৮
নাটক ও কাব্য নাটক/১০২
যন্ত্র ও শিল্প/১০৯
কবি ও পাঠক/১১৭
বাংলা কাব্যে বিদ্রোহের সুর/১২৪
মধুসূদন : প্রথম আধুনিক/১২৯
মাইকেলী অমিত্রাক্ষর/১৩৭
কবিতায় গ্রামীণজীবন/১৪৪
শুদ্ধতম কবি : সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা/১৫২

কবিতা : ভাষা ও ছন্দ

কোনো কবির পক্ষেই—তা তিনি যত প্রতিভাধর এবং মৌলিক সৃজন-ক্ষমতাসম্পন্নই হোন না কেন, কবিতার জন্যে কোনো মৌলিক বিষয়ের আবিষ্কার বা সৃষ্টি সম্ভব নয়। যদিও একথা সত্য যে, 'কবিতার জন্যে বিষয়' বলে আলাদা কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, কেননা কবির সৃজনক্ষমতা ও বিষয়-আহরণের প্রবণতা এবং মানস-সজাগতার ফলে যে-কোনো বিষয়ই কবিতা রচনার উপকরণে পরিণত হতে পারে। কিন্তু এ সত্ত্বেও, কবিতার বিষয় কিম্বা কবিতা-জননের উপযোগী অভি-জ্ঞতা বলে কোনো স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা থাকতে পারে কিনা এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে; তবুও একথা সত্য যে, যে-কোনো বিষয় বা অভিজ্ঞতাই কবিতা সৃষ্টির উৎস হতে পারে যদি সেই অভিজ্ঞতার অধিকারীর কবিতা-জননের অন্তর্নিহিত শক্তি থাকে। অভিজ্ঞতাকে কবিতায় পরিণত করার যে শক্তি ও প্রক্রিয়া তা কবির নিজস্ব, এবং এই শক্তি ও প্রক্রিয়া সকল কবির সমানুপাতিক কিংবা একই চারিত্র্যের নয়। চারিত্র্যের ভিন্নতার দরুন কবিশক্তিরও তারতম্য ঘটে এবং সেই অনুসারেই অভিজ্ঞতা নবতর অভিব্যক্তির মাধ্যমে যথার্থ কাব্যে পরিণত হয়েছে কিনা তা বিচার্য হয়ে দাঁড়ায়।

শিল্পবেত্তাদের মতে, মানুষের অভিজ্ঞতাই কবিতার উপাদান। অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করেই কবিতা গড়ে ওঠে। কিন্তু অভিজ্ঞতা মাত্রই কবিতা নয়, অভিজ্ঞতার রূপময় অভিব্যক্তিই কবিতা। কারণ, কোনো না কোনো অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই থাকে, কিন্তু অভিব্যক্তি থাকে না, রূপময় অভিব্যক্তি তো নয়ই। অভিব্যক্তিহীন উপলব্ধি কিংবা অভিজ্ঞতা এ-কারণেই তাৎপর্যরহিত। সব অভিজ্ঞতা অবশ্য সকল মানুষকে সমভাবে অনুপ্রাণিত, উত্তেজিত কিম্বা প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ করে তোলে

না। কি ধরনের অভিজ্ঞতা কোন্ ধরনের মানুষকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করবে এবং তার অভিব্যক্তিই বা হবে কোন্ চারিত্র্যের তা নির্ভর করে ব্যক্তি-মনের গড়নের উপর, অভিজ্ঞতার আহ্বানে সাড়া দেবার মানস-সজাগতার উপর।

ব্যক্তি-মনের এই বিশেষ গড়নের এবং তার মানস-সজাগতার নিরিখেই বিচার করে দেখতে হয় কবিতার বিষয় বা কবিতা জননের উপযোগী অভিজ্ঞতা হিসাবে কোন কোন ভাব বা বক্তব্য কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ভাব বা বিষয় নির্বাচনের এই প্রাধান্যের আলোকে বিচার করেই এক একজন কবিকে এক একটি বিষয়ে বক্তব্যের বাহক, ভাবের প্রচারক কিংবা অভিজ্ঞতার রূপকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু, এ-সত্ত্বেও, এ সত্য অনস্বীকার্য যে, কোনো কবির রচনাতেই কোনো ভাব, বক্তব্য বা অভিজ্ঞতা একেবারে মৌলিক চারিত্র্যে উপস্থাপিত এবং শিল্পিত হয় না, কেননা কবিমাত্রেই মানব-প্রবৃত্তির অথবা আরও ব্যাপকতর অর্থে মানব-স্বভাবের কয়েকটি মৌল প্রবণতার রূপকাব মাত্র। জীবন-মৃত্যু, প্রেম-বিরহ, হাসি-কান্না, স্নেহ-ভালোবাসা, আর্তি-আকুলতা ইত্যাদি কয়েকটি মানবিক প্রবৃত্তি এবং জীব-জীবনের পরিণতিই, নানাভাবে কাব্যে—বলতে গেলে সব শিল্পেই অভিব্যক্তি লাভ করে। এসব মানবিক প্রবণতা এবং মানব-স্বভাবের অন্তর্নিহিত এষণা অনাদিকাল থেকেই বিভিন্ন শিল্পে বিভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে। ব্যক্তি-জীবন, সামাজিক-জীবন ও মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিস্তৃতিব সাথে সাথে এসবের অভিব্যক্তি বা শিল্প-রূপের রূপভেদ ঘটেছে মাত্র। সমাজ-মন ও ব্যক্তি-মনের রূপকার কবির মানসিক প্রবণতা ও মানস-সজাগতার ভিন্নতার দরুন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাব্যরূপায়ণের পরিধি হয়েছে বিস্তৃত অথবা সীমাবদ্ধ। এভাবে কাব্যে বিধৃত ভাব, বক্তব্য কিংবা অভিজ্ঞতার চারিত্র্য বিশ্লেষণ করে দেখলে স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায় যে, কবিতার বিষয় বলে আদপেই কোনো মৌলিক বিষয নেই, থাকতে পারে না। আসলে কবিতার বিষয়, ভাব, বক্তব্য কিংবা অভিজ্ঞতার যে মৌলিকতা তা মূলত তার শিল্পরূপেরই মৌলিকতা। শিল্পরূপের এই মৌলিকতার দরুনই বহু ব্যবহৃত বিষয়ও কবিতায় নতুনত্বের মহিমা ও ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়,

চিরপুরাতন হয়ে যায় চির-নতুনের ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এখানেই আসে অভিজ্ঞতার রূপময় অভিব্যক্তির প্রশ্ন।

কবি তাঁর অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে তাকে অভিব্যক্তিময় এবং আকর্ষণীয় করে তোলেন। কবিতা শুধু শব্দ দিয়ে রচিত হয় না, কবিতার জন্যে ভাব এবং বক্তব্যেরও প্রয়োজন, হয়তো সে ভাব অস্পষ্ট, অনভিব্যক্ত কিংবা জটিলতায় আক্রান্ত হতে পারে, হতে পারে ম্লান ও ধূসর। কিন্তু কবিতা রচনার জন্যে কোনো-না-কোনো ভাব বা বক্তব্য অবশ্যই চাই। ভাবের এই আশ্রয় কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করবে, না রূপের মহিমা মুখ্য হয়ে উঠবে, তাও নির্ভরশীল কবি-মানস ও কবিতা-জননের বিশেষ প্রক্রিয়ার উপর। এখানেই প্রশ্ন, কবিতা রচনা কি শুধু পরিশ্রমের দ্বারাই সম্ভব, না তার জন্যে গভীরতর কোনো প্রক্রিয়ার প্রয়োজন? অভিজ্ঞতা, ভাব বা বক্তব্য বিষয় কবিতার জন্যে কাঁচা উপাদান মাত্র। এই কাঁচা উপাদানকে পরিশুদ্ধরূপে, নানা কলা-কৌশলে শিল্প-সৃষ্টিতে পরিণত করার জন্যে পরিশ্রম প্রয়োজন; কিন্তু কবিতা সৃষ্টির জন্যে যে ধরনের পরিশ্রম আবশ্যিক তার চরিত্র অন্য সব কিছুর চেয়ে আলাদা। কারণ, শুধু পরিশ্রমই কাব্য-সাফল্যের নিয়ামক নয়, এর জন্যে সৎ অনুভূতি, আবেগ-অনুপ্রেরণা এবং প্রকরণ-গত দক্ষতাও অপরিহার্য। অবশ্য কোন একটি বক্তব্য বা ভাবনাকে উপজীব্য করে শব্দ এবং ছন্দের সহায়তায় কাব্য সৃষ্টি হয়তো সম্ভব, কিন্তু মহৎ শিল্প-সৃষ্টির জন্যে চাই সেই ঐন্দ্রজালিক সৃজন-ক্ষমতা যা সামান্যকে অসামান্যের দ্যোতনা দেয়, চিরপরিচিতকে করে তোলে অপরিচিতের মহিমাময়।

সব কবিই বক্তব্য বা ভাবনা প্রকাশের জন্যে শব্দ ও ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এমনকি সাধ্যমত উপমা-উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টির প্রয়াসেও নিবেদিত হতে দ্বিধা করেন না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টির যে রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক শক্তি তা-কি শুধু শব্দ, ছন্দ এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা রচনার ক্ষমতা আয়ত্তে আনার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব? না, এর জন্যে অধিক কিছু প্রয়োজন? শব্দ-প্রয়োগ, ছন্দো-বৈচিত্র্য সৃষ্টি এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা রচনায় অনেকেই প্রশংসনীয় পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু সবার পক্ষেই সত্যিকার শিল্প-সার্থক কবিতা রচনা সম্ভবপর হয়

না। কারণ, শব্দ, ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা---এর কোনটিই একক বা আলাদাভাবে কবিতা নয়, কবিতার আবশ্যিক অংশ মাত্র। কবিতা বস্তুত এ-সবের সমন্বয়ী শিল্পরূপ---এক ধরনের অভিনব শিল্প-সৃষ্টি।

কাব্যরূপী এই যে শিল্পসৃষ্টি এর যথাযথ আস্বাদন বা উপভোগের জন্যে এর অন্তর্নিহিত শিল্পপ্রকরণ বা আঙ্গিক রূপের স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন, অভিজ্ঞ বা অভিহিত থাকা কোনো অপরিহার্য ব্যাপার নয়, যদিও একথা সত্য যে, শিল্প প্রকরণ বা আঙ্গিকরূপ সম্পর্কে সচেত-তনতা এবং অভিজ্ঞতার অধিকার কাব্য-উপভোগের জন্যে একান্তরূপেই সহায়ক। নিছক রসবোধ, রূপতৃষ্ণা এবং সাহিত্য-পিপাসাও কাব্য-রসোপভোগের জন্যে সহায়ক হতে পারে যদি পাঠকের এ-ব্যাপারে অন্তত অভ্যাসগতভাবে হলেও কাব্যপাঠের পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকে। এই অভিজ্ঞতার অভাবে অনেক সময় পাঠকের পক্ষে কাব্যের অন্তঃপুরে যাত্রা সম্ভব হয়ে ওঠে না, ফলে এর অন্তর্নিহিত রসোপলব্ধিও থেকে যায় তার নাগালের বাইরে। বস্তুত কাব্যে 'কাব্যরস' বলে কোনো বিচ্ছিন্ন আলাদা কিছুর অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারে না, কেননা কাব্যরস তো আসলে এর সামগ্রিক শিল্পরূপকে আশ্রয় করেই জারিত। এ-কারণেই এই রসোপভোগের জন্যে কাব্যের শিল্পরূপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা বা সচেতনতা থাকা প্রয়োজন। সচেতন কিংবা অভিজ্ঞভাবে না হলেও, অন্তত অভ্যাসগতভাবে কবিতার শব্দ, ছন্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাকার উপকরণেব নিজস্ব বিশেষ ভূমিকা এবং শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ-মূল্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা অপরিহার্য। কেননা, এই ধারণার অভাবে অনেক সময় কবিতার সত্যিকার প্রকৃতি এবং শিল্পরূপ সম্পর্কে পাঠকমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম হওয়াও অসম্ভব নয়। ফলত এই বিরূপতা কবিতার শিল্প-সাফল্য সম্পর্কেও জিজ্ঞাসার জন্ম দিতে পারে। এ-কারণেই কবিতায় এবং বিশেষভাবে এর শিল্প-রূপের সার্থকতার ক্ষেত্রে শব্দ বা ভাষা, ছন্দ বা ছন্দোধ্বনির ভূমিকা কি, সে সম্পর্কে ধারণা অর্জন আবশ্যিক।

২

মূলগতভাবে দেখতে গেলে কোনো ধ্বনি নয়, বরং অক্ষর বা অক্ষর সমবায়ে গঠিত শব্দই হচ্ছে কবিতার অভিব্যক্তির মাধ্যম। কিন্তু

একথাও মনে রাখতে হবে যে, নিছক মুখে মুখে প্রচারিত ও আবৃত্ত কাবিতা বা সঙ্গীত অক্ষর-নির্ভর নয়, এর অভিব্যক্তির মাধ্যম একান্ত-রূপেই ধ্বনি-নির্ভর। সে-কারণেই প্রাচীন ও লোকঐতিহ্য-আশ্রিত কবিতা বা গান ধ্বনিকে নির্ভর করেই জনগণের স্মৃতি ও শ্রুতিতে যুগ যুগ ধরে বেঁচে আছে। যেহেতু এসব কবিতা ও গান কেবল কবিতাই নয়, বরং সুরাশ্রিত রূপসৃষ্টি, সে-কারণে গীতিধর্মিতাই এর প্রাণশক্তির অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু সাধারণভাবে কবিতা মাত্রই গীতি-ধর্মী নয়, যদিও সাঙ্গীতিকতা যে-কোন কবিতার জন্যেই অপরিহার্যরূপে আবশ্যক। উল্লেখনীয় যে কবিতার এই সাঙ্গীতিকতা ছন্দো-ধ্বনির সাথেই অপরিহার্য সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত। এবং এও সত্য যে, শুধু শব্দ বা ধ্বনিমাত্রই কবিতা নয়, যখন কোন শব্দ বা ধ্বনি অনেক কয়টি শব্দ ও ধ্বনির সমবায়ে সাঙ্গীতিকতায় ধ্বনি-তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে অবলীলায় স্ফূর্তি লাভ করে, তখনই মাত্র তা কবিতায় রূপান্তরিত হয়। মনে রাখা আবশ্যক যে, শব্দ বা ধ্বনি অনুচ্চারিত অবস্থায়ও অনুভব্য এবং উপভোগ্য হতে পারে। মনে মনে কাব্যপাঠ কিম্বা গীতি-কবিতা আবৃত্তির মধ্যে দিয়েও শব্দ, ধ্বনি এবং সুরের রসাস্বাদ করা যায়, অনুভব করা যায় চেতনার সমগ্রতা দিয়ে। কিন্তু যেভাবেই দেখা হোক না কেন, কবিতার জন্যে শুধু শব্দ নয়, শব্দ-সমবায়ই অপরিহার্যরূপে গুরুত্বপূর্ণ। শুধু একটি মাত্র শব্দ বা ধ্বনির পৌনঃ-পুনিক আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে অবশ্য কোনো অনুষঙ্গ বা আবহ সৃষ্টি করা সম্ভব, কিন্তু বিচিত্রমুখী মনের বৈচিত্র্যময় প্রকাশের জন্যে প্রয়োজন শব্দ ও ধ্বনির বৈচিত্র্য। শব্দ-ধ্বনির এই বৈচিত্র্য কেবল ভাষার আশ্রয়ে এবং শব্দের অনুষঙ্গেই লাভ করা সম্ভব। এ কারণেই শব্দের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই ভাষার আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সাধারণভাবে ভাষা অর্থে মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহৃত ভাষা—যা, তার আত্মপ্রকাশের, মনোভাব জ্ঞাপনের এবং আদান-প্রদানের অবলম্বন, তাই বোঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু কবিতার আলোচনায় যে শব্দ বা শব্দ-সমবায়ে গঠিত ভাষার প্রসঙ্গ আসে তা শুধু প্রতিদিনের এই ব্যবহৃত ভাষাই নয়, বরং ব্যবহৃত অব্যবহৃত কৃত্রিম অকৃত্রিম সচল-অচল আভি-ধানিক-আটপৌরে ইত্যাদি সববিছুই অন্তর্গত হয়। কারণ, কবি শব্দ-

আহরণ, ভাষা-নির্মাণ কিম্বা প্রচলিত ভাষার ব্যবহারে শুধু সচল জীবন-ধারারই আশ্রয়ী হন না, অধিকন্তু মাতৃভাষার শব্দ সম্ভারের ভাণ্ডারেও হাত পাতেন, অভিধানে আশ্রয় নেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তিনি যতখানি শব্দাশ্রয়ী ততখানি ভাষাশ্রয়ী হননা, কেননা মৃত কিম্বা অপ্রচলিত ভাষার শব্দরাজিকে সচল জীবনের ভাষার অনুষঙ্গে স্থাপন করে নতুন অর্থারোপ কিংবা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি সম্ভব, কিন্তু মৃত ভাষার নবপ্রচলন সম্ভব নয়। কারণ, মৃতভাষা প্রধানত পুঁথি-কেতাবেই স্থান নেয়, সচল জীবন-ধারা থেকে তা নির্বাসিত হয়ে যায়। কিন্তু জীবনের জন্যে এভাবে ভাষার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও, সব সময় সাহিত্য-শিল্পের জন্যে তা সম্পূর্ণত ফুরিয়ে যায় না। কেননা, শক্তিমান সাহিত্যিক শিল্পী তাঁদের সৃজনকর্মে অনেক সময় পুরানো কিংবা বাতিল বলে গণ্য—চলমান জীবনের চৌহদ্দি থেকে নির্বাসিত শব্দরাজিকে নিজস্ব ব্যবহার কৌশলে প্রাণবান এবং সঞ্জীবিত করে নেন আলাদাভাবে হয়তো পুরাতন শব্দ-টির কোনো ধ্বনি মাহাত্ম্য, অর্থগৌরব কিংবা ব্যঞ্জনা নেই, কিন্তু সুদক্ষ শিল্পীর হাতে ব্যবহার কৌশলেও, ধ্বনি ও সুরের আশ্রয়ে, ছন্দো-ধ্বনির সহযোগিতায় সেই পুরাতনই নতুনের মহিমায় হয় অভিষিক্ত।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য-শিল্পের ভাষা যত জীবননিষ্ঠই হোক না কেন, তা জীবনের ভাষার হুবহু প্রতিরূপ নয়, অবশ্যই কিছুটা কৃত্রিম। এই কৃত্রিম ভাষা সৃষ্টিতে এবং সে ভাষার ব্যবহারে শিল্পীর ব্যক্তি-প্রতিভা অনেকখানি ভূমিকা পালন করে থাকে। উল্লেখনীয় যে, ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ নিয়ম মেনে, অভিধানে সুবিন্যস্ত শব্দরাজির অর্থ-মাহাত্ম্যের উপর নির্ভর করে জনপদের মানুষ তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্ম-নির্বাহ করে না। যেহেতু তাদের ভাষা অলিখিত ভাষা সে-কারণে তা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং ইতিহাস ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করে। শব্দের পরিবর্তন, সে-সবের অর্থ-মাহাত্ম্যের রূপান্তর এমনকি তা ব্যবহারের কায়দা-কৌশলও প্রায় অলঙ্ঘনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই বিবর্তিত, নব-রূপে বিন্যস্ত এবং সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পারস্পরিক মিলন, ভাবের আদান-প্রদান, চিন্তা ও চেতনার দিগন্তকে যেমন প্রসারিত করে তেমনি তা সম্প্রসারিত করে ভাষা ব্যবহারের পরিধিকে, ঐশ্বর্যপূর্ণ করে তোলে ভাষার ভাণ্ডারকে।

লিখিত ভাষার ব্যবহার এভাবে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে না, ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনা সে-ভাষার নিজস্ব ভাণ্ডার। লিখিত ভাষাকে শব্দরাজি, ব্যবহার রীতি, প্রয়োগপদ্ধতি—ইত্যাদির দিক থেকে বৈচিত্র্যময় এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে চাই সচেতন ব্যবহার। এই ব্যবহার যখন ব্যক্তি-প্রতিভার অবদানে নবতর রূপ লাভ করে, শিল্পরূপময় হয়ে ওঠে, তখনই তা হয় যথার্থ অর্থে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান এভাবেই যুগে যুগে লিখিত ভাষাকে বৈচিত্র্যময় ও ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছে—পরিণত করেছে এক গৌরবময় ঐতিহ্যে।

উল্লেখনীয় যে, কোন একটি ভাষার বিকাশ এবং সমৃদ্ধির ইতিহাস প্রধানত তার কাব্য-সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধিরই ইতিহাস। কারণ, পৃথিবীর সব ভাষাতেই কাব্যের জন্ম হয়েছে আগে, এবং গদ্যের উদ্ভব ঘটেছে তারই পথ ধরে। যেহেতু কাব্যের ভাষা দৈনন্দিন ব্যবহার কিংবা প্রাত্যহিক ক্রিয়া-কর্মের ভাষা নয়, বহু ব্যবহারে তার জীর্ণ ও প্রাণহীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা কম, এবং সর্বোপরি রোমাণ্টিক কল্পনা ও আবেগ অনুপ্রেরণার আশ্রয়ে কাব্যের ভাষাব প্রাণধর্মী সচলতা বজায় রাখার সম্ভাবনা বেশী, সে কারণে, কাব্যের ভাষার মধ্যেই মূলত কোন একটি ভাষার বিকাশের সীমাহীন সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। এখানে ভাষার বিকাশ কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত প্রয়োজন, কেননা কোনো ভাষাই কোনো ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয়, ব্যক্তি সমবায় এবং সেই সূত্রে, সমাজের সমবায়ী প্রচেষ্টার ফলই ভাষা। যেহেতু ভাষা সামাজিক মানুষের সৃষ্টি সে-কারণে সেই সমাজবদ্ধ মানুষের সংগঠনের মূলে যে ইতিহাস-ঐতিহ্য রয়েছে—রয়েছে এক সুপ্রাচীন প্রক্রিয়া তার অন্তরঙ্গ আত্মপরিচয় সেই ভাষার অবয়বে স্বাক্ষরিত। আর এ-সত্যও অনস্বীকার্য যে ব্যক্তিমানসের এবং ব্যাপক অর্থে সমাজমানসের সংগঠনের মূলে নানা কার্য-কারণ-প্রক্রিয়া বর্তমান। তাই ভাষার অবয়বে বিধৃত তারই পরিচয়-চিহ্ন। এই সূত্রেই লক্ষণীয় যে, ভাষা-ব্যবহারে ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক ঐতিহ্যসূত্রে, অপরিসীম বিভিন্নতা। ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক রূপভেদ, আঞ্চলিক বিভিন্নতা এবং ধর্মীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্যধর্মিতা এ সবকিছুই ভাষার অবয়বে এবং

উচ্চারণে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু এই সামগ্রিক পরিচয়-চিহ্নও এক এবং অপরিবর্তনীয় মহিমায় চিরকাল একইভাবে টিকে থাকে না, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বহুবিধ কারণেও পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসমাজের ভাষাও ক্রমান্বয়ে বদলায়। কিন্তু সাহিত্যের ভাষা ব্যক্তি-প্রতিভার অবদানে এবং বলা যেতে পারে—অনেকখানিই সচেতন প্রচেষ্টায়, যত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন ও নতুন অবয়ব লাভ করে—জনসমাজের ভাষা তত দ্রুত বদলায় না। সাহিত্যের আদিশাখা হিসাবে কাব্যের ভাষার অবয়বেই তাই ভাষার পরিবর্তন এবং নতুন অবয়ব লাভের পরিচয়-চিহ্ন বিস্ময়কররূপে বিধৃত। ভাষার এই পরিবর্তন শুধু এর শব্দরূপের পরিবর্তনই নয়, বলা যেতে পারে এর ব্যবহাররীতি এবং সামগ্রিকভাবে প্রয়োগ-কৌশলেরই পরিবর্তন। কারণ, শুধু শব্দই তো ভাষা নয়, ভাষা শব্দাবলীর অর্থপূর্ণ সমন্বয়েরই অন্য নাম। অবশ্য কাব্যের ভাষার জন্যে অর্থপূর্ণতা সবক্ষেত্রেই এর আবশ্যিক অপরিহার্য শর্ত নাও হতে পারে, কেননা কাব্যের ভাষা সাধারণভাবে কথোপকথনের ভাষা নয়, এবং নিছক অর্থজ্ঞাপন কিংবা বাণীবহন এর প্রধান লক্ষ্য নাও হতে পারে। কবিতার ভাষার ইঙ্গিতময়তা, রহস্যধামতা ও সাঙ্গীতিকতাই এর ভিন্নধর্মী চারিত্র্যের পরিচায়ক। যেহেতু সব কবিতাই কোনো বিশেষ বক্তব্য বা কাহিনীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে না, এবং যেহেতু অনেক কবিতাই প্রধানত চেতনার কারুকাজ—সে কারণে কবিতার ভাষামাত্রই কোনো স্পষ্ট অর্থব্যাপক ভাষা নয়। *গদ্যের ভাষার জন্যে যে অর্থজ্ঞাপক স্পষ্টতা আবশ্যিক ও অপরিহার্য, তা সর্বক্ষেত্রে কবিতার ভাষার জন্যে প্রার্থিত নাও হতে পারে।*

গদ্যের ভাষার বিশেষ বিশেষ শব্দাবলী কিংবা এর গঠনরীতি, বাক্‌পদ্ধতি দুরূহ ও দুর্বোধ্য হতে পারে—কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর জন্যে অর্থজ্ঞাপকতা অপরিহার্য। কিন্তু কাব্যের ভাষায় এর অন্তর্গত শব্দাবলী সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক হয়েও, সামগ্রিকভাবে কবিতাটি সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক নাও হতে পারে, কারণ নিছক রূপসৃষ্টিতেও একটি কবিতা সফল এবং সার্থক বলে বিবেচিত হওয়া বিচিত্র নয়। বাংলা কাব্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদের' ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর অপরিচিতিই

শুধু এর অন্তর্নিহিত অর্থ-উদ্ধারের পথে প্রতিবন্ধক নয়, বস্তুত এর নিহিত বক্তব্যে যে ইঙ্গিতময়তা, সাংকেতিকতা ও রহস্যময়তা রয়েছে তা-ও এক্ষেত্রে এক প্রধান বাধা। এ-কারণেই চর্যাপদে ব্যবহৃত শব্দসমূহের আভিধানিক অর্থ এবং সেকালের অর্থ-ব্যাপ্তি জানা হয়ে গেলেও, সান্ধ্য-ভাষায় রচিত এই পদগুলোর যথার্থ অর্থ প্রকৃতই জানা হয় না, আর এ কারণেই পণ্ডিতদের মধ্যে চর্যাপদের অর্থ নিয়ে এত মতভেদ। এক অর্থে যে-কোন কবিতা—বিশেষত যে কবিতায় চেতনার কারুকাজ এবং মনোময় অভিব্যক্তিই প্রধান, কিছুটা রহস্যময়, কিছুটা 'সান্ধ্যভাষায়' রচিত। এ কারণেই সুস্পষ্ট এবং বহুবিদিত 'শবদ' সমবায়ে রচিত কবিতাও অনেক সময় দুরূহ কিংবা দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হয়। বস্তুত এ দুর্বোধ্যতা যতখানি না ভাষার তার চেয়েও অনেক বেশী ভাবের। কাব্যে বিধৃত ভাব বা বক্তব্য গদ্যে ধৃত ভাব বা বক্তব্যের মতো সর্বক্ষেত্রেই সরল কিংবা সুস্পষ্টভাবে রেখায়িত হয় না। এবং যেহেতু কাব্যেব ভাষা অনেক বেশী ইঙ্গিতময় এবং প্রতীকাশ্রিত সে কারণে এব অর্থব্যাপ্তির সম্ভাবনাও অনেক বেশী। এ কারণেই কবিতার আবেদন গদ্যের আবেদনেব চেয়ে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘস্থায়ী। আর সে-কবিতা যদি হয় গীতিধর্মী ও সুবাশ্রয়ী তা হলে এর স্থায়িত্বের সম্ভাবনা তো অপরিসীম।

৩

কবিতার ভাষা গদ্যের চেয়ে অনেক বেশী ইঙ্গিতময় এবং প্রতীকাশ্রিত। গদ্যে সাধারণত একটি বা একাধিক শবদ যে বক্তব্য পেশ করে তা এর আভিধানিক এবং প্রচলিত অর্থের বাইরে তেমন অধিক কোনো অর্থ জ্ঞাপন করে না। বিশেষ বক্তব্য পেশ, আদেশ-নির্দেশ জ্ঞাপন এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্যে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় তা কোনো রহস্যময় ভাষা নয়, সারল্যে অভিব্যক্ত গদ্যেরই ভাষা। কারণ, ব্যবহারিক ভাষা এর উদ্দিষ্ট হাসিলেই পরিতৃপ্ত এবং যেহেতু এই ভাষার অন্য কোনো দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপকতর লক্ষ্য নেই সে কারণে এর কোনোরূপ রহস্যময় বা ইঙ্গিতধর্মী চারিত্র্য অর্জনেরও প্রয়োজন পড়ে না। শুধু ব্যবহারিক ভাষা নয়, সাধারণভাবে গদ্য-

ব্যবহৃত ভাষাও কবিতার ভাষার তুলনায় অনেকখানি আটপৌরে, নিরাভরণ এবং ব্যঞ্জনারহিত। গদ্যরচনায় ব্যবহৃত ভাষা যদি কবিতার লক্ষণাক্রান্ত ভাষার চারিত্র্য অর্জন করে তাহলে গদ্য হয়েও এ ভাষা প্রধানত কাব্য বলেই বিবেচিত হয়। গদ্যে ব্যবহৃত ভাষার কবিতার চারিত্র্য অর্জন এবং কবিতার ভাষার গাদ্যিক হয়ে ওঠা—এর কোনো-টিই অবশ্য শিল্পবিচারে সব সময় তুল্যমূল্য লাভ করে না। কোনো ভাব বা বক্তব্য প্রকাশের ভাষা নিরেট গদ্যাত্মক হবে, না কাব্যধর্মী হয়ে উঠবে তা নির্ভর করে প্রধানত সেই ভাব বা বক্তব্যের চারিত্র্য-ধর্মের ওপর। এই চারিত্র্য-ধর্ম অনুসারেই নিতান্ত সহজ সরল গদ্যাত্মক বিষয়ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার কাব্যধর্মী চারিত্র্যের কারণে একান্তরূপে কাব্যগন্ধী হয়ে উঠতে পারে, অন্যপক্ষে অনুরূপ কারণেই কিছুটা জটিল, অসরল এবং তির্যক বিষয়ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার গদ্যাত্মক চারিত্র্যের দরুন নিতান্তই গদ্যধর্মী হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়।

ভাব এবং বক্তব্য বিষয় যেমন অনেক ক্ষেত্রে ভাষার চারিত্র্য নির্ধারণ করে তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে রচয়িতার মানসগঠন, শিল্পীপ্রকৃতি এবং ভাষার ওপর তার দখলের পরিধিও এর চারিত্র্যধর্ম নির্ধারণ করে থাকে। এ ক্ষেত্রে ভাষার ওপর দখল অর্থে প্রধানত রচয়িতার শব্দ-সম্পদের ওপর অধিকারই বোঝায়, কারণ মূলগতভাবে বলতে গেলে ভাষা তো শব্দসমবায়েরই অন্য নাম। লেখার ক্ষেত্রে যদিও ভাষার অন্তর্গত শব্দের ধ্বনিই প্রধান অবলম্বন নয়, বরং এর প্রতীকরূপই আসল, তবুও লেখনকর্মে প্রতিটি শব্দের অনুচ্চারিত ধ্বনিও রচয়িতাকে তার ভাষার চারিত্র্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে থাকে। গদ্যের চেয়ে কবিতা রচনার ক্ষেত্রেই এই ধ্বনি-সচেতনতা অধিক প্রয়োজন। ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নে যে শব্দচেতনার কথা আসে তাও অনেকখানি ঠিক এই কারণেই। উল্লেখনীয় যে, 'শব্দ' কথাটিও বলতে গেলে 'ধ্বনি'রই অন্য নাম। সাধারণ্যে 'ধ্বনি' কথাটি অপ্রচলিত এবং 'শব্দ' কথাটিই সুপ্রচলিত। এই শব্দ এবং শব্দ-নির্বাচন সম্পর্কে যার চেতনা প্রখর নয়, শব্দ-সম্পদ যার নিতান্তই সীমিত, তার পক্ষে শব্দযাদু সৃষ্টি করা কিভাবে সম্ভব? গদ্য কিংবা

পদ্য—যা-ই রচনা করা হোক না কেন, তার প্রকাশের অবলম্বন তো শব্দ এবং শব্দসমবায়ে গঠিত ভাষা। এ সত্যও অনস্বীকার্য যে, একই ধরনের শব্দচেতনা নিয়ে গদ্য এবং পদ্য রচনায় একইরূপ সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। কারণ, গদ্যে কোনো ভাব বা বিশেষ বক্তব্য প্রকাশে যে শব্দ এবং শব্দসমবায় বিশেষ সহায়ক হিসাবে বিবেচিত, পদ্যে তার ব্যবহার হয়তো ক্ষতিকর বলে প্রতিপন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। একটি বিশেষ শব্দ আভিধানিক অর্থে গদ্যে এবং কবিতায় হয়তো একই অর্থ মহিমা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে, কিন্তু ব্যঞ্জনা এবং অর্থগৌরবের দিক থেকে কবিতায় সেই শব্দটিরই অর্থ রূপান্তর খুবই স্বাভাবিক। এ কারণেই লক্ষ্যযোগ্য যে একই শব্দ বিভিন্ন যুগের কবিতায় বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থমহিমা ও গৌরব নিয়ে উপস্থিত। এমন কি কবিদের প্রতিভা এবং ব্যবহার-নৈপুণ্যের গুণে ভিন্ন ভিন্ন কবির রচনায় একই শব্দ ভিন্নভাবে ব্যবহৃত—ফলত এর অর্থমহিমা এবং গৌরবই এভাবে রূপান্তরিত। বিভিন্ন যুগের গদ্যেও একই শব্দের ভিন্নরূপ ব্যবহার দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং এর অর্থব্যাপ্তিও লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু গদ্যরচনায় ব্যবহৃত ভাষা যেহেতু কবিতার ভাষার মতো চারিত্র্যধর্মেই ততখানি রহস্যাবৃত ইঙ্গিতময় এবং প্রতীকাশ্রিত নয়, সে কারণেই এর ব্যবহার-বৈচিত্র্যেও তুলনামূলকভাবে কম। আর এ কথা তো সত্য যে প্রতীকার্থ বা রূপকের আশ্রয় নিয়েই কবিতা অনেক সময় হয় চিরঞ্জীব, শিল্পের বিচারে উত্তীর্ণ হবার অধিকার হয়তো এভাবেই কবিতা অর্জন করে। কিন্তু চিন্তামূলক বা মননধর্মী গদ্য রচনা এতখানি প্রতীক বা রূপকের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার পায় না, এ ধরনের চারিত্র্য অর্জন করলে গদ্যের ওপর কবিতার আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ স্বভাবতই ওঠে। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলেছেন : মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ কাব্যে। দুইয়ের ভাষার অনেক তফাৎ; জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই, তাতে ঠিক কথার ঠিক মানে থাকা দরকার। সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়।

এ কথা মনে নিয়েও বলা চলে যে কাব্যে হৃদয়বৃত্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটলেও, দর্শন-বিজ্ঞানও কবিতার বিষয়ীভূত, এবং যেহেতু কবিতার বিষয় বলে কোনো স্বতন্ত্র বিষয় নেই সে কারণে দর্শন-বিজ্ঞানেরও কবিতার বিষয়ীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই, কেননা, জগৎ চরাচরের সববিছুই অবলীলায় কবিতার উপজীব্য হতে পারে, যদি কাব্যরচয়িতার কবিতা জননের শক্তি থাকে। কিন্তু গদ্যে দর্শনবিজ্ঞানের বিষয় যেভাবে অন্তর্গত হয় ঠিক একইভাবে কাব্যে তা ধরা দেয় না। গদ্য লেখকের মূল দায়িত্ব শুধু আনন্দ বা সৌন্দর্যের স্বাদ দেয়াই নয়, বক্তব্য প্রকাশ এবং জ্ঞান দানই প্রধান লক্ষ্য, এবং তা যদি শিল্প ও সৌন্দর্যের পথ ধরে আসে তাহলে সেটি হয় উপরি পাওনা। গদ্যলেখক যখন তার ভাবনা বা চিন্তার ভাষান্তর করেন তখন তাকে ভাষা ও বক্তব্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা মেনে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হয়। তিনি চোখে ছবি দেখেন না, কানেও শোনেন না কোনো সুনির্দিষ্ট ছন্দোধ্বনি, বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট ও আকর্ষণীয়, সহজ এবং সাবলীল ভাষায় প্রকাশ করা যায় কোন কৌশলে এ নিয়ে তাকে নিরন্তর ভাবনা চিন্তা করতে হয়। অবশ্য, এ সবই সৃজনশীল চিন্তামূলক গদ্যরচয়িতার ভাবনা। কবিতার ভাষার ঐন্দ্রজালিক মোহনীয় শক্তি, তার সংকোচন ও প্রতীকায়নের বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা এবং সাহিত্যের আদি শাখা হিসেবে এর ভাষার সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্য—সবকিছুই কাব্যের ভাষার নিজস্ব চারিত্র্য গড়ে তুলেছে।

কিন্তু গদ্য পরবর্তীকালের সৃষ্টি। শুধু মনোজ উদ্ভাবনাই এর জন্মকে ত্বরান্বিত করেনি, প্রতিদিনের ব্যবহারিক ক্রিয়াকর্ম ও ভাবের আদান-প্রদানের প্রয়োজনও কার্যকর রয়েছে এর মূলে। ভাবের জগতে শিল্পী নিঃসঙ্গ এবং অনন্য, কিন্তু প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মে ও ভাবনার জগতে তিনি আর দশজনের মতোই সমাজ-বাসিন্দা। ব্যক্তিগত ও সমাজ ভাবনাকে কবির পক্ষে প্রতীকার্থ দান সহজ ও সঙ্গত। কিন্তু গদ্যরচয়িতার পক্ষে তেমন অবারিত সুবিধা নেই। কেননা মূলত 'ভাবের ভাষা হলো কাব্য' আর 'জ্ঞানের ভাষা' গদ্য। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে গদ্যের চর্চা আসলে জ্ঞানচর্চা বা

মনীষার বিকাশেরই সমার্থক। কাব্যের উৎকর্ষ যেমন একটি বিশিষ্ট সমাজ বা জাতির আবেগের গভীরতা, চৈতন্যের তীক্ষ্ণধার অনুভূতি এবং আকুতির ব্যাপ্তিকেই সপ্রমাণ করে, তেমনি গদ্যের বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষে রূপ পায় তার মনীষার পরিচয়। জ্ঞানচর্চার দিগন্ত সম্প্রসারিত হলে ভাষার গ্রহণ এবং শোষণ শক্তিও বৃদ্ধি পায় বহুগুণে, গদ্যের সমৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ হয় অনিবার্য। গদ্যের—বিশেষত চিন্তামূলক গদ্যের মূল অভীষ্ট কোনো বিশেষ বক্তব্য প্রকাশ এবং জ্ঞানবিতরণ হলেও, কাব্যের পক্ষেও এমন উদ্দেশ্যপ্রবণ এবং লক্ষ্য-সন্ধানী হয়ে ওঠা বিচিত্র কিছু নয়। কারণ, কবিতাও কোনো বিশেষ বক্তব্য পেশ এবং জ্ঞানের আলো দান করতে পারে; কিন্তু এই উভয় শিল্প-মাধ্যমের মধ্যে মূলগত যে পার্থক্য তা হলো এই যে, কাব্যকে স্ফূরিত হতে হয় প্রধানত স্বপ্নকল্পনা, আবেগ-অনুপ্রেরণার পথ ধরে—ছন্দ এবং ছন্দোধ্বনির সহায়তায়। যুক্তি ও শৃঙ্খলাবোধ এ-ক্ষেত্রে কোনো অপরিহার্য আবশ্যিক শর্ত নয়। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকখানি বিপরীত। স্বপ্নকল্পনা, আবেগ-অনুপ্রেরণার পথ ধরে আসা গদ্যের জন্যে অপরিহার্য নয়, যদিও এ পথে এলে অনেক সময় গদ্যও প্রাণবান এবং শিল্পরূপময় হয়ে উঠতে পারে। প্রধানত যুক্তি শৃঙ্খলা মেনে অগ্রসর হওয়াই গদ্যের জন্য আবশ্যিক।

আনন্দ পরিবেশন, রূপ ও সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং পাঠকের সুপ্ত চেতনার জাগরণ কবিতার আরাধ্য কাজ হলেও, যেহেতু কবিতা নিছক জ্ঞানের পথ ধরে রূপ পায় না, সৌন্দর্যের সাথেই তার সহযাত্রা, সে কারণে কবিতার শিল্পরূপময় হয়ে ওঠাই প্রধান শর্ত। এই শিল্পরূপময় হয়ে ওঠার ব্যাপারে কবিতাকে যা সবচেয়ে বেশী সহায়তা করে তা হলো শব্দ এবং শব্দসমবায়ে গঠিত ভাষা। কবিতায় ছন্দ এবং ছন্দোধ্বনিরও একটি অনিবার্য বিশেষ ভূমিকা আছে। কিন্তু এই ছন্দ এবং ছন্দোধ্বনিও তো শব্দকে আশ্রয় করেই বেজে ওঠে, কারণ যেখানে শব্দ এবং শব্দসমবায়ে গঠিত ভাষা নেই সেখানে ছন্দ ও ছন্দোধ্বনি মূর্ত হবে কোন্ উপাদানকে আশ্রয় করে? এ জিজ্ঞাসা শুধু লিখিত কবিতা এবং বাণীবদ্ধ কাব্যগীতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, নিছক সুরের ব্যাপারেও প্রযোজ্য, কেননা, যে রচনায় কোনো বক্তব্য বা বাণী নেই,

কেবলি সুরের সঞ্চরণ আছে, তাতেও ছন্দ এবং ছন্দোধ্বনি অনুভব করা যায়। সুরস্রষ্টা এবং সুররসিকেরা শুধু এর রসময় সঞ্চরণ অনুভব করেন না, রূপময় বাণীমূর্তিও প্রত্যক্ষ করেন। সুরের অন্তরালে রঙ এবং রূপের খেলার কথা অনেক কল্পনা-প্রতিভাসম্পন্ন কবিশিল্পীরাই উল্লেখ করেছেন। এমন প্রতিভার অধিকারী বলেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' শোনেন, নজরুল 'গানের সবুজ সুর' প্রত্যক্ষ করেন। আসলে সুর কিংবা সুরাশ্রিত বাণী যাই হোক না কেন, শব্দ বা ধ্বনির সাশ্রয় ছাড়া এর অভিব্যক্তির উপায় নেই। এ কারণেই সঙ্গীতকে জ্ঞান করা হয় মানবহৃদয়ের সার্বজনীন ভাষা হিসাবে। সঙ্গীতের এই যে সুরাশ্রয়ী ভাষা তা সব মানুষের দ্বারে অর্থবহতার উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয় না সত্য, কিন্তু তা চেতনার গভীরে অনুভূতির তারে স্বাভাবিক স্পন্দন জাগায়। এ ভাবেই কবিতা এবং কাব্যগীতি, সুর ও ধ্বনি একাকার হয়ে যায়। কবিতার ভাষার অন্তরালে এই সঙ্গীতময়তাই কবিতার আবেদনকে করে তোলে দীর্ঘস্থায়ী এবং সার্বজনীন। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে কবিতামাত্রই পদ্যবন্ধ নয় এবং পদ্যবন্ধ মাত্রই কবিতা নয়। পদ্যবন্ধে শব্দ থাকে, ছন্দ থাকে এবং থাকে আবৃত্তিযোগ্য ছন্দোধ্বনি, কিন্তু এসব প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক উপাদানাবলী থাকা সত্ত্বেও ব্যঞ্জনাময় সাঙ্গীতিকতার অভাবে হয়তো কোন পদ্যবন্ধ নিছক পদ্যবন্ধই থেকে যায়। অন্যপক্ষে পদ্যবন্ধের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং নির্ধারিত ছন্দ, ছন্দোধ্বনি ইত্যাদির অভাব সত্ত্বেও অন্তরালবর্তী সাঙ্গীতিকতার কারণে নিছক গদ্যও প্রকৃষ্ট কাব্যের গুণান্বিত হয়ে উঠতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃষ্ট গদ্যমাত্রই উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। আসলে গদ্যের অন্তর্নিহিত এই সাঙ্গীতিকতাই হলো সেই গুণ—কাব্যতত্ত্বের ভাষায় যার নাম ছন্দঃস্পন্দ। কবিতায় কিংবা গদ্যে যেখানেই ব্যবহৃত হোক না কেন, প্রতিটি শব্দেরই একটি ধ্বনি আছে এবং যে সব অক্ষর বা প্রতীকের সমবায়ে একটি শব্দের সৃষ্টি সেগুলোরও রয়েছে নিজস্ব ধ্বনি-পরিচয়। এই ধ্বনি-পরিচয় সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা এবং অভ্যাসগত উপলব্ধিই রচনাকর্মের সময় শব্দ নির্বাচনে প্রত্যেক সচেতন সৃজনধর্মী শিল্পীকে সহায়তা করে থাকে। ভাষার যাদু বলতে যে বিষয়টিকে বোঝানো হয়ে থাকে তা হচ্ছে মূলত এই শব্দেরই যাদু।

এই যাদু যিনি দেখাতে পারেন তাঁর হাতেই পদ্য এবং গদ্য সৃজনশীল চারিত্র্য অর্জন করে। তা হয়ে ওঠে শিল্পরূপময়।

কবিতা অথবা গদ্য—যে কোনো লিখিত রচনাকর্মের জন্যেই ভাষার অবলম্বন আবশ্যক। ভাষা মানেই তো প্রয়োজনীয় শব্দের বিধি-বদ্ধ সমাহার। এই বিধিবদ্ধতা যিনি লংঘন করতে চান বা পারেন তার জন্যেও শব্দ-সম্পর্কিত সচেতনতা অপরিহার্য। ভাষা ব্যবহারে প্রথাগত রীতির অনুসারী কিংবা নতুনত্বের অভিসারী—শিল্পীর চারিত্র্য-ধর্ম যাই হোক না কেন, শব্দসম্পদের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার তার অধিকারে থাকা জরুরী। কারণ, রচনাকর্মে শব্দের ব্যবহার-প্রক্রিয়া প্রাথমিক ব্যাপার নয়, শব্দ আহরণই প্রাথমিক ব্যাপার। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে কবি শুধু তার ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-অনুভূতির ভাষান্তর করেন না, তিনি 'চোখে যে ছবি দেখেন, কানে যে ছন্দ শোনেন' তাই ফুটিয়ে তোলেন কবিতায়। এ কারণেই তাঁকে এমন শব্দ এবং শব্দসমবায়ী ভাষার ভাণ্ডারে হাত পাততে হয় যা সেই চোখে দেখা ছবি এবং কানে শোনা ছন্দ-ধ্বনিকেই সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করে। কিন্তু একজন গদ্য-রচয়িতা বিশেষত চিন্তা ও মননধর্মী বক্তব্যের ভাষান্তরই যাঁর লক্ষ্য, ঠিক যেভাবে সতর্ক পদক্ষেপে যুক্তি-শৃঙ্খলার পথ ধরে অগ্রসর হন এবং নির্বাচিত শব্দ ও শব্দসমবায়ে গঠিত ভাষার সহায়তায় তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে পেশ করেন, এক-জন কবির পক্ষে কি তেমনভাবে রচনাকর্মে অগ্রসর হওয়া সম্ভব? কারণ, কবি যত মননশীল এবং চিন্তাকুলই হোন না কেন, তিনি তো আসলে আবেগ ও অনুপ্রেরণার দ্বারাঃ তাড়িত, অতএব তাঁর পক্ষে সতর্ক পদক্ষেপে যুক্তি-শৃঙ্খলার পথ ধরে অগ্রসর হওয়া এবং শব্দ নির্বাচন ও ভাষাবিন্যাসের ব্যাপারে অমন ধীরগতি প্রার্থিত হতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন জাগে, শব্দ-নির্বাচন—ব্যাপক অর্থে যাকে বলা যেতে পারে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে সযত্ন আহরণ, রচনার এই অনিবার্য উপা-দান সংগ্রহে কবি কোন্ পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন? কাব্যবেত্তাদের মতে, কবির অভিজ্ঞতার ধরন এবং বক্তব্যবিষয়ের বৈশিষ্ট্যই প্রধানত কবিতার ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করে থাকে: গ্যাটে বলে-ছেন, 'কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁর কবিতায় ছন্দ এসে দেখা দেয়।

কবিতা লেখবার সময়ে তাঁকে যদি সজ্ঞানে ছন্দের খুঁটিনাটি বিধানের কথা ভাবতে হত তা হলে উন্মাদ হয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর থাকতো না।' কবিতার ছন্দ বিষয়ে এ বক্তব্য যেমন সত্য, কবিতার শব্দ তথা ভাষা সম্পর্কেও তা তেমনি সত্য। কারণ, কবি যখন তাঁর অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির রূপদান করেন তখন প্রকাশের আবেগ ও অনুপ্রেরণাই প্রধানত তাঁর স্বজনশীল সত্তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। কিন্তু এ সত্ত্বেও সত্যিকার প্রতিভাধর কবি এক রকম অনায়াস অবলীলায়ই কবিতা রচনার কাজ শেষ করে থাকেন, কেননা ছন্দের মতই কবিতার ভাষাও কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁর কবিতায় এসে ধরা দেয়। এ যদি না হতো তা হলে কবিতা রচনার সময় কবিকে অভিধান হাতড়ে অথবা তাঁর স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত শব্দাবলী অনুসন্ধান করে ফিরতে হতো। কবিকে যে এমন অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হতে হয় না তেমন নয়। যেহেতু কবির অভিজ্ঞতা ও আবেগের ধরন তাঁর প্রকাশের ভাষা এবং ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করে থাকে সে কারণেই কবিকে কখনো কখনো তার উপযোগী শব্দাবলী ও ভাষার অনুসন্ধানে বহির্গত হতে হয়। কাব্যে অনুভূতি, আবেগ ও অভিজ্ঞতার রূপায়ণের প্রধানতম মাধ্যম হচ্ছে শব্দ—বলা বাহুল্য সে শব্দ শুধু আভিধানিক শব্দই নয়, কবিতাব প্রকাশোপযোগী অর্থবহুল ও ব্যঞ্জনাধর্মী আকর্ষণীয় শব্দ—কবিতায় কবি যে শব্দের জগতে এক-একটি বার্তা নিয়ে নিঃসংকোচে পরিভ্রমণ করেন, পুরনো শব্দকে ভেঙেচুরে নতুন অর্থের দ্যোতনা দেন, পাঠকের মনে শব্দের ঐকতান জাগান। কিন্তু কাব্যরচনার মুহূর্তে সব সময় কবির হাতে ভাব বা বক্তব্যের প্রকাশোপযোগী যথার্থ শব্দটি এসে ধরা দেয় না, অথবা ধরা দিলেও সমগ্র ভাষাবিন্যাসের প্রকৃত রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। এ কারণেই কবিকে অনেক সময় শব্দের সুপ্রয়োগ এবং ভাষার পরিমার্জনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। এই পরিবর্তন ও পরিমার্জনা সূত্রে কখনো কখনো হয়তো বা সমগ্র কবিতাটিই বদলে যায়, এ হয়ে ওঠে ভিন্নতর রূপসৃষ্টি। এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে পরিবর্তন এবং পরিমার্জনার ফলে কবিতার অন্তর্নিহিত বক্তব্য ও অর্থের হয়তো বা সম্পূর্ণ রূপান্তরই ঘটে যায়। এ রকম হয় এই কারণে যে গদ্যের তুলনায় কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ এবং শব্দসমবায়ে

গঠিত ভাষার ভূমিকা অনেকখানি ব্যাপক। কারণ, কবিতায় শব্দ ও ভাষার ব্যঞ্জনা সুগভীর এবং এর স্থিতি-স্থাপকতা অপরিসীম। গদ্যে ব্যবহৃত শব্দ ও বাক্যবন্ধ সাধারণত ঠিক যে-অর্থে এগুলো ব্যবহৃত, ঠিক সে-অর্থই বহন এবং জ্ঞাপন করে। কিন্তু কবিতায় সর্বত্র এমনটি ঘটে না। শব্দের প্রয়োগমূল্যের চাইতেও কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ-ব্যঞ্জনার মূল্য অনেক বেশী। এ কারণেই কবিতায় শব্দকে ভেঙেচুরে নানাভাবে ব্যবহার করা যায়। যে গদ্যে শব্দের এমন বিচিত্রমুখী অভিনব ব্যবহার লক্ষণীয় তা মূলত কবিতারই চরিত্র-লক্ষণাক্রান্ত বলে বিবেচিত।

গদ্যে ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দের ব্যবহার সব সময় এর প্রকৃষ্টতার পরিচয় বহন করে না। বিশেষত যে-গদ্য রচনায় কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশই মূল লক্ষ্য সেখানে কাব্যধর্মী শব্দ এবং শব্দসমবায়ে গঠিত ভাষার ব্যবহার অনেক সময় উদ্দিষ্টের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য বক্তব্যের চারিত্র্য অনুসারে এবং রচয়িতার মানসপ্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য-ধর্মিতার কারণে বক্তব্য-প্রধান গদ্যরচনাও এমন লক্ষণাক্রান্ত হতে পারে। কারণ, বক্তব্যকে মনোহর এবং মনোগ্রাহী করে তোলার সৃজনী-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গদ্যরচয়িতাও লেখনী ধারণ করতে পারেন। কিন্তু সৃজনী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হলেও গদ্যরচয়িতার, বিশেষত চিন্তা-মূলক গদ্যরচয়িতার মূল লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে প্রধানত বক্তব্যবিষয়কে যথাযথভাবে পাঠকের চিন্তা ও চেতনায় সংক্রমিত করে দেবার দিকে। যেহেতু গদ্যরচনায় ব্যবহৃত শব্দ এবং শব্দবন্ধের সাধারণত কোনো ব্যঞ্জনাধর্মী চরিত্র থাকে না, সে কারণে রচনাটি পাঠ করার পর এর অন্তর্নিহিত বক্তব্যবিষয় যেভাবে পাঠকের চিন্তা ও চেতনায় রেখাপাত করে ঠিক সেভাবে এর প্রতিটি শব্দ, শব্দবন্ধ কিংবা বাক্যাংশ রেখান্বিত এবং অনুরণিত হয় না। গদ্য রচনায় বক্তব্যবিষয়ই প্রাধান্য পায় বলে এর ভাষার ঐশ্বর্য প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্য ও অলঙ্করণ, বিশেষ ব্যবহারকৌশল এবং প্রয়োগক্ষমতা সাধারণত গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য চিন্তামূলক এ ং প্রবন্ধ জাতীয় রচনার ক্ষেত্রেই এ কথাটি সর্বাধিক প্রযোজ্য। কারণ, নাটক-উপন্যাস কিংবা রম্যরচনার গদ্য সম্পর্কে এমন বিধিবদ্ধ নিয়ম-রীতি কিংবা বক্তব্য উচ্চারণ করা চলে না।

গদ্যরচনা যখন রচয়িতার বিশেষ মানসগঠন, চিন্তারীতি ও তা প্রকাশের নিজস্ব ভঙ্গী এবং প্রকৃতিধর্ম অনুসারে কবিতার লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠে তখন যে বিষয় বিচার্য হয়ে দাঁড়ায় তা হলো এই যে, রচনার অন্তর্গত বক্তব্যবিষয়টিই আসলে জটিল, না রচয়িতার বিশেষ রচনা-রীতি এবং প্রকৃতিধর্মই একে জটিল করে তুলেছে? কারণ বক্তব্যের জটিলতা ও ভাষার জটিলতা সমার্থক নয়। জটিল বক্তব্যও সহজ এবং সাবলীল ভাষায় আকর্ষণীয়রূপে প্রকাশ করা সম্ভব, যদি বক্তব্যবিষয় সম্পর্কে লেখকের গভীর জ্ঞান ও স্পষ্ট ধারণা থাকে। বিষয় জটিল হলেই তার ভাষা কিংবা প্রকাশরীতিও জটিল হবে—এমন ধারণা সর্বথা গ্রাহ্য নয়। অবশ্য একথা গদ্যরচনা সম্পর্কেই অধিক প্রযোজ্য, কারণ গভীর জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রকাশের দায়িত্ব কাব্যের তুলনায় গদ্যের অনেক বেশী। কাব্য যদি কোনো গভীর জ্ঞান ও সুস্পষ্ট ধারণা অনিবার্যভাবে প্রকাশ করে তাহলে কোনো ক্ষতি নেই, বরং পাঠকের জন্যে সেটা লাভই। কিন্তু কাব্য সর্বক্ষেত্রেই এমন প্রতিশ্রুতি দেয় না। কেননা, কাব্যে কোনো বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশই মূল লক্ষ্য নাও হতে পারে। অনেক সময়, ছন্দো-ধ্বনির পথ ধরে আসে বলে, কাব্যে এই ছন্দো-ধ্বনির মহিমাই প্রধান হয়ে যায়, কখনো কখনো বা বিশেষ ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ, শব্দবন্ধ কিংবা বাক্যাংশ বক্তব্যকে অন্তরালবর্তী করে দিয়ে পাঠকের চেতনা এবং মনোগহনে প্রাধান্য বিস্তার করে বসে। কবিতা রচনার আগে যখন কবির গহন ও গভীর সত্তায় কোনো একটি বিশেষ বক্তব্য কিংবা ধারণা ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক অভিজ্ঞতাউপলব্ধির পটে স্বাক্ষরিত হয়ে যায় এবং মনে মনে কবিতাটি রচনার পালা চলে, তখন কবি শব্দ এবং ছন্দকেই প্রধান অবলম্বন হিসাবে পান। এমন কি কবিতাটি রচনার মুহূর্তেও সেই শব্দ এবং ছন্দোধ্বনিই তার সমগ্র সত্তায় প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে। কখনো কখনো কবি হয়তো একটি বিশেষ শব্দ, শব্দবন্ধ কিংবা বাক্যাংশকেই অবলম্বন হিসাবে পান এবং মনে মনে সৃষ্টির পালা চলার সময়ে তাকে অবলম্বন করেই কোনো বিশেষ বক্তব্য দানা বেঁধে ওঠে।

অবশ্য শব্দ এবং ধ্বনির সহায়তায় বক্তব্য স্ফূরিত হবে, না

বক্তব্যকে অবলম্বন করে ছন্দধ্বনি স্ফূর্তি লাভ করবে তাও অনেকখানি নির্ভরশীল কবির বিশেষ মানসগঠন এবং আত্মপ্রকাশের প্রক্রিয়ার উপর। এভাবেই স্বাক্ষরিত হয়ে যায় কবি ছন্দ-প্রেমিক, শব্দ-প্রেমিক না বক্তব্য প্রকাশের অকারণ কৌতূহলে আবিষ্ট। চিত্ররূপময়তার দিকে যে-কবির আকর্ষণ সমধিক তিনিও এক অর্থে কবিতায় বক্তব্য প্রকাশকে গৌণ জ্ঞান করে থাকেন, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পে কবিতাটিকে শিল্পরূপময় করে তোলাই তার আরাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু চিত্ররূপময়তা অর্থাৎ শব্দমূর্তির সহায়তায় বাণীরূপ নির্মাণের জন্যেও চাই শব্দ এবং শব্দসমবায়ী ভাষা। স্বপ্ন-কল্পনায় ধৃত বিশেষ ইমেজকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে চিত্রশিল্পীর হাতে রয়েছে তুলি এবং রঙ, অন্য-পক্ষে কবির অধিকারে আছে ভাষা—যে ভাষা তার স্মৃতি ও চেতনায় সঞ্জীবিত। ভাষার রঙ দিয়েই কবি তার কল্পনা এবং অনুভবের ছবি ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু সেই ছবির বাণীময় হয়ে ওঠার অবলম্বন হিসাবে শুধু শব্দ, না শব্দ ও ছন্দ ব্যবহৃত হবে তা কবিরই অনুভব এবং ধারণার অন্তর্গত। হার্বাড রীডের মতে, 'কোন বিশেষরূপে' কবির কথা আত্মপ্রকাশ করবে, সে বিষয়ে কবির মনোগহনে স্বজ্ঞার বলে কোনো এক রকম ধারণা যদি না দেখা দিতো, তা হলে শব্দের সঙ্গে সুর, অথবা, ভাষাচিত্রের সঙ্গে তার সঞ্চরণীয় প্রত্যক্ষতা, অর্থালংকারের সঙ্গে তার অর্থের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা এসব কিছুই জেগে উঠতে পারতো না। সেই কারণেই কবিতার 'রূপ' (ফর্ম) সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে ও হলো যোগ্যতা, পরিমাপ, যথৌচিত্য, অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের সংঘবদ্ধতা, সংহতি সম্বন্ধে (এসবই যেমন দেখা যায় চতুর্দশপদী কাব্যরূপের মধ্যে) কবির এক অন্তর্বোধ ও ব্যাকুলতা—অর্থাৎ এক রকম আবেগ। অথবা বৈকল্পিকভাবে নয়, বরং ঐ ধারণার সঙ্গে আরো যোগ করা যেতে পারে যে ও এক রকম ক্রমাবিষ্কার শক্তি—যার বলে, কবি তাঁর অভ্যন্ত-রীণ 'রূপ' বোধ থেকে উদ্দীপিত হয়ে শব্দের শরণ নেন,—শব্দ ধরে ধরে পৌঁছে থাকেন চরণের সীমাতে এবং বিস্তারে,—চরণ থেকে চর-ণান্তের-স্তবক থেকে স্তবকের গুচ্ছে, এইভাবে তাঁকে এগিয়ে চলতে হয় যতক্ষণ না আবিষ্কারের বেগটি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায়।'

কিন্তু হার্বাড রীডের এ পর্যবেক্ষণ আবেগ অনুপ্রাণিত এবং উদ্দী-

পিত কবির ক্ষেত্রে যতখানি সত্য, কোনোরূপ অনুপ্রেরণা নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তি এবং মনন চিন্তাকেই প্রধান জ্ঞান করেন যে কবি, তাঁর ক্ষেত্রে ততখানি প্রযোজ্য নয়। কারণ, অনুপ্রেরণায় অবিশ্বাসী এবং নিছক বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রাধান্যদানকারী কবি অন্তর্বোধ ও ব্যাকুলতা অর্থাৎ এক রকম আবেগের দ্বারা তাড়িত হন না। বরং তাঁর চিন্তা ও চেতনা বক্তব্যবিষয়কে শাণিত এবং মননধর্মী করে তোলার দিকেই অধিক নিবিষ্ট থাকে। এ কারণে কখনো কখনো রচনায় রূপনির্মাণের চেয়ে মনন-ঘন ও গভীর বক্তব্য প্রকাশই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। 'অন্তর্বোধ ও ব্যাকুলতা এবং আবেগের দ্বারা যে কবি তাড়িত হন, তিনি, বলা যেতে পারে অনেকখানি স্বতঃতাৎসারিতভাবেই, ছন্দোধ্বনির হাতে বন্দী হয়ে যান এবং এ সবের অন্তর্গত তরঙ্গভঙ্গই তাকে অনিবার্যভাবে সমাপ্তির দিকে টেনে নিয়ে যায়। ফলে কবিতাটি—যেন অনেকটা কবির অজ্ঞাতসারে এবং নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা না রেখেই, ঠিক যেখানে এসে থামার ঠিক সেখানেই থেমে যায়। কিন্তু যে কবিতা এভাবে ছন্দোধ্বনির হাতে বন্দী নয়, এবং যে কবিতার কোনো অন্ত্যস্থ আবেগ নেই, তার চারিত্র্যধর্ম ঠিক এমনটি হয় না। ছন্দোবদ্ধ কবিতার সুবিধা এই যে, ছন্দের বিশেষ প্রকৃতিই কবিতায় একটি পংক্তির পরবর্তী অপরিহার্য পংক্তিটিকে অবলীলায় বহন করে নিয়ে আসে; বিশেষত অন্ত্যমিলসম্পন্ন কবিতায় এ রকমটি হয়ে উঠে খুবই ত্বরিৎগতি।

অবশ্য ছন্দোবদ্ধ কবিতার এ রকম সুবিধার দিক যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অসুবিধার দিকও। কারণ, কবিতার ছন্দোধ্বনি বক্তব্যের উৎসরণের ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হলেও অনেক সময় 'স্বজ্ঞার বলে' কবিতায় ছন্দের প্রকৃতিটি পূর্বাহ্নেই (অর্থাৎ মনে মনে কবিতা রচনার পালা চলারকালে) নির্ধারিত হয়ে যায় বলে বক্তব্যবিষয় হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত। এই সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে এবং হৃদয় দিয়ে গভীরভাবে অনুভব করেই প্রতিভাধর কবিরা সৃজনপ্রয়াসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই কবিতায় ছন্দের বেড়া ভেঙেছেন এবং কাব্যধর্মী গদ্যকে করে নিয়েছেন আত্মপ্রকাশের বাহন। এর ফলে লাভ হয়েছে এই যে কবিতায় ধৃত উপজীব্য বিষয়ের বিস্তৃতি ঘটেছে, কাব্য লাভ করেছে অবলীলাময় হয়ে উঠার অধিকার এবং প্রাত্যহিক জীবন-সমস্যা রূপায়নের উপযোগিতা।

এমন কি কবিতাকে অধিক জীবননিষ্ঠ করে তোলার প্রয়োজনে শুধু যে ছন্দের কৃত্রিম বন্ধনকে বর্জন করা হয়েছে তা-ই নয়, কবিতার ভাষার কাব্যধর্মী চারিত্র্যও হয়েছে পরিত্যক্ত। উল্লেখনীয় যে কবিতার ভাব বা বক্তব্য শুধু প্রকাশের ক্ষেত্রে এর ভাষার চারিত্র্যই নিয়ন্ত্রিত করে না, অধিকন্তু এর ছন্দোপ্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। এ কারণেই বক্তব্যের প্রকৃতি অনুসারে ছন্দের প্রকৃতি নির্ণীত হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, যে ছন্দে একটি মহাকাব্য রচিত হয় ঠিক সেই ছন্দে একটি চতুর্দশপদী কবিতা রচিত হয় না, যদিও একটি চতুর্দশপদীতে একটি মহাকাব্যের বক্তব্য পরিবেশিত হতে পারে।

ভাব বা বক্তব্যের প্রকৃতি শুধু যে ছন্দের প্রকৃতি নির্ধারণ করে তা নয়, কবিতার ভাষারও চারিত্র্য বদলায়। অনস্বীকার্য যে একজন ইতিহাসের নায়ক বা রাজা-মহারাজা যে ভাষায়-ভঙ্গীতে কথা বলেন কিংবা বিশেষ বাণী উচ্চারণ করেন, সমাজ সংসারের একজন সাধারণ মানুষ ঠিক সেই ভাষায় বা ভঙ্গীতে কথা বলেন না, বললে তা অবাস্তব এবং অতিনাটকীয় বলে জ্ঞান করার সম্ভাবনা থাকে। এ কারণেই চলমান জীবনের রূপকার এবং বাণীবাহক হতে গিয়ে সাধারণ সমাজ সংসারের আলেখ্য রচনার প্রয়োজনে কবিকেও তাঁর ভাষা এবং ছন্দ বদলাতে হয়েছে। উল্লেখনীয় যে সাধারণভাবে ভাষামাত্রেরই একটা ছন্দোধ্বনিময় কাব্যধর্মী রূপ এবং চারিত্র্য আছে। একারণেই শুধু পদ্যের নয়, গদ্যেরও একটি অন্তর্নিহিত ছন্দোময় দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায়। ভাষার বিশেষ বাক্যাংশ, বাক্যবন্ধ যেমন অর্থ ও রূপ প্রকাশ করে, তেমনি শুধুমাত্র একটি শব্দের পক্ষেই এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। কারণ শব্দ এবং শব্দসমবায়ে গঠিত ভাষা তো শুধু অর্থই জ্ঞাপন করে না সেই সঙ্গে রূপপ্রকৃতিও প্রকাশ করে। যেহেতু ভাষা প্রতীকধর্মী এবং রূপপ্রকৃতির প্রকাশক, সে কারণে 'মেঘ' 'পাখি' 'আলো' ইত্যাকার যে কোন শব্দের উচ্চারণেই অর্থ এবং রূপ সপ্রকাশ। সেই সঙ্গে এই শব্দ কয়টির উচ্চারণের মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত এর ধ্বনিমূল্য ও মাত্রা-পরিচয়। এ কারণেই আমরা যখন উচ্চারণ করি: পাখী সব/করে রব/রাতি পোহাইল অথবা 'মেঘ পাখি আলো'/সবি বাসি ভালো/ তখন প্রত্যেকটি শব্দ এর নিজস্ব ধ্বনি মূল্য ও মাত্রাশক্তি নিয়েই উচ্চারিত

হয়। যে কোন শব্দের এমন ধ্বনি-মূল্য এবং মাত্রা-পরিচয় আছে বলেই কি পদ্য, কি গদ্য—যে-কোন রচনারই কাব্যধর্মী হয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। আসলে কবি যখন কবিতা রচনায় নিবিষ্ট হন তখন ভাষার এই ধ্বনিমূল্য এবং মাত্রা-পরিচয়ই তাঁর চেতনায় প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে।

শব্দের সংকোচন ও প্রসারণের শক্তি এবং স্থিতিস্থাপক গুণ আছে বলেই কবি সেই মহিমাকে সম্বল করে তাঁর সৃজনকর্মে একেকটি শব্দ এবং শব্দবন্ধকে নানাভাবে ধ্বণিত-প্রতিধ্বণিত করে থাকেন, আপন ইচ্ছায় তাকে বাজিয়ে তোলেন। কিন্তু, শুধু কাব্যে ব্যবহৃত হয়েই যে 'শব্দ' ধ্বনি মূল্য ও মাত্রাশক্তি অর্জন করে তা নয়। দৈনন্দিন ব্যবহার ও ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে অনবরত যে সব শব্দ এবং শব্দসমষ্টি উচ্চারিত হচেছ সেগুলোরও নিজস্ব ধ্বনিমূল্য ও মাত্রাশক্তি আছে। যেমন: যাবে নাকি? খাবে নাকি?—ইত্যাকার সাধারণ জিজ্ঞাসাসূচক উচ্চারণেও শব্দ এবং শব্দসমবায়ের ধ্বনিমূল্য ও মাত্রাশক্তি স্পষ্ট। অনুরূপভাবে: যাব/খাব/কিংবা যাব এবং খাব—এরকম সম্মতিসূচক উচ্চারণেও ধ্বনি-মূল্য এবং মাত্রাশক্তি অনুভূত। বস্তুত, প্রত্যেকটি শব্দেরই ধ্বনি, মাত্রা ও চেহারা রয়েছে এবং প্রয়োগানুসারে এ সবের ধ্বনি, মাত্রা ও চেহারা বদলায় এবং সঙ্কুচিত সম্প্রসারিত হয় বলে এই বিশেষ স্থিতি-স্থাপকতা গুণই কবিতাকে করে তোলে ব্যঞ্জনাধর্মী। অবশ্য শব্দের এই সাধারণ গুণ গদ্যরচনায়ও উপস্থিত। তবে সামগ্রিকভাবে নয়, বাক্যাংশ হিসাবেই গদ্যে এর বিশেষ মূল্য। যখন প্রশ্ন করা যায়, 'তোমার সাথে আমার কবে দেখা হয়েছিল?' তখন এর পর্ববিভাগ দাঁড়ায় অনেকখানি এ রকম: তোমার সাথে/আমার কবে/দেখা হয়েছিল। কিন্তু একই জিজ্ঞাসা যখন উচ্চারিত হয় এইভাবে: তোমার সাথে আমার দেখা হয়েছিল কবে? তখন পর্ববিভাগ দাঁড়ায় এই রকম: তোমার সাথে/আমার দেখা/হয়েছিল/কবে? উপরোক্ত জিজ্ঞাসার ভাষা গদ্য হয়েও শব্দযোজনা এবং বাক্যগঠন রীতির দিক থেকে কাব্যধর্মী। এবং এর প্রত্যেকটি পর্বের অন্তর্গত শব্দ ছন্দোবিচারের দিক থেকে স্বরবৃত্তের লক্ষণাক্রান্ত। আবার সমগ্র কবিতাটির ছন্দের চারিত্র্য অনু-যায়ী এর মাত্রাবৃত্ত হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য একটি মাত্র পংক্তি

থেকে ছন্দের চারিত্র্য বিচার ঠিক নয়; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, গদ্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ এবং শব্দসমবায়ে গঠিত পর্বই এভাবে ছন্দোময় হয়ে ওঠে না, উঠা সম্ভব নয়। এ কারণেই সামগ্রিকভাবে নয়, বাক্যাংশ হিসাবেই এর মূল্য।

উল্লেখযোগ্য যে, কবিতা ও গদ্য রচনার ভাষার মধ্যে যে প্রধান পার্থক্য তা এই বাক্যগঠন রীতি এবং পর্ববিন্যাসের। কবিতায় সাধারণত শব্দ, শব্দবন্ধ ত্যাদির ধ্বনি-মূল্য ও মাত্রাশক্তির অনুপাতেই পর্ববিন্যস্ত হয়ে থাকে। পর্বের এই বিন্যাসে বাক্য এবং বাক্যসমষ্টির যে অন্তর্নিহিত নিজস্ব শক্তি তা-ই অনেকখানি স্বাভাবিক এবং স্বতোৎসারিত ভাবে কাজ করে থাকে। অবশ্য ছন্দের দিক থেকে কবিতার বিশেষ চারিত্র্য এবং রচয়িতার প্রয়োগনৈপুণ্যের দরুন শব্দ ও বাক্যসমষ্টির ধ্বনিমূল্য ও মাত্রাশক্তির কিছুটা হ্রাস বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, ধ্বনি এবং মাত্রার অন্তরালে শব্দের অন্তর্গত অতিরিক্ত ধ্বনি এবং মাত্রা লুকিয়ে থাকা সম্ভব। কবিতার ভাষার এই প্রাণশক্তিই কবিতাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলার এবং এর সাংগীতিকতা ও ধ্বনিময়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক। কবিতায় সাধারণত শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে চিন্তার অনুক্রম এবং বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ভাষা ব্যবহার করা হয় না। যেহেতু কবির মনে কোনো বিশেষ ভাব বা বক্তব্য, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি টুকরো টুকরো ভাবে কিছুটা অনচ্ছপ্রক্রিয়ায় সঞ্চারিত হয় (পুরো চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি উপলব্ধি, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কবিমনে সব সময় স্পষ্ট চেহারায় রেখায়িত হয় না) এবং তা প্রকাশের সময় কবি রূপক ও প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন, সে কারণে তার পক্ষে গদ্যরচয়িতার মতো এতোখানি স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল হওয়া সর্বদা সম্ভব নয়। কবির অভিজ্ঞতা, অনুভূতি-উপলব্ধি এবং সে-সবের প্রকাশের বিশেষ রীতি-প্রকরণই এ ব্যাপারে কিছুটা প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। বিশেষত কবিতার স্বতন্ত্র আংগিকই প্রকাশের ক্ষেত্রে সংকোচন প্রসারণের অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু গদ্যরচনার প্রকৃতিই এই যে, তা কোনো চিন্তা বা বক্তব্য প্রকাশের বেলায় পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং সুবিন্যা।

গদ্যরচয়িতার চিন্তা কিংবা বক্তব্য যতই অস্পষ্ট অথবা অনচ্ছ

হোক না কেন, গদ্যের এই বিশেষ প্রকৃতির দরুন তা কবিতার মতো এতোখানি জটিল ও দুর্জ্ঞেয় হতে পারে না। অন্যদিকে, কাব্যরচয়িতার মনে কোনো বিশেষ ভাব বা বক্তব্য অপেক্ষাকৃত স্পষ্টভাবে ধরা দিলেও, প্রকাশের ক্ষেত্রে তাকে কিছুটা অস্পষ্ট হতে হয়, প্রতীক-রূপক ও ইঙ্গিতময়তার আশ্রয়ে হয়ে উঠতে হয় জটিল এবং দুর্জ্ঞেয়। অবশ্য কবির অভিজ্ঞতার তারতম্য, তার আত্মপ্রকাশের নিজস্ব ধরন-ধারণ, এমন জটিলতা ও দুর্জ্ঞেয়তার প্রকৃতি এবং পরিমাপ নিধারণ করে। কবিতার বিশেষ আঙ্গিকে-প্রকরণই কবিকে যথাসম্ভব রূপক ও প্রতীকাশ্রিত হতে শেখায়। একটি সুদীর্ঘ চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধে কিংবা কখনো কখনো একটি বিপুলায়তন মননশীল গ্রন্থে একজন প্রবন্ধকার যে বক্তব্য পেশ করেন, হয়তো একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায় কিংবা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতর কোনো কবিকর্মে একজন কবিকে অনুরূপ বক্তব্য তুলে ধরতে হয়। এমন কি কবি হয়তো প্রবন্ধকারের মতো আদৌ কোন বক্তব্য পেশ করেন না, তিনি তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি-উপলব্ধিকে চেতনার কারুকাজ হিসাবে প্রকাশ করেন মাত্র। কিন্তু প্রবন্ধকারের এমন সুবিধে নেই। তাকে কোনো না কোন বক্তব্য পেশ কিংবা সিদ্ধান্ত উচ্চারণ করতেই হয়। কবিতায় আপাত জটিলতা, দুর্জ্ঞেয়তা এবং রহস্যময়তা অনেক সময় গুণ হিসাবে গণ্য হওয়াও বিচিত্র নয়, কিন্তু চিন্তামূলক ও বক্তব্যপ্রধান প্রবন্ধ রচনায় অনুরূপ জটিলতা, দুর্জ্ঞেয়তা এবং রহস্যময়তা দোষ হিসাবেই বিবেচিত। বক্তব্যপ্রধান হয়ে উঠা যে-ক্ষেত্রে কবিতার জন্যে ত্রুটির উৎস, সে-ক্ষেত্রে প্রবন্ধের জন্যে উৎকর্ষের আধার।

কবিতার ভাষা প্রকাশের বিশেষ প্রকরণ স্বভাবতই কবিতাকে কিছুটা জটিল এবং দুর্জ্ঞেয় করে তোলে। বিশেষত কবিতার শব্দ ও ভাষা-বিন্যাসে, পর্ব সংস্থাপনে সর্বত্রই বোধগম্য পারম্পর্য রক্ষিত হয় না বলে কবিতা অনেক সময় হয়ে ওঠে টুকরো বক্তব্য কিংবা ছবির সমাহার। কবির হাতে এইসব টুকরো ছবি আঁকা হয় ভাষার রঙ এবং রূপময়তার সহায়তায়। এ কারণেই কবিতার ভাষা প্রধানত বর্ণিল, সজীব এবং প্রাণবন্ত। শব্দের সহায়তায় কবি যে ভাষা চিত্র রচনা করেন তা সব সময় যে খুব একটা সচেতন-প্রয়াসে নির্মিত হয়ে

থাকে তা নয়। অনেকখানি স্বতোৎসারিতভাবে, দৃষ্টি ও অনুভবের পথ ধরে ছন্দোধ্বনির সহায়তায় এই রূপচিত্র অবয়ব লাভ করে বলে, এ হয়ে ওঠে যেন আপনাতে আপনি প্রকাশ। অবশ্য, বক্তব্য-প্রধান কবিতায়—যেখানে অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি কিংবা কোনরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশই মূল লক্ষ্য, সেখানে এমন ভাষাচিত্র রচনা গৌণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ যে কোনো ধরনের রূপচিত্র নির্মাণ প্রত্যক্ষভাবে কোনো বক্তব্য প্রকাশ কিম্বা প্রতিক্রিয়া উচচারণের পথে হয়তো বাধাস্বরূপ। তবে, কবির শব্দ-চয়ন প্রবণতা, ছন্দের আশ্রয় অবলম্বনেব বিশেষ ঝোঁক, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠার উৎসাহ এসব কিছুই নির্ধারণ করে তিনি চিত্ররূপময় হয়ে উঠবেন কি উঠবেন না, এই বিশেষ চারিত্র্য। আসলে শব্দ, ছন্দ, ধ্বনি ইত্যাদি কবির অধিগত হলেও, এক অর্থে কবি নিজেই এসবের হাতে বন্দী। আবেগ, অনুপ্রেরণা এবং উদ্দীপনায় যার বিশ্বাস গভীর ও প্রবল, তেমন কবির পক্ষে যেমন, তেমনি যে কবি এইসব প্রায়-দৈব ব্যাপারে আস্থা রাখেন না, তাঁর পক্ষেও এমন বন্দীদশা থেকে মুক্তি নেই। আর নেই বলেই কবিতাটি ঠিক কোন্ রীতির ভাষায় এবং কি ছন্দে রচিত হবে তা রচনাকালীন সময়ের প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা ছাড়া পূর্বাহ্নে বলে দেওয়া অসম্ভব।

কবি হয়তো রচনার আগেই কবিতাটি মনে মনে আওড়াতে কিংবা সত্তায় গেঁথে নিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে রচনার সময়ে এই কবিতাটিই যে আদি ও অকৃত্রিমরূপে এসে ধরা দেবে এবং অবয়ব লাভ করবে তা নাও হতে পারে। মূলগতভাবে কবির অধিকারে তিনটি ছন্দ (অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত—এই বাংলা নামে যাদের পরিচয়) এবং তিনটি ছন্দই থাকে, কিংবা থাকতে পারে। কিন্তু কবিমাত্রেই এই তিনটি ছন্দে সমান পারদর্শী কিংবা আদৌ পারদর্শী হন না। কখনো কখনো দেখা যায়, কোনো একজন কবি তাঁর সমগ্র রচনায় শুধু একটি বিশেষ ছন্দে আত্মপ্রকাশের সাধনায় ব্যাপৃত থেকেছেন, অপর দুটি ছন্দের প্রকাশক্ষমতা এবং ধ্বনিগৌরব সম্পর্কে তাঁর চেতনাই জন্মায়নি, অথবা এমনও হতে পারে যে তাঁর বিশেষ মানসপ্রবণতা সে সবের উপর অধিকার অর্জনের ব্যাপারে তাঁকে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত করেনি। ছন্দ নির্বাচনের প্রবণতা অনেকাংশে শব্দ-নির্বাচনের

প্রবণতাকেও উদ্বুদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত করে। কারণ, ছন্দ এবং বিশেষভাবে কবিতার ছন্দ—সে তো শব্দ-ধ্বনিরই অন্য নাম। শব্দ ছাড়া যেমন কবিতা রচনা সম্ভব নয়, তেমনি কবিতায় শব্দের অস্তিত্ব ছাড়া ছন্দের প্রত্যাশা করাও অসম্ভব।

কবিতা রচনায় শব্দের মূল্য বেশি না আইডিয়ার গুরুত্ব অধিক, এ নিয়ে কাব্যবেত্তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধ কবি-অভিজ্ঞতা এবং কবিতা রচনাকালীন সময়ের শিল্পীজনোচিত সৃজনশীল যন্ত্রণা থেকে যাঁরা শব্দ ও আইডিয়ার পারস্পরিক সম্পর্ক, মূল্য এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন তাঁরা—অর্থাৎ সৃজনী প্রতিভাধর কবিরা যেমন, তেমনি যাঁরা কবিতা রচনাকালীন সৃজনশীল যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার অধিকারী নন অথচ সৃজিত কবিতাটির মূল্য এবং শিল্প-সার্থকতা নিরূপণে বদ্ধপরিকর---সেই কাব্যরসবেত্তারাও এ বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেছেন। কিন্তু কবির অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আসলেই স্বতন্ত্র, নিছক কাব্যরসবেত্তার অভিজ্ঞতা উপলব্ধির চেয়ে এর চারিত্র্যধর্ম আলাদা হতে বাধ্য। এ কারণেই কবিরা শব্দের মূল্য যে পরিমাণে দিয়ে থাকেন সাধারণত কাব্যরসবেত্তারা তেমনটি দেন না।

কবিতা রচনার উপজীব্য এবং অবলম্বন হিসেবে আইডিয়ার গুরুত্ব কবিরাও স্বীকার করে থাকেন, কিন্তু কাব্যরচনায় তাদের কাছে শব্দের মূল্য বেশি এই কারণে যে কোনো সুনির্দিষ্ট এবং সুসম্পূর্ণ আইডিয়া বা ভাব ছাড়াও একরকম অনচ্ছ, অস্পষ্ট এবং অবিন্যস্ত আইডিয়া বা ভাবকে অবলম্বন করেও কবিতা গড়ে উঠতে পারে; কিন্তু শব্দের অবলম্বন এবং সহায়তা ছাড়া কবিতার পক্ষে আদৌ জন্ম নেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রাথমিক কারণেই যে শুধু কবিরা শব্দের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন তা নয়। যেহেতু কবিরা 'শব্দ' অর্থে শুধু অর্থবাচক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই মনে করেন না, অধিকন্তু ধ্বনির স্ফূরণ, বিস্ফোরণ এবং সেই সূত্রে আইডিয়া বা ভাবের ব্যাপকতর বহনের অবলম্বন মনে করেন, সে কারণে কবিতায় শব্দের মূল্য তাদের কাছে বেশি। যেহেতু কবিতায় শব্দই তাদের কাছে প্রাথমিক অবলম্বন এবং আবেগ, ইচ্ছা, আকুলতা কিংবা যে-কোন রকমের মনোভাব প্রকাশের অপরিহার্য বাহন, সে কারণে 'শব্দ ছাড়া কবিতা' তাদের কাছে

অকল্পনীয়। কিন্তু নিছক রসবেত্তাদের কাছে ব্যাপারটি ভিন্নরূপে প্রতিভাত। রসবেত্তারা সৃজিত কবিতাটির শিল্পমূল্য এবং সার্থকতা বিচারের সময় যত নিবিষ্টভাবেই চেষ্টা করুন না কেন, কবির প্রাথমিক অনুপ্রেরণা, আবেগ এবং আর্তি-আকুলতা ও আত্মপ্রকাশের সৃজনী ইচ্ছা ঠিক হুবহু নিজের মধ্যে ধারণ এবং অনুভব করতে পারেন না ; আর পারেন না বলেই কবিতার মূল্য বিচারে তাদের কাছে অনেক সময় শব্দের ভূমিকা গৌণ হয়ে যায়, কবিতাটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য—ভাব বা আইডিয়ার মূল্য প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

শব্দকে মৌলিক এবং আত্মপ্রকাশের অপরিহার্য ও অনিবার্য অবলম্বন মনে করেন বলে কবি স্বভাবতই হয়ে উঠেন শব্দপ্রেমিক ; কিন্তু কবির শব্দের প্রতি এই প্রেম বা মোহ যতটা এর ধ্বনি-মাহাত্ম্যের জন্যে, ততটা হয়তো অর্থগৌরবের জন্যে নয়। কোনো কবিই তার কবিতা রচনার অনুপ্রাণিত মুহূর্তে এমন সঙ্কল্পবদ্ধ হন না যে কবিতাটিতে তিনি একটি বিশেষ বক্তব্য এবং নিছক সেই বিশেষ বক্তব্যটিই তুলে ধরবেন ; বরং তার এমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে শব্দ এবং ছন্দোধ্বনির সহায়তায় তিনি তার আত্মপ্রকাশের আবেগকেই ভাষা দেবেন। শব্দ এবং ছন্দোধ্বনির হাতে বন্দী বলেই কবি একটি শব্দ উচচারণের পর আরেকটি অনিবার্য শব্দ ও অনেকটা অবলীলায় উচচারণ করে যেতে পারেন, সুবিন্যস্ত করে তুলতে পারেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বিষয়কে। একটি শব্দের পর আরেকটি প্রার্থিত শব্দ খুঁজে পাওয়ার জন্যে যদি কবিকে সর্বদাই অপেক্ষা করে থাকতে হতো, হাতড়ে বেড়াতে হতো তার অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতির ভাণ্ডার তা হলে তার পক্ষে কাব্যরচনাই হয়ে দাঁড়াতো এক অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু যেহেতু কবির কাছে শব্দ এবং শব্দধ্বনির মূল্য বেশী, ধ্বনির বিশেষ প্রকৃতি এবং চারিত্র্য সম্পর্কে তার ধারণা সুস্পষ্ট, সে কারণে তাকে কাব্যরচনার মুহূর্তে এমন অসহায়ভাবে শব্দ খুঁজে বেড়াতে হয় না।

যে কবির শব্দসম্পদের ভাণ্ডার বিশাল, এবং যার শব্দধ্বনি ও সে-সবের চারিত্র্য সম্পর্কে ধারণা ও অভিজ্ঞতা স্পষ্ট, তিনি তত বেশি শব্দ ব্যবহারে পারঙ্গম। কিন্তু শব্দের ভাণ্ডার যার সীমিত, শব্দধ্বনি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও সচেতনতা যার সীমাবদ্ধ তার পক্ষে শব্দ ব্যবহারে

বৈচিত্র্যের পরিচয় স্বাক্ষরিত করা অসম্ভব। কবিতার বিষয়-মাহাত্ম্য, অভিজ্ঞতা উপলব্ধির এলাকা এবং উপলব্ধির গভীরতা যতই অতলস্পর্শী হোক না কেন, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং সে সবের ধ্বনিব্যঞ্জনা যদি স্ফূরিত এবং বিলসিত না হয় তাহলে কবিতার পক্ষে আকর্ষণীয় হয়ে উঠা একান্তই কঠিন। কখনো কখনো দেখা যায়, কোনো একটি কবিতায় অভিব্যক্তি, বক্তব্য কিম্বা অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির বিষয় হয়তো আদৌ নতুন কিছু নয় (অবশ্য কবিতায় আদৌ কোনো নতুন বিষয় আমদানী সম্ভব কিনা সেও এক বিতর্কিত বিষয়), কিন্তু সেই বক্তব্য এবং অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির বিষয় যথাযোগ্য শব্দের এবং শব্দধ্বনির সহায়তায় আত্মপ্রকাশ করেছে বলে তা হয়ে উঠেছে অনেকখানি নতুন। এই নতুনত্বের স্মারক কিংবা পরিচয়-চিহ্ন হিসেবে কখনো শব্দের মূল্য, কখনো বা ধ্বনির মূল্য প্রাধান্য পায়। বিশেষত ছন্দোবদ্ধ ইলোকোয়েন্সধর্মী কবিতায় পরস্পর সুবিন্যস্ত পর্বানুসারে সংস্থাপিত শব্দাবলীর ধ্বনি-মাহাত্ম্য এবং পংক্তিশেষের অন্ত্যমিল কবিতার অন্তঃস্থ আবেগকে অনিবার্যভাবে প্রকাশ করে বলে তা হয়ে উঠে সংক্রামগুণের অধিকারী।

এ ধরনের কবিতায় অথবা কবিতাংশে ব্যবহৃত শব্দাবলীর নতুনত্ব কিংবা ব্যঞ্জনাগুণ নয়, বরং বলা যেতে পারে যে সেসবের ধ্বনিমূল্যই এই সংক্রামগুণের উৎস। নজরুলের: লাথি মার/ভাঙরে তালা/যত সব/বন্দী শালা/ফেল উপাড়ি/কিংবা সুকান্তের: বন্ধু তোমার/ছাড়ো-উদ্বেগ/সুতীক্ষ্ন করো/চিত্ত। বাংলার মাটি/দুর্জয় ঘাটি/বুঝেনিক দুর্বৃত্ত/দুটি কবিতাংশেই শব্দের চেয়ে শব্দ-ধ্বনির মূল্য অনেক অনেক বেশি। পংক্তি-শেষের অন্ত্যমিল বক্তব্যকে যেমন আবেগ উৎসারিত এবং অনিবার্য হতে সাহায্য করে তেমনি পাদ-শেষের অন্ত্যমিলও কবিতাকে করে তোলে স্বতোৎসারিত। উদ্ধৃত কবিতাংশের প্রথমটিতে পাদ-শেষের মিল এবং দ্বিতীয়টিতে পংক্তি-শেষের অন্ত্যমিল কবিতাকে করে তুলেছে অনিবার্য। দুটি কবিতাতেই কবিরা শব্দ এবং শব্দধ্বনির হাতে অনি-বার্যভাবেই আত্মসমর্পিত। এই সমর্পণ এতই স্বতঃস্ফূর্ত এবং অকৃত্রিম যে উদ্ধৃত কবিতাংশে ব্যবহৃত শব্দাবলী থেকে যে-কোন একটি শব্দ বদলাতে গেলে সমগ্র কবিতাকেই হয়তো বদলাতে হবে। বিশেষত

নজরুলের কবিতাটি পাদের অন্ত্যমিলের উপর দাঁড়িয়ে আছে বলে এই প্রয়োজন হয়ে পড়বে অবশ্যম্ভাবী। পাদ অথবা পংক্তির অন্ত্যমিলের এমন যাদুকরী প্রভাব আছে বলেই অনেক সময় পদান্তের মিল কবিতায় পংক্তিরশেষের মিলের অভাবকে সম্পূর্ণতই পুষিয়ে দেয় কিংবা সেই অভাববোধকেই ঘুম পাড়িয়ে রাখে। নজরুলের উপরোদ্ধৃত পদ্যাংশের পদের অন্ত্যমিল স্তবক শেষে পংক্তির মিলের প্রয়োজনকেই ঘুচিয়ে দিয়েছে।

শুধু ইলোকোয়েন্সীধর্মী উচ্চারণে নয়, গভীর অনুভবের নিবিড় প্রকাশেও পর্বের অন্ত্যমিল এমন মহিমা সঞ্চার করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন উচ্চারণ করেন: রূপনারানের কূলে/জেগে উঠিলাম/জানিলাম/এ জগত স্বপ্ন নয়—তখনও পর্বান্তের এই মিলের মাধুর্য এবং মহিমা অনুভব করা যায়। শুধু পর্বান্তের কিংবা পংক্তি-শেষের মিলই যে কবিতাকে স্মরণীয় উক্তির মর্যাদা দান করে তা নয়, মিলবিহীন কবিতাতেও সুবিন্যস্ত পর্বক্রম এবং ছন্দ-ধ্বনির অনুসরণ কবিতাকে একই মর্যাদা দিতে পারে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যখন বলেন: একটি কথার দ্বিধা থর থর চূড়ে/বাসা বেঁধেছিল সাতটি অমরা/বতী, কিংবা, ফাটা ডিমের আর/তা দিয়ে কি ফল/পাবে/মনস্তাপেও/লাগবে না ওতে/জোড়া, তখন পর্বান্তের মিলের অভাব, পংক্তি-শেষের মিলের অনুপস্থিতি—এর কোনো কিছুই চেতনাকে স্পর্শ করে না। বরং মনে হয়, মিল থাকলেই যেন কবিতাটি স্মরণীয় উক্তির মর্যাদা থেকে স্খলিত হতো। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুভব্য বিষয় যা তা হলো এই যে যেখানে কবিতায় মিলের সাক্ষাৎ লাভের জন্যে স্মৃতি এবং শ্রুতি অনিবার্যভাবেই জাগ্রত হয়ে থাকে, সেখানে মিলের অনুপস্থিতি কিভাবে এবং কোন ঐন্দ্রজালিক গুণে পাঠকের চেতনাকে ভোলায়?

অন্ত্যমিলের আবশ্যকতা এবং এই ধরনের মিলের অনিবার্যতা সম্পর্কে পাঠক এতই সচেতন যে সাধারণভাবে মিলহীন কবিতার কথা তারা ভাবতেই পারে না। এই অনিবার্য প্রত্যাশা এবং পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা থেকেই সাধারণ কাব্যপাঠক নিটোল ছন্দোবদ্ধ অথচ অন্ত্যমিলহীন কবিতামাত্রকেই গদ্য কবিতার শিরোপা দিয়ে থাকেন। কিন্তু অন্ত্য-মিলহীন কবিতামাত্রই যে গদ্য কবিতা নয় এবং রীতিমতো ছন্দোবদ্ধ

কবিতাও যে মিলহীন কবিতা হতে পারে পাঠক মাত্রেরই এমন ধারণা নেই। অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতাপাঠের দীর্ঘদিনের অভ্যাস এবং এর সুপ্রাচীন ঐতিহ্যই কাব্যপাঠের এমন ধারণার উৎস।

কবিতায় মাত্রানুসারে শব্দ ব্যবহার, বক্তব্যের আবেগ এবং প্রকাশের তোড় অনুযায়ী পর্ব সংস্থাপন ও সুবিন্যাস একটি অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার। প্রতিটি শব্দের ধ্বনি ও মাত্রা সম্পর্কে যার স্পষ্ট ধারণা এবং উপলব্ধি আছে, অধিকন্তু যিনি সেই ধ্বনি ও মাত্রাকে নানাভাবে সংস্থাপিত এবং সুবিন্যস্ত করতে পারেন তিনিই বৈচিত্র্য সৃষ্টির অধিকারী। কবির পক্ষে যেমন এই অধিকার অর্জন জরুরী তেমনি পাঠকের জন্যেও এই জ্ঞান এবং বোধ আবশ্যক। কেননা, স্রষ্টাশিল্পী হিসেবে একজন কবি কোন অবস্থাতেই প্রথাগতরীতিতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, তিনি যেমন ভাবে, তেমনি বক্তব্যে, ঠিক তেমনি সে-সবের প্রকাশের রীতি প্রকরণেও নতুনত্ব এবং বৈচিত্র্য আনতে অভিলাষী হবেন। কিন্তু শুধুমাত্র সদিচ্ছাই এক্ষেত্রে তার জন্যে সুফলপ্রসূ নাও হতে পারে। এই বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সফলতা অর্জনের জন্যে তার পক্ষে যা অতি আবশ্যক তা হলো ছন্দের নানা প্রকৃতি, চারিত্র্য এবং কারুকাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান লাভ এবং কবিতাকে শিল্প হিসেবে ফলিয়ে তোলার ব্যাপারে এ সবের পারস্পরিক ভূমিকা বিষয়ে অবহিতি। অন্যপক্ষে পাঠকের যদি কবিতার নানারকম ছন্দ, ছন্দের প্রকৃতি ও চারিত্র্য এবং অন্তর্নিহিত কারুকাজ সম্পর্কে অন্তত প্রাথমিক ধারণা না থাকে কিংবা বোধ না জন্মায়, তাহলে কবিতার রসোপভোগে তা বাধা হয়ে দাঁড়ানো অসম্ভব নয়।

নতুনত্বের অভিসারী কবি তার মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনে নব্যরীতিভঙ্গীর অনুসারী স্বভাবতই হয়ে থাকেন—তিনি কবিতায় শব্দ, ছন্দ, ছন্দোধ্বনি ইত্যাদিকে নানাভাবে খেলান, বিচিত্ররূপে বাজিয়ে বাজিয়ে তোলেন। তার হাতে প্রচলিত ছন্দের রীতি, মাত্রার গৃহীতশক্তি ইত্যাদি সব কিছুই ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করে। তিনি কবিতার প্রতিটি পর্ব ও পংক্তিকে বিচিত্ররূপে সংস্থাপিত ও বিন্যস্ত করেন। বিশেষত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শোষণশক্তি এবং প্রবাহমানতার যে অপরিসীম ঐশ্বর্য রয়েছে সে সম্পর্কে যে-কবি সচেতনতার পক্ষে এমনতর পরীক্ষা-

নিরীক্ষা ও নতুনতত্ব সৃষ্টির সৃজনশীল প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করা খুবই স্বাভাবিক্। অক্ষরবৃত্ত পয়ারের সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে যার ধারণা স্পষ্ট এবং এর প্রতিটি পর্ব—পূর্ণ অথবা অপূর্ণ যা-ই হোক না কেন, যার অধিগত, কেবল তিনিই পারেন পর্ববিন্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে, এবং তার হাতেই সম্ভব মিলবিহীন পংক্তির পর পংক্তি সাজিয়ে অন্ত্য-মিলের দ্যোতনা জাগানো। অক্ষরবৃত্তে একটি বর্ণ বা হরফ যে এক মাত্রক—কবির জন্যে এ জ্ঞান প্রাথমিক হলেও এবং এই ছন্দে যুগ্মধ্বনি শব্দমধ্যে এক মাত্রার মর্যাদা পায়—একথা জানা থাকলেও, সর্বক্ষেত্রেই যে প্রতিভাধর ও ছন্দনিপুণ কবিরা এই নিয়ম মেনে থাকেন তা নয়। ভাবযতির স্বাভাবিক প্রয়োজনে এবং পর্ববিনাসের চারিত্র্যধর্ম অনুসারে অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও যুগ্মধ্বনি শব্দপ্রান্তে ও কোথাও কোথাও শব্দমধ্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে দ্বিমাত্রার মর্যাদা পেতে পারে।

অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে একই পংক্তিতে পর পর একাধিক যুগ্মধ্বনিকে এরূপ মূল্য দেওয়া হলে সাধারণত অক্ষরবৃত্তের স্বাভাবিক চারিত্র্য বদলে গিয়ে তা মাত্রাবৃত্তের চারিত্র্যরূপ অর্জন করা অস্বাভাবিক নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অপরিসীম শোষণশক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা একে সুকঠিন নিয়মরীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী তাঁরা এমন ব্যবহারকে সাধারণত ছাড়পত্র দিতে চান না, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দ-প্রান্তিক যুগ্মধ্বনির দ্বিমাত্রা অর্জনকে ছন্দোত্রুটি বলেই জ্ঞান করেন।

কিন্তু ছন্দোবিষয়ে যত নিয়ম-রীতিই লিপিবদ্ধ থাকুক না কেন, কবির সৃজনীপ্রেরণা এবং সৃষ্টিশীল মন সব সময় সেই অলংঘনীয় নিয়ম-রীতির পথ ধরে আত্মপ্রকাশ করে না। মানবস্বভাবের মধ্যে এবং মানু-ষের আচার-আচরণের প্রতিটি দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রকাশে অর্থাৎ মানুষের প্রায় সব রকম ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েই ছন্দ তথা তান, মান, লয় ইত্যাদি স্বয়ংপ্রকাশ। এ কারণেই ছান্দিক-প্রকরণ এবং বিধিবদ্ধ নিয়মরীতি না জানা সত্ত্বেও, কিংবা আদৌ সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেও, মানুষ ছন্দ নিয়ে খেলা করতে ভালবাসে। বস্তুতঃ, প্রাণীমাত্রেরই ছন্দো-জ্ঞান, তান, মান, লয় ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা—অন্ততঃপক্ষে কিছুটা স্বাভাবিক বোধ আছে। এই স্বভাবজ কারণেই সৃষ্টির মুহূর্তে কবির পক্ষে অবলীলাক্রমে ছন্দোধ্বনিকে আশ্রয় এবং অবলম্বন করে আত্ম-

প্রকাশ সম্ভব হয়। যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দ কঠিন নিয়মের অধীন এবং যার পক্ষে এলিয়ে পড়া সম্ভব নয়, অপরিসীম শোষণ ক্ষমতার অধিকারী বলেই যে-ছন্দের দাঢ্যগুণ সমধিক, সেই অক্ষরবৃত্ত ছন্দেও সৃজনশীল এবং অনুপ্রাণিত কবিরা মাত্রাবৃত্তের আমেজ সৃষ্টি করতে পারেন। সাধারণভাবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতায় ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ যে-কোনো মাত্রার পর্বে অন্ত্যমিল কিংবা অনুপ্রাস সৃষ্টির পরিসর খুবই সীমিত। অথচ এমনও লক্ষ্য করা যায় যে সৃষ্টিধর্মী কবিরা সেই সীমিত পরিসরের মধ্যেও মিল এবং অনুপ্রাসের চমৎকার নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে এর এক উজ্জ্বল উদাহরণ মেলে। কবিতাটির সূচনা এইভাবে: হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে; দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তি: চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা/মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পর/কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। ছন্দের চারিত্র্য অনুসারে এতে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের মাত্রা শক্তি, বর্ণ বা হরফ অনুসারেই নির্ণিত। সে হিসাবে প্রথম পংক্তিটি অর্থাৎ হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে—সর্বমোট ২২-মাত্রার অধিকারী এবং এর পর্ববিভাগ এইরূপ: হাজার বছর ধরে/আমি পথ হাঁটিতেছি/পৃথিবীর পথে=৮+৮+৬=২২, অথচ দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তি অর্থাৎ চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা—সর্বমোট ১৮-মাত্রার অধিকারী এবং এর পর্ববিভাগ এইরূপ: চুল তার কবেকার/অন্ধকার/বিদিশার/নিশা =৮+৪+৪+২=১৮ অথচ কবিতাটিতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর চারিত্র্য অনুসারে এর পর্ববিভাগ সহজেই হতে পারে এইরূপ: চুল তার/কবেকার/অন্ধকার/বিদিশার/নিশা=৪+৪+৪+৪+২=১৮, আবার একটু টেনে, এগিয়ে আবৃত্তি করলে এর মাত্রাশক্তি ৪+৪+৫+৪+২=১৯ মাত্রা হওয়া ও বিচিত্র নয়। কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত হলেও এই পংক্তিতে ব্যবহৃত শব্দাবলী (অন্য দুয়েকটি পংক্তিতেও আছে) মাত্রাবৃত্তের চারিত্র্যধর্মী, এমন কি 'অন্ধকার' শব্দটিতে অন্ত্যস্থ যুগ্মধ্বনি 'একমাত্রা' গণ্য হওয়া সত্ত্বেও। অধিকন্তু, পংক্তিটিতে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্ত্যমিলের সাযুজ্যে যে অনুপ্রাসের সৃষ্টি হয়েছে তাও মাত্রাবৃত্তের এই চারিত্র্যের কারণেই।

কবিতাটির অন্যান্য পংক্তিতে শব্দ ব্যবহারের প্রকৃতিই এমন যে তাতে মাত্রাবৃত্তের চারিত্র কল্পনা করা যায় না এবং সে কারণে অনুপ্রাসের প্রত্যাশাও অর্থহীন। অথচ কবিতাটির শেষ পংক্তি: 'থাকে শুধু অন্ধকার/মুখোমুখি বসিবার/বনলতা সেন = ৮+৮+৬ = ২২ মাত্রার প্রথম দুই পর্বেও অনুপ্রাসের জাদু সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের কবিতাতে অনুপ্রাস সৃষ্টির সুযোগ এবং সম্ভাবনা বেশী। অথচ অনুপ্রাণিত কবিতায় কবির আত্মপ্রকাশ অবলীলাময় হয়ে উঠলে অক্ষরবৃত্তের কবিতাতেও যে পংক্তি কিংবা স্তবকবিশেষে আশ্চর্য অনুপ্রাস সৃষ্টি হতে পারে জীবনানন্দের আলোচ্য 'বনলতা সেন' কবিতাটিতেও রয়েছে এর চমৎকার পরিচয়।

অনুসন্ধান এবং পর্যবেক্ষণ করলে সৃষ্টিশীল কবিদের রচনায় এমন ব্যবহারের নজির অবশ্যই মিলবে। সেসব কবিতা পাঠে স্বতঃই মনে হবে যে সৃষ্টিপ্রেরণা ও আত্মপ্রকাশ অবলীলাময় হয়ে উঠেছে বলে ছন্দের এমন অনায়াস কারুকাজ সম্ভব হয়েছে। সচেতনপ্রয়াসে অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারকে মাত্রাবৃত্তধর্মী করে তোলা কিংবা বেছে বেছে শব্দ আহরণ করে শব্দানুপ্রাস সৃষ্টির প্রয়াসে কবিতার স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত হওয়া স্বাভাবিক। কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'বেস্ট ওয়ার্ডস ইন বেস্ট অর্ডার' অর্থাৎ কবিতা 'সর্বোত্তম বিন্যাসে সর্বোত্তম শব্দাবলী' অথবা 'সুন্দরতম শব্দাবলীর' 'সুন্দরতম বিন্যাস'। যদিও এই বক্তব্যে 'সর্বোত্তম শব্দাবলীর' কথা বলা হয়েছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে এতে ছন্দের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়নি, তবুও 'সর্বোত্তম বিন্যাস' কথাটির মধ্যেই ছন্দের প্রসঙ্গটি সংগোপন রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শব্দের 'সর্বোত্তম বিন্যাস' কথাটির অর্থই হলো শুধু বাছা বাছা শব্দাবলী নয়, প্রয়োজনীয় মাত্রানুসারে শব্দনির্বাচন এবং সে সবের সুষ্ঠুতম প্রয়োগ। ছন্দোবদ্ধ কবিতায় পর্বনির্মাণে যেখানে ঠিক যত মাত্রার শব্দ আবশ্যক ঠিক তত মাত্রার শব্দ নির্বাচনই জরুরী: কারণ, এই সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়েই সম্ভব 'সর্বোত্তম শব্দের' ব্যবহার এবং 'সর্বোত্তম বিন্যাস'। বিশেষত অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় যুগ্মধ্বনি শব্দমধ্যে সাধারণত একমাত্রা হিসাবে গণ্য বলে এই নির্বাচন হয়ে পড়ে আরও বেশী বিধিবদ্ধ। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত

এবং স্বরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় শব্দ নির্বাচনের ব্যাপারটি কিছুটা ভিন্নরূপ। কারণ, মাত্রাবৃত্তে বদ্ধাক্ষর সর্বদা দুইমাত্রার এবং স্বরবৃত্তে বদ্ধাক্ষর সচরাচর এক মাত্রার মর্যাদা পায়; অবশ্য কোথাও যে এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়, এমন বলা চলে না। কবির সৃজনক্ষমতা এবং ব্যবহার-কৌশলের ওপরই এর বৈচিত্র্য ও সার্থকতা নির্ভরশীল। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের সেই রূপের পরিচয় বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি, ক্রিয়াকলাপ ও অঙ্গভঙ্গির মধ্যে জন্মগতভাবেই যে ছন্দের একটা আসন পাকাপাকি হয়ে আছে সে প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে যাকে ছন্দ বলা হয় তারই কিছুটা ব্যাপক, চিহ্নিত ও শৈল্পিকনাম মুদ্রা। নৃত্যে ছন্দ কথাটির চেয়ে মুদ্রা কথাটিরই ব্যবহার। অঙ্গভঙ্গী ও তার প্রকাশের সুনির্দিষ্ট এবং শিক্ষিতধারার অভিব্যক্তিকেই বলা যেতে পারে মুদ্রা। কিন্তু সুনির্দিষ্ট এবং শিক্ষিতধারার অভিব্যক্তি ছাড়াও অঙ্গভঙ্গীর একটা স্বাভাবিক ও সহজ অভিব্যক্তি আছে—যেমন আছে গানের, আছে উচ্চারণের। এর প্রত্যেকটিকেই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, অনুশীলন ও পরিচর্যার মাধ্যমে সুষ্ঠু, সুন্দর এবং আকর্ষণীয় করে তোলা যায়।

যেহেতু সহজাত এবং স্বভাবগতভাবেই ছন্দ মানুষের কিছুটা আয়ত্ত সে কারণে অনুশীলন ও পরিচর্যার ব্যাপারে তা সহায়ক হিসাবেই বিবেচিত। কিন্তু এই সহজাত ও স্বভাবগত ছান্দিক-বোধ এবং তার প্রকাশ যেহেতু; কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতির অধীন নয় সে কারণে তাকে কোনো বিশেষ ছন্দ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না, অন্তর্ভুক্ত করা চলে না কোনো সুনির্দিষ্ট ছন্দ-গ্রুপের অধীনে। ছন্দের বিশেষ স্বভাব, চারিত্র্য এবং রীতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যাদের বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও বিশেষ বোধ আছে তারা অবশ্য এই স্বাভাবিক প্রকাশ এবং অভিব্যক্তিকেই বিশেষ বিশেষ ছন্দের চারিত্র্য-ধর্মের পরিচয়ে চিহ্নিত করতে পারেন।

নৃত্যপরতা মানুষের স্বাভাবিক স্বভাব-প্রকৃতিরই অঙ্গ। শুধু শারীরিক অভিব্যক্তিতে নয়; মানুষের উচ্চারিত বাণী এবং সঙ্গীতের মধ্যেও এই নৃত্যপরতার পরিচয় আছে। এ-কারণেই লক্ষ্য করা যায়

যে আত্মপ্রকাশের সূচনা-পর্বে কবিরা সাধারণত ছন্দের আশ্রয় এবং অভিব্যক্তির অবলম্বন হিসাবে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দকেই গ্রহণ করে থাকেন। মনোভাবের প্রকাশ ও উপলব্ধির উৎসারণের জন্যে রচনা-কর্মের আশ্রয় গ্রহণের আগে সাধারণত মানুষের যে অবলম্বন ও মাধ্যম আয়ত্তে থাকে তা হলো নৃত্য এবং সঙ্গীত। কিন্তু নৃত্য যেহেতু মুদ্রা-আশ্রয়ী এবং সঙ্গীত সুরাশ্রয়ী সে কারণে এসবে যে ছন্দের সাশ্রয়-প্রকাশ তা প্রধানত স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত। সঙ্গীতের সুর ও কথার ছন্দোভিত্তি প্রধানত মাত্রাবৃত্ত—কারণ মাত্রাবৃত্তের চারিত্রই এই যে এতে বদ্ধাক্ষর সর্বদা দুই মাত্রা; আর এ কারণেই এই ছন্দে ধ্বনির দ্যোতনা, সুরের আশ্রয় এবং দোলা রয়েছে। সঙ্গীতের জন্যে এই কয়টি চারিত্র-বৈশিষ্ট্য অতি অপরিহার্য, কারণ সঙ্গীতে শুধু কথাই উচ্চারিত হয় না, সেই সঙ্গে সুরাশ্রয়িতাও প্রকাশ পায়।

সঙ্গীতে কথার অর্থাৎ বাণীর গুরুত্ব বেশী না সুরের গুরুত্ব অধিক এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বাণী ছাড়া সুরের অস্তিত্ব সম্ভব, কিন্তু সুর ছাড়া বাণী—অন্তত কাব্যগীতিকায়, অকল্পনীয়। সুরের এই গুরুত্বের নিরিখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সুর ছাড়া গান আলো নেভা প্রদীপের মতো।' সব কবিতা গীত হয় না সত্য, কিন্তু কবিতা-মাত্রেরই গীতলতা থাকা সম্ভব এবং স্বাভাবিক। সাঙ্গীতিকতা কবিতার একটি অপরিহার্য গুণ, কিন্তু সঙ্গীতমাত্রেই কবিতা নয়। সাঙ্গীতিকতা কবিতার একটি অপরিহার্য গুণ এবং কবিতায় এর উপস্থিতি কোনো না কোনোরূপে অনুভবযোগ্য। এই গুণ আছে বলেই দক্ষ সুরকারেরা যে কোনো ছন্দের কবিতাকেই সুরের আশ্রয়ে কাব্যগীতিতে পবিণত করতে পারেন। মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তে রচিত কবিতাকে অপেক্ষাকৃত সহজে কাব্য-গীতিতে পরিণত করা চলে, কারণ মাত্রাবৃত্তে ধ্বনি-দ্যোতনা, দোলা এবং সুরাশ্রয়িতা রয়েছে, অধিকন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দ যেহেতু চরিত্রগত দিক থেকেই 'বিলম্বিত লয়ের ধ্বনি প্রধান' সে কারণে সঙ্গীতের সুর বিস্তারের ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা সম্ভবত সর্বাধিক। এ কারণেই যেসব কবি গীতিরচনায় সুদক্ষ এবং সুরের বৈচিত্র্যের সাথে যাঁদের পরিচয় অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ, তাঁরা সাধারণত মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দের কারুকাজকে নিজেদের অভিব্যক্তির মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন।

এমন যে মহাকবি মধুসূদন---যিনি বাংলা পয়ার তথা অক্ষরবৃত্ত-ছন্দে নতুন গতি ও প্রাণ-সঞ্চার করেছেন---অন্ত্যমিলের বেড়া ভেঙে ভাব-যতি অনুসারে অক্ষরবৃত্ত-ছন্দে যতিপাত ঘটিয়ে এই ছন্দের প্রবাহ-মানতা বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনিও গীতিকবিতায় আশ্রয় নিয়েছেন প্রধানত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের। এর কারণ খুঁজতে গেলেও সেই গীতি-ধর্মিতার প্রসঙ্গ আসে, আসে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাঙ্গীতিক-প্রকৃতির কথা। উল্লেখনীয় যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতাও গীত হতে পারে এবং সুদক্ষ সুরকারেরা অক্ষরবৃত্তে রচিত কোনো কোনো কবিতায় চমৎকার সুরারোপও করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা' সনেট কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে সনেটের প্রকৃতির মধ্যেই সাঙ্গীতিকতা রয়েছে এবং আদিতে সনেট-কবিতাও গীত হতো। কিন্তু সুরকারের দক্ষতা সত্ত্বেও এই কবিতাটিতে আবৃত্তির ঢং-টাই প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে, ধ্বনির দ্যোতনা এবং সুরের দোলা হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করে না; অন্যপক্ষে মধুসূদনের সুবিখ্যাত গীতিকবিতা 'বঙ্গভূমির প্রতি' গীত হয়ে প্রাণ মনে দ্যোতনা ছড়ায়। এর কারণ, 'রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে' অন্তর্গত ধ্বনিদ্যোতনা ও সুরাশ্রয়ের দরুন চেতনায় আবেগ ও অনুভূতির স্পর্শ রাখে। অন্যপক্ষে 'হে বঙ্গভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' অক্ষরবৃত্তে নিবন্ধ এই চরণটি সুরারোপেও আবৃত্তির ঢং-ছাড়িয়ে তান-লয়ে তেমন বিস্তার লাভ করতে পারে না।

সুরকার এবং গায়কেরা অবশ্য 'ধীর লয়ের তান প্রধান' ছন্দকে গাইবারকালে 'বিলম্বিত লয়ের ধ্বনিপ্রধান' করে তুলে অক্ষরবৃত্তের চারিত্রকে মাত্রাবৃত্তধর্মী করেন এবং এভাবেই সুরের ফাঁক পরিপূরণ করে নেন, কিন্তু এ সত্ত্বেও তাতে সুরের প্রাণ পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয় না। বস্তুত, গীতিকবিতার জন্যে মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তই আসলে প্রধান অবলম্বনীয় ছন্দ। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে যে আবির্ভাব মুহূর্তে তাঁরা উভয়েই মূলত গীতি-কবিতা রচনা করেছেন এবং ছন্দের দিক থেকে তখন তাঁদের প্রধান অবলম্বন হয়েছে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। কাব্য-সাধনার সূচনা-পর্বে

'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' রচনাকালে কৃত্রিম মৈথিলী ও ব্রজবুলি ভাষার আবরণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : মরণ রে/তুহুঁ মম/শ্যাম সমান/ মেঘবরণ তুঝো/মেঘ জটাজুট/রক্তকমলকর/রক্তঅধরপুট/তাপ বিমোচন/করুণা কোর তব/মৃত্যু অমৃত করে দান। অন্যপক্ষে, প্রাথমিক পর্যায়ে গান রচনাকালে আত্মপ্রকাশের সেই সূচনা-পর্বে নজরুল গান বেঁধেছেন : আলগা করো গো/খোঁপার বাঁধন/দীল ওঁহি মেরা/ফস গয়ি/বিনোদ বেণীর/জরীণ ফিতায়/আন্ধা এশক মেরা/কস গয়ি।

কবিতা রচনারও বহু আগে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল উভয়েই সঙ্গীতে আত্মনিবেদিত হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে যে এই সূত্রেই তাঁদের উপর মাত্রাবৃত্ত-ছন্দ ব্যবহারের প্রবণতা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। স্মরণযোগ্য যে, ছান্দসিক-কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতায় ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে নৈপুণ্য ও নবতর কলা-কৌশলের পরিচয় স্বাক্ষরিত করেছেন তার ক্ষেত্রও প্রধানত মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত। ছান্দসিকদের মতে প্রস্বর বা প্রস্বনের ভিত্তিতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যে 'নতুন ছন্দ' গড়ে তুলেছেন তাও প্রচলিত স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্তেরই ভিন্নরূপ। স্বরবৃত্ত মূলত 'দ্রুতলয়ের শ্বাসাঘাত প্রধান' ছন্দ। শব্দচয়নের প্রকৃতি অনুসারে এই দ্রুতলয়িতা এবং শ্বাসাঘাতেরও প্রকৃতি বদলায়। বস্তুত, শুধু স্বরবৃত্তের কবিতায় নয়, এমন কি মাত্রাবৃত্তের কবিতায়ও শব্দচয়নের প্রকৃতি অনুসারে এই শ্বাসাঘাতের চারিত্র বদলাতে পারে। বিলম্বিত লয়ের ধ্বনিপ্রাধান্যের স্থানে দ্রুতলয়ী শ্বাসাঘাতের অধিষ্ঠান সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়, যদিও তা পর্ব-বিশেষে সম্ভব হতে পারে।

স্বরবৃত্ত ছন্দের একটা সুবিধা, এই যে মূলত ঝোঁক-প্রধান ছন্দ হলেও মাত্রাবৃত্তের মতোই এ ছন্দও সুরাশ্রয়ী এবং এ কারণেই এর নৃত্যপর চারিত্রধর্ম অনুসারে দ্রুতলয়ী উচ্চারণে কিংবা টানা টানা উচ্চারণে ফাঁক ভরাট করে নিয়ে পর্ব-সমতা আনয়ন সম্ভব হয়। কিন্তু এই ছন্দে ছন্দ-পতনের সম্ভাবনাও এর মধ্যেই নিহিত, কারণ এর দুরূহ অথচ 'সূক্ষ্ম ধ্বনি-রহস্য' সম্পর্কে সচেতন না থাকলে পতনের সম্ভাবনা হয়ে ওঠে অতলস্পর্শী। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নিয়ম ও প্রকৃতি অর্থাৎ এই ছন্দ 'বিলম্বিত লয়ের ধ্বনিপ্রধান' এবং এতে বদ্ধাক্ষর দুই মাত্রা হিসাবে গণ্য—এই তথ্যটুকু জানা থাকলে উচ্চারণ-

কালে 'ছন্দদোলার মধ্যলয়ের' প্রকৃতি অনুসারে শব্দ-চয়নের ক্ষেত্রে মাত্রা ও তাল অনুযায়ী এই আহরণ অনেকখানি সহজ হয়; কিন্তু স্বরবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনার সময়ে 'এই ছন্দ দ্রুতলয়ের শ্বাসাঘাত প্রধান' এবং এতে 'ছন্দদোলার দ্রুতলয়ের' জন্যেই বদ্ধাক্ষর একমাত্রা-রূপে গণ্য—এই সাধারণ তথ্যটুকু জানা থাকলেই এর নির্ভুল ব্যবহার সম্ভব হয় না। কারণ মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের উল্লিখিত সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও শব্দচয়নের বিশেষ প্রবণতার কারণে এবং স্বরবৃত্ত ছন্দ ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের মতোই সুরাশ্রয়ী হওয়ায়, কখনো কখনো স্বরবৃত্তে মাত্রারবৃত্তের অনুপ্রবেশ ঘটে যায়। বিশেষত স্বরবৃত্তের শ্বাসাঘাত (একসেন্ট) সম্পর্কে যার চেতনা প্রখর ও তীক্ষ্ণ নয় তার হাতে এমন ঘটা খুবই স্বাভাবিক।

উল্লেখনীয় যে দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষায় অর্থাৎ ব্যবহারিক গদ্যেও অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্তের চারিত্র লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বরবৃত্ত মূলত ঝোঁকপ্রধান এবং নৃত্যপর বলে কথোপকথনের ভাষায় ও দৈনন্দিন ব্যবহারিক সংলাপে এর উপস্থিতি একান্তরূপে বিরল। বিশেষত এই ছন্দে শ্বাসাঘাত সাধারণত পর্বের বা শব্দের আদ্যাক্ষরেই (আসলে আদ্যাক্ষরদ্বয়ে) পড়ে, বলে এর উচ্চারণ হয়ে যায় অনেকখানি কৃত্রিম; কৃত্রিম, কারণ এতে অযুগ্ম অক্ষরকেও সহযোগী অক্ষরের সহায়তায় প্রায় যুগ্ম করে তোলা হয়।

উদাহরণ: বাদলা কালো/স্নিগ্ধা আমার/কান্তা এলো/রিমঝিমিয়ে, বৃষ্টিতে তার/বাজলো নূপুর/পাঁয়জোবেরই/শিঞ্জিনী যে/লক্ষণীয়, এখানে প্রথম চরণের প্রথম পর্বে বাদলা শব্দটির সাধারণ ও স্বাভাবিক মাত্রা-শক্তি তিন, মাত্রাবৃত্তে বিলম্বিত লয়ের ধ্বনিপ্রাধান্যের কারণে এই শব্দটি তিনের অধিক মাত্রা-শক্তি অর্জন করতে পারে; কিন্তু স্বরবৃত্তে বাদলার বাদ একমাত্রক এবং লা একমাত্রারূপে গণ্য, এখানে 'বাদ' শব্দাংশটি যুগ্মধ্বনি না হয়েও বদ্ধাক্ষররূপে উচ্চারিত হবার দরুন তা একমাত্রার শক্তি অর্জন করেছে, অন্যপক্ষে. 'কালো' শব্দটির মাত্রাশক্তি যথারীতি দুই-ই। হয়তো গাইতে গেলে 'বাদলা' বিলম্বিত লয়ের হয়ে তিনমাত্রা কিংবা তারও অধিক মাত্রাশক্তি অর্জন করতে পারে। মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তের কবিতায় সুরাশ্রয়িতাব কারণেই এমনটি সম্ভব।

কিন্তু ছন্দ এবং সুরের কান প্রখর না হলে বিভ্রান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। স্বরবৃত্ত ছন্দের এই 'যুগ্ম ধ্বনি-রহস্য' সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই, এবং হয়তো বা কিছুটা এর নৃত্যপর লঘু-প্রকৃতির জন্যে, একালের কবিরা এই ছন্দের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশে তেমন প্রলুব্ধ হন না; তুলনামূলক পর্যালোচনায় লক্ষ্য করা যাবে যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এবং তা-ও প্রধানত অমিল অক্ষরবৃত্তে কবিতা রচনার দিকেই একালের কবিদের প্রবণতা বেশি। অধিকন্তু, এও লক্ষ্যযোগ্য যে ছন্দের চাইতে ছন্দস্পন্দ, এবং মিল-বিন্যাসের চেয়ে অমিল প্রবহমানতার দিকে অধিক প্রবণতার দরুন কবিরা যাকে বলে 'ফ্রি ভার্স' (গদ্য কবিতা) রচনার প্রতিই অধিক মনোযোগী। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত—ইত্যাদি যে কোন ছন্দেই কবিতা রচিত হোক না কেন, তাতে কবিকে ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা কৃত্রিম আরোপিত নিয়মের অধীন হতেই হয়, ফলে শব্দচয়নে, পর্ব-নির্মাণে, মিল-বিন্যাসে সাধ্যানুসারে স্বাধীনতা নেওয়া সত্ত্বেও, সর্বপ্রকার নিয়মরীতির উর্ধ্বে উঠে মুক্তবন্ধ হওয়া সম্ভবপর হয় না; অথচ বিচিত্র জীবনের জটিল অন্ধিসন্ধির রূপকার একালের কবিদের তাঁদের আত্মপ্রকাশের আবেগই তেমন প্রথাগতরীতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে শেখায় না, কেবলি বিদ্রোহের প্ররোচনা দেয়; কিন্তু 'সার্থক বিদ্রোহী' হবার ক্ষমতা কয়জনেরই বা আয়ত্তে। তাই সবার পক্ষে মধুসূদনের মতো নিয়ম-মেনে নিয়ম-ভাঙ্গা অর্থাৎ ছন্দ মেনে নিয়েই প্রথাগত-রীতির ছন্দের বেড়া-ভাঙ্গা সম্ভব হয় না। আর হয় না বলেই ব্ল্যাংক ভার্সের (অমিত্রাক্ষর) বদলে 'ফ্রি ভার্স' (গদ্য কবিতা) রচনার দিকেই ঝোঁকটা প্রবল হয়ে ওঠে।

সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতির অধীন ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনেকটা প্রথাবদ্ধরীতিতে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়, এবং সে-ক্ষেত্রে সামান্যতম বিচ্যুতিকেও ছন্দরসিকেরা ছাড়-পত্র দিতে চান না; কিন্তু 'ফ্রি ভার্স' রচনার সুবিধা এই যে তাতে ঐসব ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা নেওয়া চলে; ফ্রি ভার্সের প্রতি কবিদের ঝোঁকের উৎস সম্ভবত এটাই। অবশ্য 'বহিরাচারী ছন্দমাপকে' বর্জন করলেও কবিতায় শব্দের অন্তরাশ্রয়ী যে ছন্দ এবং পরস্পর বন্ধনে যার দ্যোতনা—সেই-ছন্দকে বর্জন করা সম্ভব নয়, এবং বর্জন

করতে গেলে কাব্যছন্দের মুক্তি তো দূরের কথা, কাব্যসৃষ্টি হওয়াই অসম্ভব। কারণ, প্রচলিত ছন্দের চারিত্র্য এবং পরিমাপ অনুসরণ না করলেও, প্রত্যেকটি শব্দের এবং সে-সবের পরস্পর বন্ধনের যে একটি ধ্বনিগত সুসাম্য, মিল এবং দ্যোতনা আছে এ-সম্পর্কিত সচেতনতা মুক্ত ছন্দের অনুসারী কবির জন্যেও অপরিহার্য। কারণ, মুক্তছন্দের কবিতা রচনা ক্ষেত্রেও শব্দ-নির্বাচনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতা কবিতার সুশৃংখল আন্তরপ্রকৃতিকে বিনষ্ট করে দিতে পারে। কারণ, গদ্য-কবিতার ছন্দ যদিও সুনির্দিষ্ট কিংবা নিরোপিত ছন্দ নয়, তাহলেও ছন্দ-স্পন্দ (রিদম) এবং যাকে বলা যেতে পারে ছন্দের অন্তপ্রবাহ কিংবা চোরাস্রোত তা-ও শব্দনির্বাচনের এই স্বেচ্ছাচারিতার দরুন বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

'ফ্রি ভার্স' বা গদ্য-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী গদ্যাত্মক হয়েও অনেকখানি কাব্য-ধর্মী এবং এই চারিত্র্যের কারণেই উল্লিখিত বিশেষ রীতির কবিতা 'গদ্য-কবিতা' এই অভিধায় চিহ্নিত। ছন্দোবদ্ধ এবং পদ্যবন্ধের কবিতায় যে ধরনের শব্দ নির্বাচিত এবং ব্যবহৃত হয়, অনিবার্য কারণেই তার কিছুটা অলংকৃত ও প্রসাধিত চারিত্র্য থাকে—থাকে কাব্যগন্ধী লাবণ্যের ছটা। নিরোপিত ও সুনির্দিষ্ট ছন্দে এ-ধরনের শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বিধিবদ্ধ, কিন্তু গদ্য-কবিতায় শব্দ-নির্বাচন ও ব্যবহারের প্রশ্নে এমন রীতিবদ্ধতা অপরিহার্য নয়, একারণেই গদ্য-কবিতায় শব্দ্-নির্বাচন ও ব্যবহারের স্বাধীনতা কিছুটা বেশী। কিন্তু তবু, যেহেতু গদ্য-কবিতা মূলত কবিতাই এবং এই কবিতার ও ছন্দের চোরাপ্রবাহ রয়েছে সে কারণে সাধারণত ছন্দে-নিপুণ কবির হাতেই গদ্য-কবিতাও প্রাণবান এবং সজীব হয়ে ওঠে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলতে গেলে কবিতার ভাষার যে 'অভব্য বস্তুতন্ত্র' তাতেও ছন্দঃস্রোত প্রবাহিত; এবং শব্দের 'ক্যাডেন্স' অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ মূলত বক্তব্যের ও সে-অনুসারে উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনিত। অতিনিরূপিত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় শব্দের এই ক্যাডেন্স অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ প্রাধান্য পায় না, কারণ সেখানে মাত্রানুযায়ী শব্দ উচ্চারিত হয় বলে এবং ভাবযতি অনুসারে ছেদ পড়ে বলে, পূর্ণ এবং অপূর্ণ

পর্বে ছন্দই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে; কিন্তু গদ্য-ছন্দের কবিতায় শব্দের ক্যাডেন্স বা স্বরপ্রবাহই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গদ্যছন্দের প্রকৃতি অনেকখানি অন্তর্নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনা মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রত্যক্ষ, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, কিন্তু গদ্যছন্দের পরিমাণবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে অলংকারশাস্ত্রের সাহায্যে এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখে না যে যেহেতু গদ্য সহজ সে-কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।'

আসলে, 'গদ্য কিংবা পদ্য' যা-ই হোক না কেন, ভাষামাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে এই বোধ যার নেই তার পক্ষে 'অলংকারশাস্ত্রের সহায়তায় কোনো ছন্দই যথার্থরূপে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। ভাষার এই স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ এবং ছন্দোময়তা সম্পর্কে সচেতনতাই মাত্র ভাষার ব্যবহারকারীকে এর বৈচিত্র্যময় ছন্দ এবং ছন্দোপ্রকৃতি আবিষ্কারে সহায়তা করতে পারে। আর এ-কারণেই 'কবিতার ভাষা ও ছন্দ'সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনায় ছন্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার-বিবেচনার চেয়ে ভাষার যে অন্তর্নিহিত নিজস্ব ছন্দ সম্পদ এবং ধ্বনি-গৌরব রয়েছে তা-ই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

উৎস থেকে, উৎসে ফেরা

সাহিত্যে জীবন ও সমাজের ছবি খুঁজতে হলে প্রথমে কবিতার কাছেই যেতে হবে। কেননা, কবিতাই সাহিত্যের আদি ও প্রাচীনতম শাখা। কারো কারো মতে, 'কবিতা সাহিত্যের আদিতম রূপও বটে, আবার সুন্দরতম রূপও বটে।' কবিতা সাহিত্যের 'সুন্দরতম রূপ' কি না—এ নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে, কিন্তু কবিতা যে আদিতম রূপ তা অস্বীকারের উপায় নেই। কেননা, ইতিহাসের সাক্ষ্য তার পক্ষে। ইংরেজ কবি যখন বলেন, 'দি পোয়েট্রি অব দি আর্থ ইজ নেভার ডেড' তখন কবিতার এই আদিতম এবং সুন্দরতম রূপের কথাই একই উচ্চারণে ভাষা পায় কি না তাও ভেবে দেখার বিষয়।

কবিতা শুধু সাহিত্যের আদি রূপ নয়, কবিতা সাহিত্যের আদি উৎসও। এই উৎস থেকেই ক্রমান্বয়ে উৎসারিত হয়েছে সাহিত্যের অন্যসব ধারা। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি যে-কোন সাহিত্যধারার উৎস সন্ধান করতে হলেই শেষ পর্যন্ত যেতে হবে সেই কবিতার কাছেই। কেননা, কবিতা থেকেই উপজীব্য, রূপ ও আঙ্গিকের বিবর্তনের পথ ধরে জন্ম নিয়েছে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক এবং অন্যসব সাহিত্য-শাখা। ইতিহাসের সূত্রসন্ধান করে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, কবিতা কখনও কখনও 'একই অঙ্গে নানা রূপ' ধারণ করেছে। অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ স্বতন্ত্রভাবে জন্ম নেওয়ার আগে কবিতাকেই মেটাতে হয়েছে সবকিছুর দাবি। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক একই সত্তায় একীভূতরূপ ধারণ করেছে। এর কারণ, কবিতার জন্ম ব্যক্তিমনের ভাবানুভূতি এবং ব্যক্তিসত্তার আবেগ-আর্তি প্রকাশের তাড়না থেকে হলেও, ক্রমান্বয়ে সমাজমনের প্রকাশের দিকে

কবিদের মন ঝুঁকেছে। কেননা সৃষ্টির মুহূর্তে কবি নিঃসঙ্গ এবং তার নিজস্ব ভুবনের বাসিন্দা হলেও, সমাজ পরিবেশ ও সমাজ-সীমাতেই তার নোঙর বাধা। ফলে তার দৃষ্টিতে বৃহত্তর প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানবীয় পরিবেশ ধরা পড়েছে। এবং সমাজ-চিত্র রচনা, বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশকে কাব্যে ফুটিয়ে তোলা ও সমাজবদ্ধ মানুষের আশা-আকাঙক্ষা, আনন্দ-বেদনা ও হাসি-কান্নাকে ভাষা দেওয়ার জন্যে তাকে গড়ে নিতে হয়েছে কাব্যের বিচিত্র ও বিভিন্নধর্মী রূপ।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবানুভূতি প্রকাশে এবং আত্মগত তন্ময়তার উচচারণে কবি একান্তভাবে সন্তুষ্ট থাকেননি। সে-জন্যেই কবিতাকে করে নিতে হয়েছে ক্রমান্বয়ে সমাজ-মন ও সমাজ-সত্তার ভাবানুভূতির বাহনও। একান্ত 'ব্যক্তি অনুভূতির সঙ্গীতময় প্রকাশ' যে গীতি-কবিতা তা রচনার মধ্যেই চিরকাল কবির পক্ষে আত্মনিবেদিত থাকা সম্ভব হয়নি। কেননা কবির সামাজিকবোধই তাকে ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজের দিকে তাকাতে, পরিবেশকে কাব্যে ফুটিয়ে তুলতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে ব্যক্তি-জীবনের খণ্ডানুভূতির বদলে মানবজীবনের পরিপূর্ণ রূপের কাব্যরূপায়ণ ঘটাতে গিয়েই কবি ব্যাপক দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছেন। এই তাকানোর ফলেই জন্ম নিয়েছে গীতি-কবিতারও নানারূপ, সৃষ্টি হয়েছে মহাকাব্য। ব্যক্তি-অনুভূতির আগল ভেঙ্গে কবিকে বহির্জগৎ ও বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশের দিকে তাকাতে হয়েছে, ফলে কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে, 'বিষয়বস্তুর বস্তু-সত্তা'। গীতি-কবিতায় এভাবেই শুধু অনুভূতি-আবেগ নয়, বৃহত্তর সমাজ-পরিবেশ, সামাজিক মানুষের ভাবানুভূতি এবং আনন্দ-বেদনাও রূপ পেয়েছে, প্রকাশের প্রয়োজনে অবলম্বন করে নিয়েছে কাহিনী ও চরিত্রকে। 'গীতি-কবিতা' থেকে কবিতার 'গীতি-গাথায়' এই উত্তরণ কবির ব্যক্তিমন থেকে সামাজিক মনে অনুপ্রবেশ এবং সমাজপরিবেশ ও সমাজ-জীবনকে কাব্যের উপজীব্য করে নেওয়ার প্রবণতাজাত।

কিন্তু 'গীতি-কবিতা' কিংবা 'গীতি-গাথা'—যা-ই বলি না কেন, এই দু'য়ের মধ্যে রূপ ও চারিত্র্যের ভিন্নতা থাকলেও মূলগত একটি ঐক্য আছে। এই ঐক্যের ভিত্তি রচনা করেছে কবির ব্যক্তি-ভাবানুভূতি ও মানস-সহানুভূতি। 'গীতি-কবিতা' কিংবা 'গাথা-কবিতা'

—এই দুইয়ের মধ্যেই রূপ পায় প্রধানত ব্যক্তিমন ও সমাজ-মনের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন টুকরো ছবি, আংশিক আলেখ্য। কিন্তু কবির ব্যক্তিমন থেকে সমাজ-মনের দিকে যাত্রা এবং সামাজিক ছবিকে ফুটিয়ে তোলার আগ্রহই কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে 'গাথা-কবিতা' রচনায়। কিন্তু 'গাথা-কবিতা' ও অনেকখানি কবির কল্পনা-প্রতিভাজাত, মনোজ্ঞ সৃষ্টি, যদিও 'গাথা-কবিতায়ও' কাহিনীর কাঠামো এবং চরিত্রের আদল অনেক সময় নেওয়া হয় সমাজ-পরিবেশ থেকেই। সমাজ-জীবনের ছবি এবং সামাজিক চিত্র ব্যাপকতর পটভূমিতে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই কবিকে ক্রমান্বয়ে 'গীতি-কবিতা', 'খণ্ড-কবিতা', 'গাথা-কবিতা' থেকে আসতে হয়েছে কাহিনী-কাব্য রচনার দিকে। মহাকাব্যে সমগ্র মানবসত্তার পরিচয় কখনো কখনো প্রতীকে-রূপকে এবং রূপক ও প্রতীকাশ্রিত চরিত্রের সাহায্যে বাঙময় হয়। কিন্তু মহাকাব্যে সবসময় সমকালীন সমাজ ও জীবন-চিত্র রূপ পায় না, অধিকাংশক্ষেত্রেই প্রাচীন ও পৌরাণিক কাহিনীর আবরণেই জীবন ও জীবন-অভীপ্সাকে ফুটিয়ে তুলতে হয়।

কাহিনী-কাব্য, মহাকাব্য—যে বিশিষ্ট পরিচয়েই এগুলোকে চিহ্নিত করা হোক না কেন, 'একটি কাহিনী' বা 'আখ্যান-ভাগ' এর কাঠামোর অবলম্বন ছাড়া এই ধরনের রচনার বিকাশ এবং স্ফূরণ সম্ভব হয় না। আলংকারিকদের মতে, 'মহাকাব্যের স্বরূপ রচিত হয় কেবলমাত্র অন্যূন আটসর্গবিশিষ্ট বিপুল ঘটনাসমন্বিত পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীর স্বাভাবিক আকৃতিমণ্ডিত রূপায়ণে: মহাকাব্যের নায়ক সদ্বংশজাত, তার অধিষ্ঠানক্ষেত্র হবে স্বর্গ, মর্ত্য-পাতালব্যাপী বিরাট পটভূমিকা'। মহাকাব্যের এই সংজ্ঞা এবং চারিত্র্য আলংকরিকদের দ্বারা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া বলেই পৌরাণিক কাহিনী থেকে ঐতিহাসিক কাহিনীতে মহাকাব্যের পদার্পণ হলেও, সাধারণ জনমণ্ডলীর অর্থাৎ দেশের বৃহত্তর মানুষের কোন চিত্র 'মহাকাব্যে' রূপায়িত হয় না। ব্যক্তিমন থেকে সামাজিক মনে এবং ঐতিহাসিক পরিবেশ থেকে সামাজিক পরিবেশে ফিরে আসার জন্যেই কবিকে গীতি-কবিতা থেকে আসতে হয়েছে গাথা-কবিতায়, গ্রহণ করে নিতে হয়েছে 'গীতি-গাথা' ও 'গাথা কবিতা' রচনার ভাষা ও আঙ্গিক। এভাবেই খণ্ড-কবিতা বৃহত্তর

সমাজ জীবন ও বাস্তব পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলার, সামাজিক মানুষের টুকরো জীবন-চিত্র রূপায়ণের তাগিদে অবলম্বন করেছে ছোটগল্পের আঙ্গিক।

ছোটগল্প গদ্যে রচিত হলেও এর আদি উৎস যে কাব্য-কাহিনী, 'গীতি-গাথা', 'গাথা-কাহিনী' তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্যক্তি-জীবন ও ব্যক্তিমনের ভাবানুভূতি প্রকাশিত হয় গীতিকবিতায়, খণ্ড টুকরো অনুভূতির আলেখ্যে। ছোটগল্পেও রূপায়িত হয় ব্যক্তি-মন, ভাবানুভূতি এবং খণ্ডজীবনেরই ছবি। কিন্তু খণ্ডকবিতায় এবং গীতিগাথায় শিল্পীর মন পরিতৃপ্ত থাকেনি বলেই কাব্য-কাহিনীর জন্ম, জন্ম ছোটগল্পের। ঠিক তেমনি, মহাকাব্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর রূপায়ণ ঘটিয়ে, প্রতীক ও রূপকের ব্যঞ্জনা দিয়ে জীবননিষ্ঠ ও বাস্তব সমাজসচেতন শিল্পীর পক্ষে পরিতৃপ্ত-বোধ করা সম্ভব হয়নি। এ কারণেই তাকে তাকাতে হয়েছে বৃহত্তর সমাজ ও সমাজ পরিবেশের দিকে। ফলে জন্ম নিয়েছে মহাকাব্যের অনুসরণে উপন্যাস—কাহিনীর কাঠামোতে এবং সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা-গদ্যে। তাই শিল্প-চারিত্র্যে মহাকাব্যের সঙ্গে উপন্যাসের মূলগত পার্থক্য থাকলেও এ সত্য নিঃসন্দেহেই মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, মহাকাব্যের আদিরূপের অনুসরণেই উপন্যাস গড়ে উঠেছে। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের সঙ্গেই যে শুধু মহা-কাব্যের মিল রয়েছে তা নয়, সমাজ-সমস্যাভিত্তিক উপন্যাসের সঙ্গেও মহাকাব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সমাজমানসের পরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উপন্যাসের ধারা বদলেছে, তেমনি কালপরিবর্তনে এবং সমাজ সাযুজ্যের প্রয়োজনে মহাকাব্যও আর সনাতন রূপের আধার হয়ে থাকেনি, তার মধ্যে পরিবর্তনের ধারা লক্ষণীয়। অলংকারিকদের সংজ্ঞা-অভিধা না মেনে মহাকাব্যও হয়ে উঠেছে বিভিন্নতাপ্রয়াসী—জীবনের প্রয়োজনে, শিল্পের খাতিরে। কাহিনীর প্রথাগতরীতির বর্ণনা অনেকক্ষেত্রে বিসর্জন দিয়ে মহাকাব্যও হয়ে উঠেছে বিশ্লেষণমুখী, প্রতীক ও রূপকাশ্রয়ী। কিন্তু এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও অর্থাৎ উপন্যাস এবং মহাকাব্যের কাহিনী বা আখ্যানভাগ গৌণ হয়ে এলেও, এই উভয় রীতির শিল্প-কর্মের

মৌল উপজীব্য বস্তুত কাহিনীই। তবুও মনে রাখা দরকার, মহাকাব্যে ইতিহাস ও জাতীয় উত্থান-পতনের কাহিনীকে অবলম্বন করে, শৌর্য-বীর্য তুলে ধরার প্রেরণায় কাহিনীকার উন্মুখ, সেখানে জীবন-স্পন্দন ও অতলতার উপলব্ধির প্রয়াস তেমন নেই, কিন্তু, উপন্যাসকার শুধু জীবনকাহিনী বিন্যস্ত করেই তৃপ্ত নন, তিনি জীবনের গভীরতার অনুসন্ধানী, জীবন-জিজ্ঞাসার রূপকার। রসবেত্তাদের মতে, 'মহৎ উপন্যাস তাই শুধু তথ্য নয়, কল্পনার অলস বিলাস ত নয়ই, তা সমস্ত মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের অভিযান, উল্লাস, হতাশা, বিস্ময়, উত্তেজনা যার মধ্যে একাকার হয়ে আছে।'

কিন্তু 'সমস্ত মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের অভিযান' হলেও উপন্যাস যেহেতু একটি বিশিষ্ট দেশ ও সমাজপরিবেশের আলেখ্য এবং উপন্যাসের কাহিনী বা আখ্যানভাগের শিকড় ও বিশেষ দেশ এবং পরিবেশে প্রোথিত, সে কারণে উপন্যাসের পক্ষে মহাকাব্যের মতো একেবারে নির্বিশেষ হওয়া এবং সমকালীন জীবন-চিত্রকে পরিত্যাগ করা কিংবা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। উপন্যাসের পটভূমি বৃহত্তর বলেই, ছোটগল্পের তুলনায় অধিকতর সমাজ ও জীবননিষ্ঠ এবং সামাজিক পটভূমিকেন্দ্রিক হতে হয় উপন্যাসকে। খণ্ড-কবিতা বা গীতি-কবিতার তুলনায় ছোটগল্পকে অনেক বেশী ভিত রাখতে হয় সামাজিক জীবনে ও লেখকের কাছাকাছি সমাজপরিবেশে। কিন্তু তবুও, ছোটগল্পের পক্ষে একেবারে কাব্যধর্মী কিংবা পটভূমি-নিরপেক্ষ হয়ে উঠা অসম্ভব নয়। প্রথাগতভাবে কাহিনীবিন্যাস—অর্থাৎ যাকে বলে শুরু থেকে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবার যে বাঁধা ছক একালের গল্পকার তা আর পুরোপুরি অনুসরণ করেন না। প্রথাগত-রীতিতে একটি সুসমঞ্জস কাহিনীর অবতারণা না করে চরিত্রের গভীরতর সত্তা—যে সত্তা আজকের সমাজমানসের প্রতিনিধি তাকে আলোড়িত করে ছেঁকে তোলা এবং অনুভূতি-উপলব্ধির সংকেত বা ইংগিতময় প্রকাশনাই হচ্ছে অধিকাংশ আধুনিক গল্পকারের লক্ষ্য। এদিক থেকে একালের ছোটগল্পও কবিতার মতোই ইংগিতধর্মী।

উল্লেখ্য, উপন্যাস সাধারণত বিস্তারধর্মী। বিস্তার ও ব্যাপক হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। কিন্তু ছোটগল্পে বিস্তারের অবকাশ

স্বভাবতই কম। ইংগিতধর্মিতাই হচ্ছে বস্তুত ছোটগল্পের প্রাণশক্তি। কবিতায় ইংগিত প্রকাশ পায় রূপকল্প, চিত্রকল্প, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে—রূপপ্রতীকের প্রাণবন্ততা সে ইংগিতকে বিস্তারধর্মী করে তোলে। ছোটগল্পে কবিতার মতো রূপকল্প সৃষ্টির তেমন অবকাশ নেই সত্য, কিন্তু প্রতীকের ব্যবহার-নৈপুণ্যের মধ্যে দিয়ে ছোটগল্পেও সে ইংগিতের বিস্তার ঘটতে পারে। শিল্প-রীতির দিক থেকে আপাতদৃষ্টিতে ছোটগল্পের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য থাকলেও, আদিকালে কবিতার মাধ্যমেই ছোটগল্পের রসাস্বাদন হতো। উপ-ন্যাসকে যদি প্রাচীন মহাকাব্যের বিবর্তিত রূপ কিংবা গদ্যভাষণ বলা চলে, তা'হলে ছোটগল্পকে মহাকাব্যের খণ্ডাংশের কিংবা খণ্ড কবিতার মর্যাদা দিতে আপত্তির কোন কারণ থাকে না। ছোটগল্পকে যদি খণ্ডকবিতার মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা না জাগে, তা'হলে খণ্ড-কবিতায় যেসব লক্ষণের স্ফূর্তি অনুভবযোগ্য, ছোটগল্পের অবয়বে তার অনুসন্ধানও অন্যায় নয়। খণ্ড-কবিতায় আমরা ব্যক্তিমনের নানা ভাবানুভূতির যে পরিচয় পাই, কবির আত্মনিমগ্নতার কিংবা মগ্ন-চৈতন্যের যে পরিচয় লক্ষ্য করি, একালের ছোটগল্পে তার অনেক লক্ষণেরই পরিচয় মেলে। প্রশ্ন হতে পারে, তা হলে একটি খণ্ড-কবিতা ও একটি ছোটগল্পে পার্থক্য কোথায়? চারিত্রলক্ষণের দিক থেকে ছোটগল্পে ও খণ্ডকবিতায় সমধর্মিতা লক্ষ্য করা গেলেও এ দুইয়ের পার্থক্য সম্ভবত এইখানে যে কবিতায় কবি নিজে কথা বলেন, সেখানে মূলত চরিত্রের কোন অস্তিত্ব নেই; কিন্তু ছোটগল্পকার নিজে কথা বলেন না, প্রধানত চরিত্রের মুখ দিয়ে কথা বলিয়ে থাকেন, কিংবা কখনো কখনো চরিত্রের পক্ষে তার মনোভাবনা ও ভঙ্গীকে প্রকাশ করেন মাত্র। সে প্রকাশনা প্রধানত বর্ণনাধর্মী। উত্তমপুরুষেও যখন লেখক কথা বলেন, তখনও তিনি স্বীয় চরিত্রের কথা নিজের কণ্ঠে উচ্চারণ করেন মাত্র।

কিন্তু ছোটগল্প—কাহিনী বা আখ্যান থাক বা না থাক, বর্ণনা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণসূত্রেই ছোটগল্পেও এসে যায় কবিতার চারিত্র্যধর্ম। অর্থাৎ উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের

সহায়তায় বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও চরিত্রের মনোসমীক্ষণের সাহায্যে গভীর অন্তর-সত্তার পরিচয় উদঘাটনের প্রবণতা। এভাবেই ছোটগল্প এবং উপন্যাসও সীমিত অর্থে কবিতার চারিত্র্য পায়। এ যেন অনেকটা উৎস থেকে উৎসেই প্রত্যাবর্তনের মতো। শুধু কি ছোটগল্প কিংবা উপন্যাস? দৃশ্যকাব্য যে নাটক, তাতেও কবিতার অনুপ্রবেশ ঘটে অনেকটা এভাবেই। স্মরণীয়, মহাকাব্য, কাহিনী-কাব্য এবং সে-সবের বিবর্তিত রূপ ছোটগল্প ও উপন্যাসের মতোই, নাটকও প্রধানত কাহিনী বা আখ্যানভিত্তিক। ছোটগল্পে ও উপন্যাসে কাহিনী রূপ পায় বর্ণনা ও বিশ্লেষণের পথ ধরে। কিন্তু নাটক যেহেতু শুধু পঠিতব্য নয়, অভিনয়তব্যও, সে কারণে নাটকে ছোটগল্প-উপন্যাসের মতো বর্ণনা বা বিশ্লেষণের তেমন অবকাশ নেই। কেননা, নাটকে চরিত্র কথা বলে, চরিত্রের মুখে যিনি ভাষা যোগান—সেই রচয়িতা অর্থাৎ নাট্যকার থাকেন নেপথ্যে, তার আত্মপরিচয় গোপন থাকে অন্তরালে, যদিও অনেক চরিত্র তিনি গড়েন তার নিজেরই মনের ভাবনা-বেদনা, হাসি-কান্না আনন্দ-অশ্রু মিশিয়ে।

কিন্তু নাটক একান্তরূপে কল্পনার সৃষ্টি নয়, প্রতীক এবং রূপক হিসাবে হলেও, নাটকের চরিত্র আহরণ করতে হয় সমাজ-সীমা ও জীবনের পরিবেশ থেকে। মহাকাব্য কিংবা আদি কাহিনী-কাব্যের মতো পৌরাণিক আখ্যান আদিতে ছিল নাটকেরও উপজীব্য। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সমাজবোধ ও সমকালীন জীবনচেতনা প্রখর হওয়ার ফলে কাহিনী-কাব্যে এবং উপন্যাসে যেমন সমকালীন জীবন উপজীব্য হয়েছে, তেমনি নাটকেও অবলম্বিত হয়েছে সমকালীন জীবন-চিত্রও। নকশা, প্রহসন, কৌতুক ইত্যাদির পথ ধরে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটক থেকে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখা হয়ে উঠেছে একেবারে সমকালীন জীবন ও সমাজ-বাস্তবতা-নির্ভর। এবং এ-কারণেই নাটকে, কল্পনার পরিধি এসেছে অনেকটা সীমিত হয়ে। উল্লেখ্য, ছোটগল্প, উপন্যাস একান্তরূপেই পঠিতব্য বিষয়, এবং এর উপভোগও ব্যক্তিমনের ব্যাপার। কেননা, সম্মিলিতভাবে কয়েকজনে মিলে ছোটগল্প কিংবা উপন্যাস একসঙ্গে পাঠ করা যায় না। সম্মিলিতভাবে উপভোগের জন্যেই ছোটগল্প কিংবা উপন্যাসকে নাট্যাকারে রূপান্তরিত করে নিতে হয়।

নাটকের শিল্পমূল্য বস্তুত সাহিত্য মূল্যই নয়, মঞ্চের সঙ্গে এর শিল্পমূল্য বিশেষভাবে জড়িত। সাহিত্য হিসাবে নাটকের স্বতন্ত্র আবেদন থাকলেও, মঞ্চ-সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে নাটকের প্রধান সার্থকতা। কেননা, পাঠ্য সংলাপে আমরা চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, চরিত্রের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আমাদের মনে সঞ্চারিতও হতে পারে, কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে মঞ্চে যেভাবে চরিত্রের বিকাশ বা স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়া চলে, নাটক-পাঠের দ্বারা তা লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রোতা বা দর্শকের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে নাটকের অভিনয়, অপরিচিত জগৎকেও এক ধরনের বিস্ময়বোধের মধ্যে দিয়ে তখন একান্ত পরিচিত বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয়, যে জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড়, যে-প্রাত্যহিক জীবনধারার সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, মঞ্চে সে জগৎ ও জীবনধারার রূপায়ণ আমাদেরকে বিস্ময়ে অভিভূত করে—আমরা তার সুখ-দুঃখের ছবি দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি; কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো তখন একটা সামগ্রিক রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সৃজনশীল শিল্পী হিসাবে নাট্যকার জীবন ও সমাজের ছবি সব সময় অনুসৃত-উপায়ে হুবহু ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে ফুটিয়ে তুলে তৃপ্তি বোধ করেন না। ফলে তাকে নাটকে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, চরিত্রগুলোকে প্রাণবন্ত করতে হয় ভাবনা, অনুভাবনা ও মনোবেদনার রঙ লাগিয়ে। কখনো কখনো তিনি আশ্রয় নেন ইংগিত, রূপক ও প্রতীকের। নাটকের চরিত্রগুলো কথা বলে কবিত্বময় ভাষায়, কিছুটা হেঁয়ালিতে, কিছুটা রহস্যময়তায়। এমনকি নাটকের সংলাপে-চরিত্রের কথোপকথনের ভাষায় গদ্যের বদলে ব্যবহৃত হয় পদ্য বা কবিতা। মনে রাখা দরকার, কাহিনীকাব্য-মহাকাব্য—এমনকি কাব্য-কাহিনীতেও নাটকীয় উপাদান থাকে, থাকে সংলাপের ভাষা। কিন্তু সেই সংলাপ বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায় বলে তা ঠিক নাটকরূপে গণ্য হয় না। এজন্যই কাব্যনাটকেও চরিত্রের সংলাপ আলাদা করে নিতে হয়। এমনকি যে-সব নাটকের সংলাপ কবিতায় রচিত নয়, সেগুলোর সংলাপের গদ্যের মধ্যেও কবিত্বের আমেজ আসে।

বিশেষত ইঙ্গিতধর্মী, প্রতীকাশ্রয়ী ও রূপক-জাতীয় নাটকের সংলাপের ভাষায়। গদ্যে রচিত নাটকের চরিত্র যেভাবে কথা বলে, পদ্যে রচিত নাটকের চরিত্রের বাচনভঙ্গী তার চেয়ে স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র এই কারণে যে, কবিতার ভাষায় কথা বলাটা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত নয়। এই কারণেই কাব্যনাটক রচিত হয় সাধারণত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিষয় এবং চরিত্র নিয়ে। তবে, দৈনন্দিন জীবনের নাট্যরূপায়ণে কবিতার ভাষা বা কাব্যসংলাপ ব্যবহৃত হয় অনেকটা গদ্যাত্মক ভঙ্গীতে এবং কবিতার ভাষাও তখন গদ্যের ধার ছুঁয়ে যায়। বস্তুত, ইঙ্গিতধর্মিতা, রূপকীব্যঞ্জনা এবং প্রতীকাশ্রিতার প্রয়োজনেই নাটকও কবিতাকে আশ্রয় করে। গদ্যে রচিত নাটকের সংলাপেও কাব্য-ব্যঞ্জনা প্রশ্রয় পায়, সাহিত্যের আদি উৎস কবিতার দিকেই তার গতি হয়।

কবিতা ও অভিজ্ঞতা

শিল্পবেত্তাদের মতে, মানুষের অভিজ্ঞতাই কবিতার উপাদান। অভিজ্ঞতাকে উপজীব্য করেই কবিতা জন্ম নেয়। আবেগ-অনুভূতি, আর্তি-আকুলতা যাই বলি না কেন, সবই অভিজ্ঞতাজাত এবং আকাঙক্ষা থেকেই উদগত। অভিজ্ঞতা থেকে কবিতার জন্ম হলেও, অভিজ্ঞতা মাত্রই কবিতা নয়, অভিজ্ঞতার আন্তরিক এবং শিল্পরূপময় অভিব্যক্তিই কবিতা। কারণ, কোন-না কোন অভিজ্ঞতা সব মানুষেরই থাকে; কেননা, প্রতিনিয়ত নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই মানুষকে অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু সব মানুষের অভিজ্ঞতারই অভিব্যক্তি থাকে না, অভিব্যক্তিহীন উপলব্ধি কিংবা অভিজ্ঞতা এ কারণেই অনেকটা তাৎপর্য-রহিত। তাই, কবিতার ভাষা ও ছন্দ-সম্পর্কিত আলোচনার বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়:

সব অভিজ্ঞতা অবশ্য সকল মানুষকে সমভাবে অনুপ্রাণিত, উত্তেজিত কিংবা প্রতিক্রিয়া উন্মুখ করে তোলে না। কি ধরনের অভিজ্ঞতা কোন ধরনের মানুষকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করবে এবং তার অভিব্যক্তিই বা হবে কোন চরিত্রের তা নির্ভর করে ব্যক্তিগনের গড়নের ওপর, অভিজ্ঞতার অনুরণন ও আহ্বানে সাড়া দেবার মানস-সজাগতার ওপর। বলেছি, কবিতার বিষয় কিংবা কবিতাজননের উপযোগী অভিজ্ঞতা বলে কোনো স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা থাকতে পারে কিনা, এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে; কিন্তু যে, কোন অভিজ্ঞতাই কবিতা সৃষ্টির উৎস এবং উপজীব্য হতে পারে, যদি সেই অভিজ্ঞতার অধিকারীর কবিতা-জননের শক্তি থাকে। অভিজ্ঞতাকে কবিতায় রূপান্তরিত করার যে শক্তি ও শিল্প-প্রক্রিয়া তা কবির নিজস্ব অধিকারে। এবং এই শক্তি ও প্রক্রিয়া সব কবির সমানুপাতিক কিংবা একই চারিত্র্যের নয়; চারিত্র্যের

ভিন্নতার দরুন কবিশক্তিরও তারতম্য ঘটে, অনেক সময় শক্তির সুবিকাশেও বাধা সৃষ্টি হয়। এবং সেই অনুসারেই অভিজ্ঞতা নবতর অভিব্যক্তির মাধ্যমে যথার্থ কাব্যে পরিণত হয়েছে কিনা তা বিচার্য-বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কবিতার প্রকাশ এবং শিল্পরূপের বিচার-বিবেচনাও অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কবিতা ও কবির অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গেই এ বইয়ের গোড়ায় আমরা বলেছি :

কবি তার অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে তাকে অভিব্যক্তিময় এবং আকর্ষণীয় করে তোলেন। কবিতা শুধু শব্দ দিয়ে রচিত হয় না, কবিতা রচনার জন্যে ভাব বা বক্তব্যেরও প্রয়োজন হয়। হয়তো সে ভাব অস্পষ্ট, অনভিব্যক্ত কিংবা দুর্বোধ্যতা বা জটিলতায় আক্রান্ত হতে পারে—হতে পারে পরাবাস্তবধর্মী, ম্লান ও ধূসর। কিন্তু কবিতা রচনার জন্যে কোনো-না কোনো ভাব বা বক্তব্য অবশ্যই চাই। সে বক্তব্য যদি পূর্ণাঙ্গ নাও হয়, তবুও উপজীব্য বিষয়ের অবলম্বন অপরিহার্য। ভাবের এই আশ্রয় কবিতায় প্রাধাণ্য বিস্তার করবে, না রূপের মহিমা মুখ্য হয়ে উঠবে, তা-ও নির্ভরশীল কবি মানস ও কবিতা-জননের বিশেষ প্রক্রিয়ার ওপর। অর্থাৎ কিরূপে ও পদ্ধতিতে কবিতা গড়ে উঠবে---তার ওপর। এখানেই প্রশ্ন, কবিতা রচনা কি শুধু পরিশ্রমের দ্বারাই সম্ভব, না তার জন্য গভীরতর কোন জনন-ক্রিয়ার প্রয়োজন? বলেছি, অভিজ্ঞতা কবিতার জন্যে কাঁচা উপাদানমাত্র। এই কাঁচা উপাদানকে পরিশুদ্ধরূপে শিল্পসামগ্রীতে পরিণত করার জন্যে পরিশ্রম প্রয়োজন। কিন্তু এই পরিশ্রম যতখানি না শারীরিক তার চেয়েও অনেক বেশী মানসিক। কেননা, ভাবাক্রান্ত কিংবা অভিজ্ঞতার অধিকারী হওয়ামাত্রই কবির মনে প্রকাশের সঙ্গোপন আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে এবং সেই থেকেই শুরু হয়ে যায় তাঁর মানসিক সৃজন-ক্রিয়া। কিন্তু কবিতার লিখিত রূপসৃষ্টিতে অনেক সময়ই সেই আদি সৃজনাবস্থার চেহারা আমূল পালটে যায়, কবিতাটি সৃজিত হয় শেষ পর্যন্ত একেবারেই ভিন্ন আদলে। কেননা, মানুষের আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা কিংবা ভাবনাবেদনা যে-ভাবে মনে জন্ম নেয় এবং পরিবর্ধিত হয়, কোনো ভাষায়ই সব সময় তার অবিকল রূপ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। মনে রাখা দরকার, কবিতা সৃষ্টির জন্যে যে

ধরনের পরিশ্রম প্রয়োজন, তার চরিত্র অন্য সববিছুর চেয়ে আলাদা। শুধু পরিশ্রমই কাব্য-সাফল্যের নিয়ামক নয়, এর জন্য অকৃত্রিম এবং গভীর আবেগ-অনুভূতি, অনুপ্রেরণাও অপরিহার্য। কোনো একটি বক্তব্য বা ভাবনাকে উপজীব্য করে শব্দ এবং ছন্দের সহায়তায় কাব্য-সৃষ্টি হয়তো সম্ভব, কিন্তু মহৎ ও আকর্ষণীয় রূপরচনা সম্ভব কিনা, সেটাই প্রশ্ন।

কবি ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে ভাষা দেন; কখনো কখনো তার অভিজ্ঞতার এলাকা হয় আন্তর্জাতিক, কখনো বা দেশ-কাল নিরপেক্ষ। কবির অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় উপাদান হিসাবেই ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তিপট হিসেবে গ্রহণ করে তিনি শিল্পের সৌধ-নির্মাণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে নিজস্ব চারিত্র্যের ভিন্নতার দরুন এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন এবং প্রকাশ-রূপেরও ভিন্নতা ঘটে; যদিও একই যুগ-পরিসর ও সমাজ-পরিবেশে, একই সমকালীনতায় প্রায় একই ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতা একাধিক কবিতে সংক্রামিত হওয়া বিচিত্র নয়, অনভিপ্রেত নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাব্যরচনার ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, সব কবির অভিব্যক্তির ধরন কিংবা চারিত্র্য এক নয়। বলেছি, সব কবিই বক্তব্য বা ভাবনা প্রকাশের জন্যে শব্দ ও ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এমন কি সাধ্যমত অর্থাৎ কল্পনাপ্রতিভা ও সৃজন-ক্ষমতা অনুযায়ী উপমা-চিত্রকল্প সৃষ্টিতেও নিবেদিত হন, কিন্তু কবিতা, সৃষ্টির যে রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক শক্তি তা-কি শুধু শব্দ, ছন্দ এবং উপমা চিত্রকল্প রচনার ক্ষমতা আয়ত্তে আনার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব? শব্দ-প্রয়োগ, ছন্দোবৈচিত্র্য-সৃষ্টি এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষ-চিত্রকল্প রচনায় অনেকেই প্রশংসনীয় পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু সবার পক্ষেই ভাব ও শিল্পরূপের সমন্বয়-সাধনের মাধ্যমে সত্যিকার কবিতা রচনা সম্ভবপর হয় না। এ জন্যেই জীবনানন্দ দাশ বলেছেন: 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' এই 'কেউ কেউ কবি'রা যে শক্তির অধিকারী তাকে বলা যেতে পারে সৃজনী-কল্পনা বা কল্পনা-প্রতিভা—যে-প্রতিভা সৃষ্টি করে যাদু অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকতা, মোহনীয়তা। ইংরেজীতে যাকে বলে 'ইনকেনটেশন।'

বলেছি, অভিজ্ঞতাকে রূপময় ও আকর্ষণীয় অভিব্যক্তিতে পরিণত করার সহজাত ক্ষমতা সব কবির অধিকারেই থাকে না। সৃজনধর্মী কবি শুধু শব্দ দিয়ে কবিতা রচনা করেন না, শব্দকে অভিজ্ঞতার রূপকার এবং ভাবের বাণীবহনের উপযোগী করে তোলেন। বক্তব্যের চারিত্র্যে অনুসারে তাঁর রচনায় ছন্দের চারিত্র্যও নির্ধারিত হয়। অবশ্য কবিতায় কেউ নিছক ভাবাক্রান্ত, কেউ অভিজ্ঞতায় স্থিতধী, কেউবা অনেক বেশী প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ। এই উন্মুখতাই তাঁকে ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা থেকে সমাজকেন্দ্রিকতার দিকে নিয়ে যায়। মানস-সজাগতা ও প্রতিক্রিয়া-উন্মুখতা ক্রমান্বয়েই কবিতায় সম্প্রসারিত হয়ে যায়, গভীর অভিব্যক্তি লাভ করে। তখন ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি ও বিশুদ্ধ অভিজ্ঞতাকে নির্যাসরূপে উৎসারিত করার চাইতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সংকটের প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেওয়ার উন্মুখতা বৃদ্ধি পায়। সমাজ সচেতন ও যুগ সংকট সম্পর্কে সজাগ মানসিকতার অধিকারী কবিমাত্রেরই এমন উন্মুখতা স্বাভাবিক, কিন্তু সব রকম আবেগ অনুভূতি ও ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা ও প্রতিক্রিয়াকে যিনি ভাষা দেবেন, তাঁকেও আসতে হবে স্বপ্ন, সৌন্দর্য ও সৃজনীকল্পনার পথ ধরে। কেননা, শুধু অভিজ্ঞতার প্রকাশই নয়, শিল্প-রূপময় প্রকাশই কবির কাছে প্রার্থিত।

কবিতা ঃ দেশ ও সমাজ

কবি তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি, ভাবনা-বেদনা ও হাসি-কান্নাকে ভাষা দেন। কিন্তু সৃষ্টির মুহূর্তে একান্তরূপে নিঃসঙ্গ হলেও যেহেতু কবিও কোনো একটি বিশেষ দেশ এবং সমাজ-সীমার বাসিন্দা, সে কারণে তার রচনায় দৈশিক ও সামাজিক মনেরও প্রতিফলন ঘটে; কখনো প্রত্যক্ষ-ভাবে, কখনো পরোক্ষভাবে।

দৈশিক ও সামাজিক মনের প্রতিফলন এবং শিল্পরূপায়ণ ঠিক কিভাবে ঘটবে তা নির্ভর করে দৈশিক ও সামাজিক মনের সাথে কবির সম্পর্কের রূপ ও পরিধির ওপর; এবং এর রূপায়ণ ঘটে কবি-মনের বিশেষ গড়নের ছাঁচ ও রীতি অনুসারে। কেননা দেশ ও সমাজ অভিন্ন নয়, অভিন্ন নয় দৈশিক ও সামাজিক মনের সাথে কবির সম্পর্কও। কিন্তু দেশ এবং সমাজসীমার বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কবির রচনায় দৈশিক ও সামাজিক মনের রূপায়ণ বিভিন্ন রূপ পায়। এমনকি, যেখানে একই দেশ ও সমাজ-সীমার বাসিন্দা হিসেবে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ঐক্য থাকে, সেখানেও প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।

এর কারণ, কবিতা ব্যক্তিমনের সৃষ্টি এবং ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান। ব্যক্তিমন ও ব্যক্তি-প্রতিভার এই ভিন্নতা, প্রকাশের ক্ষমতার তারতম্য এবং দৈশিক ও সামাজিক প্রভাব প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দেয়ার মানস-সাজগতা নির্ধারণ করে কবিতা কিভাবে রূপ নেবে। অনেকে কবিতায় দৈশিক ও সামাজিক মনের ছবি বাস্তবতার পটভূমিতে ফুটিয়ে তুলতে আগ্রহী, অনেকে পরোক্ষভাবে নানা রূপপ্রতীকের আশ্রয়ে শিল্পরূপায়ণ ঘটাতে অভিলাষী। অনেকের রচনায় দৈশিক ও সামাজিক মনের প্রতিফলন তেমন বিম্বিতই হয় না, অনেকটা নিরবয়বে পরোক্ষ উচচারণে ভাষা পায়। কিন্তু দৈশিক ও সামাজিক মনকে এভাবে এড়িয়ে গেলেও, দেশের প্রাকৃ-

তিক ও সামাজিক পরিবেশকে একেবারে এড়ানো চলে না ; ফলে আন্তর্জাতিক মনোভাবনা এবং বিশ্বজনীন ভাবানুভূতিও স্বদেশের প্রাকৃতিক রূপ ও অনুষঙ্গের আধারে এবং নিজস্ব সামাজিক পরিবেশের পটে রূপ পায়।

স্বদেশের প্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশের সাথে কবির পরিচয় আবাল্য। জন্মসূত্রে এবং অনেকটা নিয়তি-নির্ধারিতভাবেই অন্য সব সামাজিক মানুষের মতই কবিও কোন না কোন একটি বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট দেশের বাসিন্দা। কারণেই যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে কবি আবাল্য লালিত-পালিত, সীমিত ক্ষেত্রে হলেও তার প্রভাব কবির মানস-চেতনায় মুদ্রিত হয়ে যায়, ফলে কবির আন্তর্জাতিক মনোভাবনা এবং বিশ্বজনীন ভাবানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়েও তাঁর আবাল্যের পরিচিত দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ছাপ তাঁর রচনায় রূপ পায়। তাঁর ভাষায়, ভাষার উচচারণে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্প ইত্যাদিতে স্বদেশ ও স্বসমাজের পরিচয় দীপ্ত হয়ে ওঠে। এমন কি, স্বদেশ ও স্ব--সমাজ-পরিবেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার পরও কবির ভাবনা-বেদনা, স্বপ্ন-কল্পনা ও আশা-আনন্দের অনুভূতিতে তা অভিঘাত হেনে যায়, স্মৃতি-চারণের সুখে, নষ্টালজিয়ার অনুভূতিতে, বিচ্ছেদ ও বেদনার দীর্ঘশ্বাসে বেজে ওঠে।

স্বদেশ, স্ব-সমাজ ও স্ব-ভাষা মানুষের চেতনায় অদ্বিতীয় সত্তা হয়ে যায়। কেননা, স্বদেশ ত্যাগ করা গেলেও স্ব-ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা ত্যাগ করা যায় না। কেননা, মাতৃভাষা তো শুধু মানুষের উচচারণেই ধ্বনিত হয় না, তার নৈঃশব্দের ভাবনায়, স্বপ্ন-কল্পনায়ও জড়িয়ে থাকে। এবং এ কারণেই অনুভূতি, আবেগ ও মানবিক সত্তায় মাতৃভাষার অধিষ্ঠান। বিদেশী ভাষায় মনোভাব প্রকাশের ক্ষেত্রেও মানুষকে তার মাতৃভাষায়ই, মনে মনে হলেও, ভাবনা চিন্তা করতে হয়, বক্তব্য ও ভাষা-চিত্র সাজিয়ে তুলতে হয়। আসলে বিদেশী ভাষায় যখন মানুষ কথা বলে, লেখে কিংবা অন্য কোন উপায়ে মনোভাব প্রকাশ করে, তখনও সে তার মাতৃভাষার ভাবনা-চিন্তাকে, তার জানা ও অধিগত বিদেশী ভাষাতেই অনুবাদ করে মাত্র।

শুধু ভাবনা-চিন্তা নয়, তার কল্পনার চিত্রও রূপ পায় তার

মাতৃভাষার সাহায্যেই এবং সেই কল্পনা-চিত্র কিংবা দৃশ্যবস্তুরও অনুবাদ হয় অন্য ভাষায়। কিন্তু সব ভাষায় কল্পনার সব চিত্র এবং দৃশ্য-বস্তু অনুবাদ করা সম্ভব হয় না। ফলে বিদেশী ভাষায় নিজের মনের ভাব বা বক্তব্য প্রকাশ করা গেলেও সব সময় এই কল্পনার চিত্র বা দৃশ্যবস্তু ফুটিয়ে তোলা যায় না; কেননা, চিত্র ফুটিয়ে তুলতে গেলেই রং ও রূপের প্রয়োজন হয়। কবিতায় এই রং ও রূপ ফুটিয়ে তুলে ভাষা, ভাষা-চিত্র, উপমা উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি অলংকার। এ কারণেই কবিতার অনুবাদে উপজীব্য, বক্তব্য অনেকখানি মূলের কাছাকাছি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হলেও অনুবাদে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের মূলানুসারী রূপান্তর অনেকক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। ফলত এটা সম্ভব হয় না বলেই কবিতার অনুবাদ 'কাশ্মীরী শালের উল্টো পিঠের' মতো হয়ে যায়। কেননা, কবিতায় প্রধানত উপজীব্য আহরিত হয় কবির নিজস্ব সমাজ-পরিবেশ থেকে। সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া থেকেই কবির অনুভূতিশীল সৃজনধর্মী মনে প্রথম অভিঘাত সৃষ্টি হয়। সেই অভিঘাত হয়তো প্রত্যক্ষভাবে সব কবির মনেই ভাষা যোগায় না, ফলে প্রতিফলন ও রূপায়ণ ঘটে না তাব রচনায়। কিন্তু সেই অভিঘাত তার চেতনায় ও মনোগহনে অবশ্যই সঞ্চারিত হয়ে যায় এবং পরোক্ষভাবে নানা রূপ-প্রতীকে হলেও কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

কবিতার ভাষার জন্যে কবিকে হাতপাততে হয় মাতৃভাষার ভাণ্ডারে, এবং যেতে হয় সচল সমাজ-জীবনের কাছে। অন্যদিকে কবি উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প ইত্যাদি আহরণ করেন তার স্বদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ থেকে। কেননা, তিনি কল্পনার জগৎ থেকে যে চিত্র, তুলনা, প্রতিতুলনা, উপমা ধরে আনেন তা ফোটাবার জন্যেও তাকে অবলম্বন করতে হয় স্বদেশ ও স্ব-সমাজ পরিবেশ। বিশেষত দেশের প্রকৃতি ও সমাজ তার আবাল্য পরিচিত বলে তার উচচারণে এই প্রকৃতি এবং সমাজই ভাষা পায়। বিদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে কবির পরিচয় প্রত্যক্ষ নয়, অনেকখানি পরোক্ষ; কেননা, বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশের সমাজ-পরিবেশ অবস্থানের অভিজ্ঞতা যার ব্যাপক ও গভীর নয়, তাকে প্রধানত অধ্যয়নলব্ধ অভিজ্ঞতা থেকেই বিদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা ও জ্ঞান অর্জন

করতে হয়। ফলে তার আবেগ-অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনায় তা তেমন গভীরভাবে মুদ্রিত হতে পারে না। এবং এ কারণেই বিদেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের রূপায়ণে তার রচনায় অনেকটা অনুকরণের চারিত্র্য পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে মিল এবং সাযুজ্য আছে, যেমন আছে সব ব্যক্তি-মানুষ এবং সমাজবদ্ধ মানুষের মধ্যে, তাদের আবেগ ও অনুভূতিতে। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার প্রকাশের ভাষা ভিন্ন হলেও তার রূপ মূলগতভাবে এক। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ হলেও, প্রত্যেকটি মানুষই এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা, নিজস্ব অনন্য ভুবনের বাসিন্দা। তেমনি এক বিশাল ভূমণ্ডলের অন্তর্গত হলেও, পারস্পরিক মিল ও সাযুজ্য সত্ত্বেও, প্রত্যেকটি দেশের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যেও বৈচিত্র্য আছে, আছে ভিন্নতা। এই ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশই রূপ পায় প্রত্যেক কবির নিজস্ব ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী কবিতায়। বিশিষ্ট প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের অধীন বলেই সব দেশের কবির রচনায় একই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিচয় মেলে না। নগরের প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ ও সমাজ-জীবন গড়ে ওঠে অনেকটা মানবীয় প্রচেষ্টায় কৃত্রিম উপায়ে। ফলে এই নির্মাণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সত্ত্বেও, পরিকল্পিত উপায়ে গড়ে তোলা হয় বলেই, নগর-নিসর্গে, নাগরিক সমাজে এবং নগর সৌন্দর্যে সব দেশেই সমধর্মী চরিত্র রূপ পায়। ফলে নগর-জীবনের রূপকার কবির রচনায় নগর-চিত্র, নাগরিক সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনার রূপায়ণে, ভাষায়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পে অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় আন্তর্জাতিক চেহারা এসে যায়। নগর-জীবন যতখানি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ঠিক ততখানি সামাজিক নয়। জীবিকার প্রয়োজনে দেশ-বিদেশের বিচিত্র চেহারা, চরিত্র ও মনোভাবের মানুষকেই এসে জড়ো হতে হয় নগরে, ফলে নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠে অনেকটা কৃত্রিমতার বন্ধনে। এই সমাজের বাহ্যিক ঐক্য দৃষ্টিগোচর হলেও অন্ত্যস্থ আবেগের মধ্যে থাকে ফাটল। তাছাড়া আন্তর্জাতিক তরংগাভিঘাতে নাগরিক জীবন ও সমাজ ক্রমাগত স্পন্দিত বলে, তাতে ঐক্যবোধ ও ঐক্যানুভূতির ঐতিহ্যবাহী

পট নির্মিত হয় না। ফলে নাগরিক সমাজ ও সমাজ পরিবেশ অনেকটা আরোপিত রূপ পায়। এ কারণেই নগর-জীবন সমাজের চেহারা ও চরিত্র হয়ে পড়ে প্রায় আন্তর্জাতিক।

কিন্তু গ্রামীণ প্রকৃতি, সমাজ ও সমাজ পরিবেশ গড়ে ওঠে অনেকটাই প্রাকৃতিকভাবে। গ্রামীণ সমাজ-জীবন কালে কালে পরিবর্তনের শিকার হয়েও ঐতিহ্যের নোঙর বেঁধে রাখে। কেননা, নাগরিক জীবন, সমাজ ও নিসর্গ অনেকটা মানুষের হাতে গড়ে তোলা বলেই তাতে পরিবর্তন হয় স্পষ্টতর, দ্রুততর। কিন্তু গ্রামীণ সমাজ-জীবন ও সমাজ পরিবেশে পরিবর্তন আসতে, তার নৈসর্গিক রূপে পরিবর্তন ঘটতে অনেক সময় যুগ-যুগান্তর কেটে যায়; তবুও প্রাচীন ও প্রাক্তণের চিহ্ন থেকে যায় তার মনের গভীরে, বাহ্যিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে। এই চিহ্নই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের স্বাতন্ত্র্যের স্মারক হয়ে থাকে। এভাবেই গ্রামীণ জীবন, সমাজ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ ভিন্নতা বজায় রাখে। এই ভিন্নতার চিত্রই কবিতাকেও দেয় স্বাতন্ত্র্যের মহিমা। কেননা, গ্রামীণ প্রকৃতি, সামাজিক জীবন ও পরিবেশ দেশে দেশে স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন বলেই, কবিতায় তাকে আলাদাভাবে চেনা যায়। এ কারণেই বৃহত্তর গ্রাম-জীবন ও গ্রামীণ মানুষের সংগ্রামশীলতা আশা-আকাঙক্ষা, দুঃখ-বেদনা, সমাজবদ্ধ জীবনের অভীপ্সা—এক কথায় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বাস্তব জীবনের প্রতিফলন যার রচনায় প্রত্যক্ষভাবে ঘটে না, তিনিও উপজীব্য আহরণে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্পের সন্ধানে বারে বারে গ্রামীণ জীবন, সামাজিক পরিবেশ ও প্রকৃতিতে ফিরে যান। এমনকি যিনি নাগরিক-জীবনকেই কবিতার পট হিসাবে ব্যবহার করেন, তার রচনায়ও রূপপ্রতীক ইত্যাদির পথ ধরে স্মৃতিচারণায়, নষ্টালজিয়ায় গ্রামীণ জীবন, সামাজিক পরিবেশ ও প্রকৃতি হানা দেয়। নগরের বিষণ্ণ ছবি, প্রাত্যহিকতার বিবর্ণতা, ব্যর্থতা বিষাদের অনুভূতি ও হতাশা এবং মানসিক ক্লান্তি কখনো কবি-মনে বিরূপতা ছড়ায়, তাই এক ধরনের বিরোধিতার মনোভাব ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থেকেও নগরের অধিবাসী কবিদের গ্রামীণ প্রকৃতি, জীবন ও পরিবেশের শরণ নিতে বাধ্য করে। তারা বহির্গত হয় মানসযাত্রায়। যারা গ্রামীণ প্রকৃতি জীবন ও সমাজ পরিবেশের সাথে আবাল্য

অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত, নগরীর অধিবাসী হয়েও যারা মানসিক দিক থেকে উদ্বাস্তু—প্রবাসী—তারা তো স্বপ্ন-কল্পনায়, আবেগে-অনুভূতিতে সেই ফেলে আসা ভুবনেরই বাসিন্দা। তাই তাদের উচ্চারণে সেই ভুবনের নৈসর্গিক রূপ-চিত্র, সমাজ-জীবন ও পরিবেশ বাঙময় হয়, নগর জীবনের পাশাপাশি বৃহত্তর গ্রাম-জীবনও বিম্বিত এবং ভাস্বর হয়ে ওঠে। এ ভাবেই দৈশিক ও সামাজিক মন ও জীবন কবিতায় ভাষা পায়।

সাহিত্যে দেশ, মাটি ও মানুষের কথাই রূপ পায়। দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, নৈসর্গিক সৌন্দর্যমহিমা এবং দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, স্বপ্ন-কল্পনাই বিচিত্ররূপে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। কখনো তা ভাষা পায় বাস্তবের বিশ্বস্ত অনুসরণ হিসাবে—অনেকটা ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে, কখনো বা পরোক্ষভাবে নানা রূপ-প্রতীকে। কিন্তু এই রূপায়ণ-রীতি যাই হোক না কেন, দেশ, মাটি, মানুষের চিত্রই সাহিত্যে ধরা পড়ে। এমন কি দেশ-নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ভাবানুভূতি এবং বিশ্বজনীন মানবিকবোধের রূপায়ণের ব্যাপারেও সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় স্বদেশের প্রকৃতি, মাটি, মানুষ অনেক সময় পটভূমি হিসাবে কাজ করে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সুনিবিড়, কেননা, প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই মানুষ বিচরণশীল এবং আজন্ম লালিত-পালিত। এ জন্যেই তার স্বপ্ন-কল্পনায়, প্রতিটি উচ্চারণে প্রকৃতি অলক্ষ্যেই অস্তিত্বের পরিচয় রেখে যায়। প্রকৃতি হয়ে ওঠে শিল্পী-সাহিত্যিকের রচনার উপকরণ ও অবলম্বন। স্বদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পরিচয় আবাল্য, অনিবার্য ও অন্তহীন। এই পরিচয়ই তাকে প্রাকৃতিক রূপ-বৈচিত্র্যের সন্ধানে, সৌন্দর্যের তৃষ্ণায় ও আর্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু প্রকৃতি তো কেবল রূপ ও সৌন্দর্য-সুষমার আধার নয়, নয় শুধু অনাবিল প্রশান্তির উৎসও। প্রকৃতি যেমন ভীষণ, তেমনি ভয়াল। তার এক অংগে দুই রূপ, এক রূপে সে স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত, অন্যরূপে নিষ্ঠুর ও রুদ্র। এই দুই রূপই ধরা পড়ে শিল্পী সাহিত্যিকের রচনায়—তাদের অনুভূতিশীল হৃদয় ও কল্পনা-প্রতিভার স্পর্শে হয়ে ওঠে প্রাণময়।

প্রকৃতি শুধু মানুষের সৌন্দর্যানুভূতি এবং রূপতৃষ্ণাই মেটায় না,

প্রকৃতি তার বেঁচে থাকার উপকরণও জোগায়। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যেই ফুল-ফসলের অবারিত সমারোহ, আবার প্রকৃতির বিরূপতায়ই মরুভূমির অনিঃশেষ হাহাকার। এ কারণেই সাহিত্যে-শিল্পে প্রকৃতি আসে সবুজের, প্রাণময়তার ও সম্ভাবনার প্রতীক হিসাবে, রূপায়িত হয় 'পোড়োজমি' কিংবা 'বিমুখ প্রান্তর'-এর রূপ-প্রতীকে ; কখনো কখনো বিরূপ প্রকৃতি সমগ্র মানব-সভ্যতার বন্ধ্যাত্বেরই প্রতীক হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতির প্রশান্ত ও রুদ্ররূপের এই প্রতীকী উপস্থাপন ছাড়াও, বাস্তবের বিশ্বস্ত আলেখ্য হিসাবেও সাহিত্যে শিল্পে তা রূপায়িত হয়। কখনো কখনো একেবারে ফটোগ্রাফিক নৈপুণ্যে। কিন্তু সাহিত্যিক-শিল্পী যেহেতু অনুভূতিপ্রবণ, সংবেদনশীল এবং সূক্ষ্মচেতনার কারিগর, সে কারণে তাতে কিছুটা হৃদয় ও কল্পনা-প্রতিভার রঙ লাগে। বাস্তবের বিশ্বস্তরূপও এ কারণে বাস্তবাতিরিক্ত মহিমা পায়, প্রতিষ্ঠিত হয় শিল্পের মর্যাদায়।

প্রসন্ন প্রকৃতি মানুষের জন্যে নিয়ে আসে তার দাক্ষিণ্যের উপহার, বিরূপ প্রকৃতি অপরিসীম মানবিক বিপর্যয়। প্রকৃতির এই বিরূপতার দরুনই অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বিস্তীর্ণ মাঠের ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে অগণিত মানুষ সহায়সম্পদ ও প্রাণ হারায়। অনেকে হয়ে পড়ে একেবারে ছিন্নমূল, উদ্বাস্তু। বিশেষত যেসব দেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক এবং কৃষি উৎপাদনও একান্তরূপে প্রকৃতির করুণার ওপর নির্ভরশীল, সেসব দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানবিক বিপর্যয়কেই অন্তহীন করে তোলে।

কিন্তু প্রকৃতির এই রুদ্র ও নিষ্করুণ রূপ সত্ত্বেও, মানুষের সংগে প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অংগাংগী। এই সম্পর্কের সূচনা সেই আদিকাল থেকে। প্রকৃতি আরণ্যক মানুষের জীবিকার উপকরণ জুগিয়েছে, তার স্বপ্ন ও সৌন্দর্য তৃষ্ণাকে করেছে পরিতৃপ্ত। দিগন্ত প্রসারিত বনানীর সবুজ শ্যামলিমা, পাহাড়-পর্বতের বিস্ময়কর ব্যাপ্তি ও সমুচ্চ মহিমা, নদী সমুদ্রের অবারিত প্রশান্তি এবং ফেনোত্তাল রূপ, আকাশের গাঢ় নীলিমা আদিকাল থেকেই মানুষের মনে ভয় ও বিস্ময়ের সাথে সাথে স্বপ্ন এবং সৌন্দর্যের অনুভূতিও জাগিয়েছে। আরণ্যক প্রকৃতির কোলে লালিত মানুষ যেমন এর অপরূপতায় বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছে, তেমনি সমতলভূমির মানুষও এর অফুরান ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য

ঐন্দ্রজালিক রূপ-সুষমায় মুগ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আদিকালের আরণ্যক মানুষের সেই বিস্ময়ের অভিব্যক্তির পরিচয় তেমন মেলে না, কেননা, তার শিল্প-রূপায়ণের প্রয়াস হয়নি সেই সুপ্রাচীনকালে। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে শিল্পচর্চার রূপ এবং পরিধিও হয়েছে সুবিস্তৃত, জন্ম নিয়েছে শিল্প ও সাহিত্য। শিল্প ও সাহিত্যের সূচনাকাল থেকেই প্রকৃতি হয়েছে এর বিচিত্রবিধ উপজীব্য। অনুভূতিশীল, আবেগপ্রবণ শিল্পী তার আত্মপ্রকাশের অবলম্বন হিসেবে বেছে নিয়েছে প্রকৃতির নানা উপাদান ও ঐশ্বর্যকে। প্রকৃতি তার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছে অপরিহার্য মডেল হিসাবে।

একালের শিল্প-সাহিত্য প্রধানত সংঘবদ্ধ সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি। শিল্পী-সাহিত্যিক কল্পনায় যতটা উদ্বাহু কিংবা অরণ্যচারীই হোন না কেন, সমাজবদ্ধ সামাজিক মানুষ হিসাবে তিনি একটি বিশিষ্ট দেশ ও পরিবেশে বাধা। তাই আদিকালের অরণ্যচারী মানুষের মতো শারীরিকভাবে আরণ্যক প্রকৃতিতে তার পক্ষে তেমনভাবে বিচরণ সম্ভব নয়। কিন্তু শিল্পী-সাহিত্যিকের রোমাণ্টিক স্বপ্নকল্পনা ও মানসিক পরিভ্রমণের কোনো চিহ্নিত এলাকা নেই। স্বপ্নকল্পনায় তার পক্ষে যথেচ্ছা পরিভ্রমণ সম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পরিবেশ তাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে, অব্যবহিত প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডল তাকে স্বতন্ত্রধর্মী ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করতে শেখায়। শিল্পী-সাহিত্যিকের ব্যক্তিমনের ভাবানুভূতি এবং স্বপ্ন-কল্পনার প্রকাশ ও শিল্পরূপায়ণে যেমন, তেমনি বৃহত্তর সামাজিক ও দৈশিকমনের অভিব্যক্তিতেও। এ কারণেই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের ভিন্নতার দরুন শিল্পের প্রকৃতি এবং রূপরীতিও ভিন্ন হয়ে যায়। শিল্পে প্রকৃতি সবসময় ফটোগ্রাফিক পদ্ধতিতে, একান্তরূপে মডেল হিসাবে আসে না, প্রকৃতি রূপায়িত হয় ব্যক্তিগত, সামাজিক ও দৈশিকমনের প্রতীক হিসাবে। বিশেষত সাহিত্যে প্রকৃতি অভিব্যক্তি পায় অনেকখানি বর্ণনা-ধর্মিতায়। কিন্তু সাহিত্যের আদি শাখা কবিতায় প্রকৃতি বর্ণনা থেকে ক্রমান্বয়ে যাত্রা করেছে রূপক ও প্রতীকের দিকে। কবিতায় রোমাণ্টিক স্বপ্ন-কল্পনার প্রকাশ, আধ্যাত্মিক হাহাকারের অভিব্যক্তি এবং ব্যক্তিমনের বিচিত্র অনুভূতি ও আবেগের রূপায়ণে প্রকৃতি সাহায্য করে

নানা রূপরীতিতে। অবশ্য এই প্রকাশের চারিত্র্য এবং অভিব্যক্তির রূপরীতিও কবিমানসের গঠন এবং কবিক্ষমতার তারতম্যের ওপর নির্ভরশীল।

নিছক ফটোগ্রাফিক চিত্র রূপায়ণে এবং বহির্মুখী বর্ণনায় সন্তুষ্ট না থেকে যারা বিশ্লেষণমুখিতার দিকে যাত্রা করেন, তারা প্রকৃতির রূপ ও বিচিত্র-ধর্মী উপকরণ ব্যবহার করেন রূপক ও প্রতীকাশ্রিতায়। এবং এ ভাবেই প্রকৃতি তাদের রচনায় নবতর তাৎপর্যে মহিমান্বিত ও ভাস্বর হয়। প্রকৃতি তখন হয়ে যায় জীবনেরই বিশেষ প্রতীকরূপ। প্রকৃতিকে কেউ প্রত্যক্ষ ও অনুভব করেন একটি সঞ্চরণশীল সত্তা হিসাবে, প্রাক্তনের খোলস ভেঙ্গে নবজীবনে জেগে উঠার প্রতীক হিসাবে। আশাবাদিতায় উজ্জ্বল কবি-মনে প্রকৃতির সজীবতা ও ঐশ্চর্যময় প্রাণসত্তা এভাবে রূপ নিলেও, হতাশায় আত্মনিমজ্জিত, মনোবিকলনের শিকার কবি প্রকৃতিকে কখনও কখনও অনুভব এবং পত্যক্ষ করেন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ভিন্নরূপেও। অর্থাৎ প্রকৃতি তখন নবজীবন ও জীবন-অভীপ্সার প্রতাক না হয়ে, হতাশা, অবসাদ এবং অসহায় আত্মসমর্পণেরই প্রতীক ও রূপক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কবিতায় প্রকৃতির এ ধরনের প্রতীকী উপস্থাপন এবং রূপকাশ্রিত ব্যবহার কল্পনাপ্রতিভাসম্পন্ন ও সৃজনীক্ষমতাধর কবির কাজ। বিশেষত যারা জীবনের গভীর উপলব্ধি ও দার্শনিক অধ্যয়নে সক্ষম, তারাই প্রকৃতিকে এমন গভীর ও ব্যাপক পটে প্রত্যক্ষ করেন। দৈশিক, সামাজিক কি ব্যক্তিগত মনের অভিব্যক্তি তখন গভীরতর তাৎপর্যে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। কিন্তু যারা প্রকৃতির এ ধরনের প্রতীকী ও রূপকী ব্যবহার এবং ব্যঞ্জনার দিকে ঝুঁকেন না, তারাও রোমাণ্টিক স্বপ্ন-কল্পনার প্রকাশে, বাস্তবজীবনের প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনে প্রকৃতি-আশ্রয়ী হতে বাধ্য হন। নদী-নালা, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, সবুজ অরণ্যানী কবিতায় নানাভাবে ছায়া ফেলে যায়। উপমা উৎ-প্রেক্ষা চিত্রকল্পে প্রকৃতির বিচিত্রবিধ উপাদান অবলম্বন হয়। কেননা, প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকেই আহরিত হয় এই সব উপাচার।

প্রকৃতি অর্থাৎ—নদী-নালা গাছ-পালা, আকাশ ও অরণ্য—এসবের কোনোটিরই কোনো নিজস্ব তাৎপর্যনিহিত অর্থ নেই। নেই কোনো সংস্কৃতি। কবির নিজস্ব ভাবানুভূতি, জীবন-দর্শন ও জীবনবেদের

প্রতিভাসেই ধরা পড়ে এ সবের সুগভীর অর্থ ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। কেন না, সংস্কৃতি মানুষের জীবনের অঙ্গ এবং মানুষেরই সাধনা ও চর্চার দান। প্রকৃতির নিজস্ব কোনো সংস্কৃতি নেই, মানুষের সৃজনীপ্রতিভার কল্যাণেই প্রকৃতিও হয়ে যায় মানুষের সাংস্কৃতিক সাধনা এবং অভিব্যক্তির অংগ। শিল্পে-সাহিত্যে, সংগীতে, নৃত্যে বিস্তার করে তার সুগভীর প্রভাব। কিন্তু প্রকৃতির এই সৃজনশীল ও নির্মাণধর্মী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ছাড়াও, আছে এর বিপর্যয়ধর্মী ধ্বংসকারী রূপ। বলেছি, একরূপে প্রকৃতি শান্ত, স্নিগ্ধ, শ্যামলিমাময়, অন্যরূপে প্রচণ্ড, ভয়াল ও বিধ্বংসী। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যে প্রকৃতির রুদ্র ও ভয়ালরূপের তুলনায় এর শান্ত, স্নিগ্ধ, প্রশান্তরূপের শিল্পরূপায়ণেরই যেন প্রাধান্য।

কবিতা ও স্বাদেশিক পটভূমি

বলেছি, কবিতা ব্যক্তিমনের সৃষ্টি এবং ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান। কিন্তু ব্যক্তি নিজস্ব ভুবনের বাসিন্দা হলেও, দেশ এবং সমাজ-সীমাতেই তার বিচরণ। কল্পনার জগতে তিনি যতই উদ্বাহু কিংবা আকাশচারীই হোন না কেন, বাস্তব কারণেই তাকে দেশ ও সমাজ-সীমায় ফিরে আসতে হয়, তাকাতে হয় নিজস্ব পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের দিকে। কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে একান্তরূপে নিজস্ব কল্পনার জগতে পরিভ্রমণ সম্ভব হয় না। কেননা, আপন পরিবেশ এবং নিজস্ব মাটিতেই তার সত্তার নোঙর বাঁধা।

স্বপ্ন ও কল্পনার জগতের বাসিন্দা কবির পক্ষেও তাই নিজের দেশ মাটি, মানুষ ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে ফিরে না-তাকিয়ে উপায় থাকে না। তাঁর কল্পনাপ্রবণ মন ও দিগন্ত-বিসারী দৃষ্টি দূরগামী হলেও, তা আপন-সন্নিহিত জীবন এবং পরিবেশেও আত্মপ্রকাশের অবলম্বন খুঁজে ফেরে। এ-কারণেই দেশীয় বিষয় তাঁর রচনার অবলম্বন হয়। রোমাণ্টিক মানস-প্রবণতায় তিনি প্রকৃতি-আশ্রয়ী হন, স্বদেশের সমাজ ও জনমানস তাঁর শিল্পকর্মে ছায়া ফেলে। এমন কি দেশ-কাল নিরপেক্ষ আদর্শ এবং মূল্যবোধের রূপকার হওয়া সত্ত্বেও, কবির আত্মপ্রকাশের অবলম্বন ও উচ্চারণে স্বদেশের জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশই বাঙময় হয়ে ওঠে।

কবি তাঁর রচনার ভাষা আহরণ করেন নিজের জীবন ও সমাজ থেকে। মাতৃভাষাই হয় তাঁর আত্মমুক্তির প্রধান অবলম্বন। আশৈশব পরিচিত এই ভাষাই তাঁকে আত্মপ্রকাশের প্রেরণা জোগায়; গ্রহণেচ্ছু মন, সৃজনী-প্রতিভা ও ব্যবহার-কৌশলের সাহায্যে তিনি নিজের মাতৃভাষা অর্থাৎ স্বদেশের ভাষাকেই সমৃদ্ধ এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলেন। মাতৃভাষা অর্থাৎ স্বদেশের ভাষার ঐশ্বর্য, রূপবৈচিত্র্য ও

প্রকাশক্ষমতা সম্পর্কে মনে কোনোরূপ ভ্রান্তি কিংবা সন্দেহ-সংশয় প্রশ্রয় পেলে বিদেশী সমৃদ্ধভাষার দ্বারস্থ হওয়ার প্রবণতা জেগে ওঠাও বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু বিদেশী ভাষায় কবির অধিকার যত ব্যাপক এবং গভীরই হোক না কেন, মাতৃভাষায়ই তাঁর সাধনা সবচেয়ে বেশী সিদ্ধি লাভ করে। কেননা, মাতৃভাষার সাথে তাঁর সম্পর্ক একান্তরূপে আত্মার সম্পর্ক, তাঁর স্বপ্ন-কল্পনায়, আবেগে-অনুভূতিতে আশৈশব মাতৃভাষার অপ্রতিহত প্রভাব।

কিন্তু সৃজনশীল কবিরা কখনো জীবনকে হুবহু অনুকরণ করেন না, জীবন থেকে উপজীব্য কিংবা উপকরণ নিয়ে তাকে সৃষ্টির মহিমায় নতুনভাবে উপস্থিত করেন। শুধু জীবনের বাস্তবতার রূপায়ণের ক্ষেত্রে নয়, জনজীবন থেকে আহরিত ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কবির এই নবনির্মাণ ও স্বজনশীল কর্মকাণ্ডের পরিচয় মেলে। কবি ভাষার ব্যবহারে যেমন জীবনের কাছে হাত পাতেন, তেমনি হাত পাতেন অন্যভাষার ভাণ্ডারেও। নিজেদের জীবন ও অন্য সমৃদ্ধ ভাষার ভাণ্ডার থেকে আহরিত শব্দ-সম্পদ, বাক-বিভূতির প্রয়োগে, উপমা-উৎপ্রেক্ষার নব-ব্যবহারে তিনি তাঁর রচনাকে আকর্ষণীয়, জীবন্ত ও প্রাণময় করে তোলেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও কবিকে রূপান্তর করে নিতে হয়, কেননা, মাতৃভাষায় অনুবাদ কিংবা দেশীয় পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হলেও, মাতৃভাষার সাহায্য নেওয়া ছাড়া চলে না। কারণ, বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের উপমা-উৎপ্রেক্ষা অথবা বাক্-বিভূতি এই রূপান্তর ও দেশীয়-পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়া স্বদেশী-ভাষায় তেমন অর্থপূর্ণ হতে পারে না।

তাই, কবিকেও তাঁর আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের জন্যে নিজের মাতৃভাষা অর্থাৎ স্বদেশী ভাষার আশ্রয় নিতেই হয়। জীবনের কোনো পর্যায়ে বিদেশী ভাষায় আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের মোহ জাগলেও, বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাঁকেও ফিরে আসতে হয় স্বদেশী ভাষারই কাছে। ভাষার পরেই আসে কবিতায় উপজীব্যের প্রশ্ন। কেননা, কোনো উপজীব্য কিংবা বক্তব্যবিষয় না থাকলে, শুধু ভাষার সাহায্যে আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরচনা তো অসম্ভব প্রস্তাবনা। কারণ ভাব বা বক্তব্যকে আশ্রয় করেই সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতোই কবিতারও রূপ রচিত হয়ে থাকে। এ-কারণেই বিশেষজ্ঞরা বলেন, ভাব নেই অথচ রূপ আছে, সৃষ্টির জগতে এমনটি সম্ভব হতে পারে না। তবে

সেই ভাব বা বক্তব্য অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম কিংবা পরোক্ষ থাকতে পারে, কিন্তু তাকে কোনো না কোনো রূপে অবশ্যই বর্তমান থাকতে হবে।

কবি স্বপ্ন-কল্পনার রূপকার, শুধু ভাব বা বক্তব্যের উপস্থাপক নন। তাই কোনো বক্তব্যের প্রকাশে, আবেগ-অনুভূতির রূপায়ণে তাঁকে স্বপ্ন-কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, সাধনা করতে হয় আকর্ষণীয় রূপরচনার। কিন্তু শুধু ভাষার সাহায্যে বক্তব্য বা ভাবের প্রকাশ সম্ভব হলেও, রূপ-রচনা সম্ভব নয়। ভাষা কবির বক্তব্য, স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-অনুভূতির প্রকাশের অবলম্বন অবশ্যই, কিন্তু রচনাকে রূপময় এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হলে শুধু ভাষার আশ্রয়ই যথেষ্ট নয়। এর জন্য দরকার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদির ব্যবহারও। কিন্তু কবি যত কল্পনা-প্রবণ, সৃজনশীল এবং রূপদক্ষই হোন না কেন, তাঁর পক্ষে কোন উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্পই একান্তরূপে স্বষ্টি করে নেওয়া সম্ভব নয়। আসলে কবি উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প ইত্যাদির কোনোটিই একেবারে মৌলিক-ভাবে স্বষ্টি করেন না; তিনি প্রকৃতি থেকে, চারপাশের চেনা পরিমণ্ডল থেকে, তাঁর অভিজ্ঞতা ও অধীত জ্ঞান থেকে এইসবের উপকরণ আহরণ করেন, এবং শিল্পকৌশল ও স্বজনী বিন্যাসে সেগুলোকে উপস্থাপিত করেন নতুনভাবে। এই আহরণ, বিন্যাস ও উপস্থাপনায় কবির সৌন্দর্যবোধ, সূক্ষ্ম-অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা-প্রতিভা বিশেষভাবে কাজ করে। কবিতার উপজীব্য বা বিষয় আহরণে কবিকে কোনো না কোনো উৎসের কাছে যেতে হয়; বলেছি, কবির পক্ষে কবিতার কোনো বিষয় সম্পূর্ণভাবে স্বষ্টি কিংবা আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না। একটি বিশেষ দেশ এবং সমাজ-সীমার বাসিন্দা বলেই কবি এই উপজীব্য এবং বিষয়ের আহরণেও প্রথমত, প্রধানতঃ নিজস্ব সন্নিহিত জীবন ও পরিবেশের কাছেই হাত পাতেন। নিজস্ব জীবন ও পরিবেশের সাথে আশৈশব অন্তরঙ্গ পরিচয় বলেই কবির পক্ষে এর রূপায়ণও হয় অপেক্ষাকৃত সহজ।

অপরিচয়ের উৎস থেকে, অধীত জ্ঞান থেকেও কবি রচনার উপজীব্য বা বিষয় আহরণ করতে পারেন, কবিরা তা করেও থাকেন। কিন্তু সব কবিরই প্রাথমিক পাঠক তাঁর নিজের দেশের এবং আপন পরিবেশের মানুষ। কবির বাণী ও প্রাথমিকভাবে নিবেদিত হয় তাদেরই উদ্দেশে। রচনার সৌন্দর্য, বক্তব্য বা বিষয়ের ব্যাপক ও গভীর ব্যাপ্তি, বিশ্বজনীন মূল্যবোধ

ইত্যাদি কবিতার আবেদনকে অবশ্যই দেশ ও কালের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে, পৌঁছে দিতে পারে সর্বমানবের কাছে ; কিন্তু কবিতার এই সার্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও, সব দেশের মানুষকেই তা সমভাবে আন্দোলিত, আলোড়িত করে না। যাদের জীবনের সাথে কবিতার ভাষা, বক্তব্য বা বিষয়ের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ তাঁদের কাছেই কবিতার আবেদন হয় সবচেয়ে বেশী ; এ-কারণেই কবি বৈশ্বিক হয়েও এক অর্থে দৈশিক। দৈশিক বলেই কবিকে তাঁর রচনাকর্মেও প্রধানতঃ দেশ-নির্ভর হতে হয়, দেশ-মাটি মানুষের জীবনকেই রূপায়িত করতে হয় তাঁর সৃজনকর্মে। তাই কবি আপন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের দিকে ফিরে তাকান, ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের প্রতি দৃষ্টি দেন। সমাজ-কেন্দ্রিকতা কবির অন্যতম চারিত্র্য হলেও, মুখ্যতঃ তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কেননা, কবিতা তো ব্যক্তিমনেরই সৃষ্টি। কিন্তু অন্য সব মানুষের মতোই কবিরা অনুভূতিশীল, আবেগপ্রবণ। বলেছি, শুধু পার্থক্য এই যে, কবিদের মতো সব অনুভূতি ও আবেগপ্রবণ মানুষেরই প্রকাশের ভাষা জানা থাকে না, দেখার ও বলার বিষয়কে শিল্পরূপময় করে তোলার ক্ষমতাও তাদের অধিকারে নেই।

অনুভূতিশীল এবং আবেগপ্রবণ বলেই অন্য মানুষের মতোই কল্পনার জগত এবং বাস্তব জগত—দুই-ই কবিদের মনে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। চলমান জীবন ও সন্নিহিত পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতা তাঁদের উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করে। তাই, ব্যক্তিজীবনের ভাবনা-বেদনা, হাসি-কান্না, আনন্দ-আর্তি, হতাশা-বিষাদ, আশা-আকাঙ্ক্ষার মতোই বৃহত্তর দেশ এবং জনমানসের এইসব আবেগ-অনুভূতিও কবির রচনায় নানা রূপ-রীতিতে ধরা পড়ে। সব কবিরই ব্যক্তিগত, দৈশিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া এবং আবেগ-অনুভূতিতে জেগে ওঠার ধরন, রূপরীতি এক ও অভিন্ন নয়। কেউ ব্যক্তিমনের প্রতীকে সমাজমন ও সমাজ-সত্তাকে প্রত্যক্ষ করেন, কেউ ব্যক্তিমনকে সমাজমন ও সমাজসত্তার দর্পণে প্রতিফলিত দেখেন। কোনো-কোনো কবির রচনা সমাজমন ও সমাজসত্তারই প্রতিনিধি কিংবা প্রতীক হয়ে যায়। কেউ কেউ দেশীয় ও জাতীয় মানসকেই কবিতায় একান্তরূপে বাঙময় করে তোলেন। এমনকি বিশ্বজনীন আবেগ-অনুভূতি ও মূল্যবোধের রূপকার কবিও এই সত্য বিস্মৃত হন না। কেননা কবির অস্তিত্ব প্রাথমিক ও প্রধানভাবেই নিজস্ব দেশ, সমাজ ও জীবন-

পরিবেশের মধ্যে নোঙর করা। তাই, যে-কবি সচেতনভাবে দৈশিক ও সামাজিক মন এবং নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশকে রচনায় ফুটিয়ে তোলেন না তাঁর শিল্পকর্মেও অনেকটা নিজেরই অজ্ঞাতে এবং সহজাতপ্রবণতায় দৈশিক ও সামাজিক মন, নিজস্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ ছায়া ফেলে যায়, প্রতিবিম্বিত হয়।

বলেছি, রচনার উপজীব্য আহরণে কবি হয়তো বিশ্বজনীন অনুভূতি ও আবেগে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈশিক ও সামাজিক মন এবং আপন সন্নিহিত পরিবেশে হাত না-ও পাততে পারেন। কিন্তু তাঁকে আপন মাতৃভাষা অর্থাৎ স্বদেশী ভাষার কাছে আসতেই হয়। উপমা-উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্প সৃষ্টির জন্যে নির্ভর করতে হয় নিজস্ব পরিমণ্ডল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর।

অধীত জ্ঞান থেকে তিনি বিষয় আহরণ করতে পারেন। উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প ইত্যাদির জন্যও হাত পাততে পারেন বিদেশী ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাহিত্যের ভান্ডারে। কিন্তু এইসব আহরণ রচনার জন্যে অনেকক্ষেত্রে সমৃদ্ধির কারণ হলেও, সর্বত্রই তা ধনাত্মক না-ও হতে পারে। কেননা, বিদেশী উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের আহরণ ও রচনায় প্রয়োগ, সাহিত্য-শিল্পকে স্বভাবতঃই কিছুটা অপরিচয়ের অন্তরালে ঠেলে দেয়। কবিতায় এবং ব্যাপক অর্থে সাহিত্য-শিল্পে পাঠক সাধারণতঃ তার চেনা জীবনের ছবিই খুঁজে ফেরে, নিজের অতীত ঐতিহ্যের আবিষ্কার, বর্তমান জীবনের অনুদঘাটিত অন্তরালবর্তী ছবি প্রত্যক্ষ করার দিকে তাদের প্রবণতা থাকে। এ-কারণেই কবিকে অতীত-পরিক্রমা এবং ইতিহাস ঐতিহ্যের জগতে পরিভ্রমণ করেও শেষ পর্যন্ত বর্তমানের পটে, চেনা-পরিমন্ডলেই ফিরে আসতে হয়, নামতে হয় নিজস্ব স্বাদেশিক পটভূমিকায়। শুধু নিজের দেশ এবং নিজের ভাষার পাঠকই নয়, বিদেশী পাঠকও কবির কাছে তাঁর নিজস্ব চেনা-জগতের ছবিই প্রধানতঃ প্রত্যাশা করে, জানতে চায় তাঁর দেশ ও সমাজমনের পরিচয়, তাদের আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না ও বেদনা-বিষাদের রূপ। তাই, যে কবিতা অনুবাদেও এইসব বৈশিষ্ট্য হারায় না, ব্যক্তিমন ও সামাজিক-দৈশিক মনের পটে উজ্জ্বল হয়ে ফোটে, আপন ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে বিদেশীদের কাছে গভীর ও অনিন্দ্যরূপ তুলে ধরে, সে-কবিতাই দেশকালের সীমা পেরিয়ে সার্বজনীনতায় ব্যাপ্তি পায়, মহৎ সাহিত্য-কীর্তিরূপে নন্দিত হয়।

'বৈশাখ'-এর কবিতা

বাংলা কবিতার ঐশ্বর্যময় রূপের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা ও ঋতু-রঙের বৈচিত্র্য। সুপ্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের কবিরা নানাভাবে প্রকৃতিকে তাঁদের রচনার উপজীব্য করেছেন। কখনও কবিতায় নৈসর্গিক সৌন্দর্য-মহিমা ও ঋতু-রঙের বৈচিত্র্য রূপ পেয়েছে বর্ণনায়, কখনও বা বিশ্লেষণে। স্বপ্ন ও কল্পনার প্রকাশে, মনের অন্তর্গূঢ় বেদনা ও আর্তি-আকুলতা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা প্রকৃতিকে করেছেন উপজীব্য; নৈসর্গিক পরিবেশ ও আরণ্যক প্রকৃতি ছাড়াও, বাংলার ষড়ঋতু, ঋতু-বৈচিত্র্য এবং ঋতু-বৈচিত্র্যের প্রতীক-রূপী বাংলা মাসও উপজীব্য হয়েছে বাংলা কবিতায়।

প্রাকৃতিক পরিবর্তনই ঋতু-পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। অন্য অর্থে, এক-একটি ঋতুই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের প্রতীক হয়ে যায়। অন্তহীন ও অবিভাজ্য সময়কে কাজের সুবিধার জন্যেই মানুষ বিভক্ত এবং চিহ্নিত করে নিয়েছে। দিন-ক্ষণ, মাস-বর্ষ দিয়ে সাধিত হয়েছে এই চিহ্নিতকরণের কাজ। এভাবে কাজের সুবিধার জন্যেই, প্রাকৃতিক পরিবর্তন অনুসারে চিহ্নিত হয়েছে 'ষড়-ঋতু'ও। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত---এই ছয়টি ঋতু প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ধারা এবং নৈসর্গিক চারিত্র্য অনুসারে অর্জন করেছে প্রতীক-রূপ। দিন-ক্ষণ-মাস-বর্ষ প্রাকৃতিক পরিবর্তন-নির্ভর; তাই, সব দিন-ক্ষণ-মাস-বর্ষই এক এবং অভিন্ন রূপ নয়। সময়ের পরিমাপে না হলেও, ঋতুরূপের চারিত্র্য অনুসারে দিন-ক্ষণ-মাস-বর্ষ ভিন্নরূপ হয়ে যায়। প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে বলেই একই ঋতুর অন্তর্গত দুটি মাসও চারিত্র্যে অভিন্ন থাকে না। মানুষের মনে স্বতন্ত্র প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি

করে। বাংলা কবিতায় এই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার রূপ খুঁজতে গেলেও এই সত্যের সন্ধান মিলবে।

'গ্রীষ্ম' বাংলার 'ষড়ঋতু'র প্রথম ঋতু। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—এই দুই মাস নিয়েই গ্রীষ্মকাল। বাংলা 'নববর্ষ' শুরু এই গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ 'বৈশাখ' মাস থেকেই। তাই, বছরের প্রথম ঋতু 'গ্রীষ্ম' এবং প্রথম মাস 'বৈশাখ'এর কৌলিণ্য স্বীকৃত হবারই কথা। বিশেষতঃ যেখানে বাংলার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে 'নববর্ষ' বা ১লা বৈশাখের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই গুরুত্ব সত্ত্বেও বাংলার কবিদের স্বপ্ন-কল্পনার বিকাশ ও বিচিত্র ভাবানুভূতি প্রকাশে 'নববর্ষ' বা ১লা 'বৈশাখ' তেমন ব্যাপক ভূমিকা পালন করেনি। আধুনিককালের কবিদের রচনায় 'বৈশাখ' বা 'নববর্ষ' খুব কমই উপজীব্য হয়েছে। অথচ এমন নয় যে আধুনিক-কালের কবিরা তাঁদের স্বপ্ন-কল্পনার প্রকাশে, হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি ও সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রকৃতি-আশ্রয়ী হননি। নৈসর্গিক রূপমহিমা, ঋতু-রঙের বৈচিত্র্য তাঁদের কবিতায় নানাভাবেই ধরা দিয়েছে। এমনকি, বিভিন্ন বাংলা 'মাস' ও তাঁদের কবিতায় উপজীব্য হয়েছে, যদিও 'বৈশাখ'এর উপস্থিতিই সবচেয়ে কম।

প্রথম আধুনিক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত থেকে পর্যালোচনা করলে এই সত্যতারই সমর্থন মেলে। মাইকেল তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য ও 'চতুর্দশপদী' কবিতায় 'বসন্ত' ঋতুকে উপজীব্য করে একাধিক কবিতা রচনা করেছেন। 'আশ্বিন মাস' 'বসন্তে একটি পাখির প্রতি' প্রভৃতি শিরোনামে লিখেছেন 'চতুর্দশপদী' কবিতা। 'বর্ষাকাল' 'হিমঋতু' মাইকেলের কবিতার উপজীব্য হয়েছে। কিন্তু 'বৈশাখ' মাস কিংবা গ্রীষ্মকাল মাইকেলের কোনো কবিতার উপজীব্য হয়নি। 'নূতন বৎসর' শিরোনামে তাঁর একটি চতুর্দশপদী কবিতা রয়েছে বটে, কিন্তু তাতেও বৈশাখ-এর কোনো উল্লেখ নেই। কবিতাটিতে নূতন বৎসরের বর্ণনা নয়, বরং ব্যক্তিমনের হাহাকারই ধ্বনিত হয়েছে: ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল/বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউ-র গমনে।/ নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল/আবার আয়ুর পথে। হৃদয়-কাননে/ কত শত আশা-লতা শুকায়ে মরিল/হায়রে, কব তা কারে, কব তা

কেমনে।/মাইকেলের অনুসরণে যাঁরা মহাকাব্য এবং গীতিকবিতা রচনা করছেন তাঁরাও গ্রীষ্মকাল অথবা বৈশাখ মাসকে তেমন উপজীব্য করেননি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, কায়কোবাদ—কারো কবিতাতেই এর কোন উল্লেখযোগ্য বিধৃতি নেই।

রবীন্দ্র-পূর্ব ও রবীন্দ্র-পরবর্তী সব কবিদের রচনায়ই বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত ইত্যাদি ঋতু নানাভাবে রূপ পেয়েছে। কিন্তু তাঁদের কারো রচনাতেই বৈশাখ অথবা গ্রীষ্ম ঋতু তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান পায়নি। রবীন্দ্র-রোমাণ্টিকতা অর্থাৎ 'ললিত গীত-কল্লোলতার' বিরুদ্ধে যাঁরা বিদ্রোহের নিশান তুলে ধরেছিলেন, বাংলা কবিতার সেই তিন প্রধান ব্যক্তিত্ব যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম—এঁদের কারো রচনাতেও গ্রীষ্ম ঋতু, বৈশাখ মাস কি নববর্ষ তেমন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে নেই। অথচ এঁরা প্রকৃতি ও ঋতু-বিষয়ক অজস্র কবিতা লিখেছেন। মোহিতলাল মজুমদারের সমগ্র কাব্যসংগ্রহেও বৈশাখ কিংবা নববর্ষ সম্পর্কে কোনো কবিতা মেলে না। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি কবিতার শিরোনাম অবশ্য বৈশাখ। কিন্তু এতেও বৈশাখের রূপ-বর্ণনা, নববর্ষের আবাহন কিংবা কোনো প্রতীকী-উপস্থাপনা নেই, বরং আছে কিছুটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। যেমন—চৈত্রান্তিক এ কালো রাত্রি/সত্যই যদি মৃত্যুমুখে/ কে বৈশাখী পায়ের চিহ্ন/ফুটে ফুটে উঠে গগন বুকে? /সংক্রান্তির জীর্ণ পাঁজর/দীর্ণ করিয়া মহোল্লাসে/পহেলা চাঁদের তিলক ললাটে/ কালবৈশাখ কে সে আসে? নজরুলের বহু কবিতা ও গান ঋতুভিত্তিক। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাঁর কবিতাতেও বৈশাখ-এর উপস্থিতি খুবই নগণ্য। নজরুলের 'মেঘবিহীন খর বৈশাখে' ইত্যাদি গান এবং 'কাল-বৈশাখ' ইত্যাদি কবিতা ছাড়া বৈশাখ-ভিত্তিক খুব বেশী রচনার সাক্ষাৎ মেলে না। নজরুলের কবিতায় জ্যৈষ্ঠও গুরুত্ব পেয়েছে। কেননা, জ্যৈষ্ঠ 'ঝড়'এর প্রতীক। 'নূতনের কেতন'রূপী 'কাল-বোশেখীর ঝড়'এর ভয়ংকর আবির্ভাবে নজরুলের কবিচিত্ত 'প্রলয়োল্লাসে প্রমত্ত হয়ে প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও কবি-কল্পনার সাহায্যে নানা চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করেছে; তাঁর দৃষ্টিতে কাল-বোশেখী শুধু ধ্বংসের প্রতীক নয়, কাল-বোশেখী নতুন সৃষ্টিরও প্রতীক।

রবীন্দ্র-পরবর্তী ত্রিশের প্রধান কবিদের রচনায়ও গ্রীষ্ম ঋতু, বৈশাখ মাস, কিংবা নববর্ষ কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেনি। যদিও প্রত্যেকের রচনায়ই বাংলার অন্যান্য ঋতু এবং মাস বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, এমন কি প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত---এঁদের কারো রচনাতেই বৈশাখ অথবা নববর্ষ তেমন বিধৃত হয়নি। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলা কবিতায় প্রকৃতি---বিশেষ করে বৈশাখ ও নববর্ষ রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেই সবচেয়ে বেশী স্থান দখল করে আছে, এবং বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলার রূপপ্রকৃতি ও প্রাকৃতিক রূপৈশ্বর্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা-গানে নানরূপে প্রকাশ করেছেন। উত্তরসূরী জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'র কথা স্মরণে রেখেও, এ-সত্য অনস্বীকার্য যে বাংলার নৈসর্গিক রূপ এত বিচিত্র মহিমায় এবং ব্যাপক পটে আর কারও কবিতায় ধরা দেয়নি। মননশীল বিশ্লেষণ, গ্রাম-বাংলার স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের রূপায়ণ এবং এসবের প্রতীকার্থ আরোপে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কোনো কোনো কবির দক্ষতা এবং সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার দিক থেকে বিচার করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের তুলনীয় সিদ্ধি আর কারো মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাবে না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে শুধু স্নিগ্ধ-প্রশান্তরূপেই দেখেননি তিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন জীবন্ত প্রাণসত্তারূপেও। তাই, বৈশাখ, নববর্ষ ইত্যাদি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করেছেন একটি গতিশীল দুর্নিবার স্বজনশীল শক্তিরূপে---যে শক্তির সংস্পর্শে পুরাতনের অবলুপ্তি ঘটে---নতুনের জন্ম-সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়। নজরুলের 'কাল বৈশাখ' 'ঝড়' 'প্রলয়োল্লাস' ইত্যাদি কবিতায়ও প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে গতিশীল, দুর্নিবার ও সৃজনধর্মী শক্তিরূপে। কিন্তু পাথক্য এইখানে যে নজরুল প্রকৃতিকে---বিশেষ করে 'কাল-বৈশাখ' ও 'ঝড়'কে কখনো দেখেছেন ব্যক্তিস্বরূপে, কখনো বা শক্তি কিংবা আশাবাদের প্রতীকে।

তিনি প্রকৃতির কবিতায় 'ঋতু-বন্দনায়' প্রবৃত্ত হননি। বরং প্রকৃতিকে দিয়ে তিনি তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে বন্দনা করিয়ে নিয়েছেন। তখন তাঁর ব্যক্তি-সত্তাও প্রকৃতিরূপী এক মহাশক্তিরই প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের

'বর্ষশেষ' কবিতায় প্রকৃতির গতিশীল দুর্নিবার শক্তির আবাহন রচিত হয়েছে এইভাবে: হে নূতন এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি/ পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে/ব্যাপ্ত করি লুপ্ত করি স্তরে স্তরে/স্তবকে স্তবকে/ঘনঘোর স্তূপে।

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ, কবিতায় শুধু নববর্ষের আবির্ভাবের রূপ-চিত্রই অংকিত হয়নি, নববর্ষের আবাহনও ধ্বনিত হয়েছে। বৈশাখ তার স্নিগ্ধ কৃষ্ণ ভয়ংকর সঘন অন্ধকার নিয়ে আবির্ভূত হোক, এই আন্তরিক আকাঙক্ষাই এই কবিতায় ধ্বনিত। এ-কারণেই কবির একান্ত কামনা, 'তোমার ইঙ্গিত যেন ঘনগূঢ় ভ্রূকুটির তলে বিদ্যুতে প্রকাশে/ তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে বায়ুগর্জে আসে/তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে বিদ্ধ করি হানে/তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর / স্তব্ধ রাত্রি আনে। রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষিত নববর্ষ যখন নিশ্চিত নিষ্ঠুর নতুন রূপে আবির্ভূত, তখন তার আলেখ্য রচিত হলো: 'হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,/ সহজপ্রবল /জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে/ বাহিরায় ফল/পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া/অপূর্ব আকারে তেমনি সবলে তুমি পরিপূর্ণ হয়েছ প্রকাশ/প্রণমি তোমারে।' বর্ষশেষে নববর্ষে বৈশাখের নিশ্চিত, নিষ্ঠুর, সবল ও পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের কাছে পুরাতনের একান্তরূপে আত্মসমর্পণ এবং প্রকৃতির স্তুতিবাদ বিধৃত, কিন্তু সেই সঙ্গে আছে নতুনের প্রত্যাশা: 'ঝঞ্ঝার মঞ্জীর বাঁধি উন্মাদিনী কাল-বৈশাখীর/নৃত্য হোক তবে/ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত-আঘাতে/উড়ে হোক ক্ষয়।/ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত/নিষ্ফল সঞ্চয়/ (বর্ষশেষ)। কিংবা: হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।/ধুলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন/পিঙ্গল জটাজাল, তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু/মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল কারে দাও ডাক/হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ? (বৈশাখ)

উদ্ধৃত কবিতাসমূহে প্রকৃতি এসেছে গতিশীল দুর্নিবার শক্তি হিসেবে। সেই সঙ্গে চিত্রকল্প, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রতিভার সাথে সাথে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধের পরিচয়ও রূপ পেয়েছে।

বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' 'বৈশাখ' ইত্যাদি কবিতা একটি ঐতিহ্যধারারই জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রবীণ কবিদের

মধ্যে শাহাদাৎ হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, সুফী মোতাহার হোসেন, বে-নজীর আহমদ প্রমুখের কবিতায় বৈশাখ নানারূপে বিধৃত হয়েছে। বেনজীর আহমদের একটি কাব্য-গ্রন্থের নামই 'বৈশাখী'। শাহাদাৎ হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল প্রমুখের কবিতায় রীতিভঙ্গী ও প্রকাশরূপের কিছুটা ভিন্নতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র-ঐতিহ্য ধারার পরিচয় দীপ্ত। কেননা, তাঁরাও বৈশাখকে কল্পনা করেছেন ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রতীক রূপে। বৈশাখকে আবাহন জানিয়ে বলেছেন: বিদ্যুতের অগ্নি-জ্বালা, বজ্রের হনন/অবিশ্রাম উন্মত্ত রনণ/তোমার প্রলয় যজ্ঞে রুদ্র মাঙ্গলিক,/হে বৎসর প্রতীক/সৃষ্টির আরতি দাও নিশ্চিহ্নের বুকে/কাল-অগ্নি-মুখে। (শাহাদাৎ হোসেন) কিংবা---হে বৈশাখ। ঝাপটিয়া বিস্তারিয়া তব দীর্ঘ পাখ/ডাক ডাক নীরদেরে, তৃপ্ত হোক রৌদ্র দগ্ধ শাখা - - - তোমার বিষাণে দাও কাল-বৈশাখীর রুদ্র সুর। গগনে ঘনাক মেঘ। পবনে-বাজুক বজ্র বাঁশী,/মেঘঘন অন্ধকার বিজুরীর আলোকে উদ্ভাসি/উঠুক। ধরণী বক্ষ ভরিয়া উঠুক ধরা গানে/পূর্ণ হোক বসুন্ধরা নব-বৈশাখের নব দানে। (বেগম সুফিয়া কামাল)।

রবীন্দ্র-ঐতিহ্যধারায় বৈশাখ কিংবা নববর্ষ-এর আবাহন পরবর্তী-কালে তেমন লক্ষ্য করা যায়নি। উত্তরসূরী কবিরা অনেকেই পঁচিশে বৈশাখ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন বটে, কিন্তু বৈশাখ অথবা নববর্ষ একালের কবিতায় তেমন ব্যাপ্তি পায়নি। কোনো কোনো কবিতায় বৈশাখ চিত্রিত হয়েছে নিছক ধ্বংসের প্রতীক হিসেবেই---বিশেষতঃ কাল-বৈশাখীর তাণ্ডবলীলা ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পটভূমিতে। ফররুখ আহমদের একটি কবিতায় অবশ্য প্রতীকরূপে উচ্চারিত বৈশাখের আবাহন: হে বৈশাখ। এস এস প্রমুক্ত নীলাব শাহবাজ/ঝড়ের দু'পাখা মেলে হানা দাও/কণ্ঠে তুলে বজ্রের আওয়াজ,/দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, এ-পৃথিবী জনপদ---বিমর্ষ শিকার/মুহূর্তে উঠুক জেগে, উঠুক সভয়ে—কেঁপে/দু'পাখার ঝাপটে তোমার/প্রচণ্ড আঘাতে সেই গণ্ডীবদ্ধ জীবনের সীমানা হারাক/সুরে-ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা-মেঘনার তীরে এস তুমি প্রমত্ত বৈশাখ (বৈশাখ)।

বাংলা কবিতায় বৈশাখ-এর আবাহনের এই ধারাটি একালের রচনায় তেমন ব্যাপ্তি পায়নি।

সাহিত্যে প্রভাব ও পরিগ্রহণ

সাহিত্যে পারস্পরিক প্রভাব ও পরিগ্রহণ কোনো নতুন ঘটনা কিংবা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অরিজিনালিটি—অর্থাৎ মৌলিকতা বলতে সাহিত্যে যা বোঝানো হয়ে থাকে, আসলে তা যতোখানি না বিষয়কেন্দ্রিক, তার চেয়েও বেশী আঙ্গিক এবং প্রকাশগত। কেননা, সাহিত্যের বিষয় বা উপজীব্যের মৌলিকতা বলতে আদপেই তেমন কিছু কল্পনা করা কঠিন। জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, বিরহ, ভালোবাসা ইত্যাদি থেকে শুরু করে মানব-জীবনের আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয়, এমনকি পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্য-অদৃশ্য বস্তুও কোনো-না-কোনো ভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

বাস্তবের হুবহু প্রতিফলন যেমন সাহিত্যিকের রচনায় রূপ পায়, তেমনি তার কল্পনার জগতও আশ্চর্য রূপময় হয়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তব এবং কল্পনা যা-ই সাহিত্যিকের রচনায় ধৃত হোক না কেন, এর কোনটিই তাঁর একান্ত উদ্ভাবনার ব্যাপার নয়, সবটুকুই নয় একেবারে মৌলিক। কেননা সাহিত্যিকের কল্পনা যত দূরবিসারী, যত আকাশ-মার্গীই হোক, তার প্রকাশরূপের জন্যে চাই কোনো-না কোনো অবলম্বন। এবং এর জন্যে প্রথমেই যা একান্তরূপে অপরিহার্য তা হলো ভাষা। ভাষা ছাড়া সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের অর্থাৎ তাঁর ভাবনা-চিন্তা, আবেগ-অনুভূতি ও স্বপ্ন-কল্পনার রূপায়ণের অন্য কোন পন্থা নেই।

কিন্তু সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের অবলম্বন এই যে ভাষা তা-কি তাঁর একান্তরূপে নিজস্ব, না মৌলিক আবিষ্কার? যে 'শব্দ' বা শব্দসমবায়ে ভাষা রূপ নেয় তাও তো সাহিত্যিককে আহরণ করতে হয় সচল সামাজিক-জীবন থেকে, অভিধান থেকে, সাহিত্যের ভান্ডার থেকে এবং তাঁর নিজের আহরিত ও উচ্চারিত ভাষা সম্পদ থেকে।

আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে 'শব্দ' ও 'ভাষা ব্যবহারে' সাহিত্যিক যত মুন্সীয়ানা এবং শিল্পদক্ষতাই প্রদর্শন করুন না কেন, কোনো মৌলিক শব্দ-সৃষ্টি কি তাঁর দ্বারা সম্ভব? সন্দেহ নেই, সৃজনধর্মী ও সুকৌশল ভাষাশিল্পী 'শব্দ' ও 'ভাষার সম্পদ' বাড়ান, সাহিত্যের এলাকা সম্প্রসারিত করেন। এই সম্পদ-বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কাজেও কি তাঁকে নিজের ভাষা, অন্যের ভাষা-অর্থাৎ স্বদেশী-বিদেশী অনেক ভাষার কাছেই হাত পাততে হয় না? বিভিন্ন ভাষার শব্দের সমাহারে, অভিধানের ভান্ডার থেকে, সচল জীবনধারা থেকে 'শব্দ' ও 'শব্দ-বন্ধ' আহরণ করে কি তাঁকে গড়ে তুলতে হয় না তার নিজস্ব ভাষারীতি? এভাবে পারস্পরিক প্রভাব পরিগ্রহণের মাধ্যমে 'শব্দ ও শব্দ-বন্ধ' আহরণ এবং সে-সবের শিল্প-সম্মত সংস্থাপন ও বিন্যাসের মাধ্যমেই সৃজনধর্মী এবং রূপসচেতন শিল্পী গড়ে তোলেন তাঁর ভাষার নিজস্ব অবয়ব। এভাবে আত্মপ্রকাশের মুহূর্তেই শুরু হয় সাহিত্যিকের পারস্পরিক-প্রভাব ও পরিগ্রহণের পালা।

সাহিত্যিক তাঁর আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ও আর্তি-আকুলতাকে ভাষা দিতে চান। সৃষ্টির মুহূর্তে একান্তরূপে নিঃসঙ্গ এবং এককেন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও, সাহিত্যিকও সমাজ-সীমার বাসিন্দা। তাই সমাজের ছবি, সমাজ-মানসের আবেগ ও অনুভূতি, আকাঙক্ষা আর্তি কোনো-না কোনো-ভাবে তাঁর রচনায় ছায়া ফেলে। তাই ব্যক্তিমন, সমাজ-মনের রূপায়ণের জন্যেই তাঁকে 'শব্দ' ও শব্দ-সমন্বিত ভাষার সন্ধান করতে হয়। আশৈশব পরিচিত, দৈনন্দিন-জীবনে ব্যবহৃত তাঁর নিজের অধিগত ভাষায় সব সময় তিনি নিজের মনোভাব কিংবা বক্তব্য প্রকাশ করে তৃপ্ত হন না, সন্তুষ্ট-বোধ করেন না। এর শিল্পরূপায়ণে তাই ভাষার বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ ভান্ডারে তিনি হাত পাতেন, নতুন নতুন শব্দ ও শব্দ-বন্ধ তুলে আনেন, পরিচিত শব্দাবলীকে নতুন ব্যবহার-কৌশলে প্রাণবন্ত, অর্থবহ এবং ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে চান। এবং এ-ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে মাতৃ-ভাষার সীমানা-ডিঙ্গিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পাড়ি জমান, হানা দেন অন্য ভাষার 'শব্দরাজি' সমৃদ্ধ কোষাগারে। সৃজনশীল ও কল্পনা-প্রতিভা-সম্পন্ন সাহিত্যিকের দৃষ্টি ক্রমান্বয়ে ব্যাপক ও গভীর হয়ে যায়, নিজস্ব পরিচিত-পরিবেশ ছাড়িয়েও তা যাত্রা করে আন্তর্জাতিক এলাকায়। সাহিত্যিকের এই আন্তর্জাতিক-যাত্রাও তাঁর আবেগ-অনুভূতি ও প্রতি-

ক্রিয়াকে ভাষা দেওয়ার জন্যে আন্তর্জাতিক ভাষা ও সাহিত্যের ভান্ডারে হাত-পাতা অনিবার্য করে তোলে।

ভাষা সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের অপরিহার্য প্রাথমিক অবলম্বন। এবং যেহেতু 'ভাষা' শব্দ-সমবায়েরই অন্য নাম, সে-কারণে যে সাহিত্যি-কের 'শব্দ' সম্পদ যত বেশী, শব্দ সংস্থাপন ও বিন্যাসে যিনি যত সুদক্ষ ও পারঙ্গম, তাঁর প্রকাশের ভাষাও ততবেশী ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং আকর্ষণীয়। কিন্তু 'শব্দ' ও 'ভাষা সম্পদ' যিনি বাড়াতে চান না, তিনি বিভিন্ন ভাষার পারস্পরিক প্রভাব ও পরিগ্রহণকে অনেক সময় 'মৌলিকতা'র বিরোধী এবং পরিপন্থী বলে মনে করেন। তিনি ভুলে যান যে, ভিন্ন ভাষার প্রভাবের অর্থ ভিন্ন সাহিত্যেরই প্রভাব। কেননা, সৃজন-ধর্মী সাহিত্যিক অন্য ভাষার 'শব্দ সম্পদ' এবং 'বাক-রাজি' আহরণ করেন প্রধানতঃ অন্যভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্যপাঠের মাধ্যমেই। ফলে সেই ভাষার ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাথে পরিচিতি হওয়ার পাশা-পাশি তিনি সেই ভাষার সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সাথেও অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হয়ে যান, এবং এই পরিচিতি অধিকাংশ সময়েই স্মরণীয় ভাবে ধনাত্মক হয়ে যায়। অর্থাৎ অন্যভাষায় সমৃদ্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়, নিজের ভাষার সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ এবং সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে অনুপ্রেরণা জোগায়।

সাহিত্যিকের প্রকাশের জন্যে যেমন 'ভাষা' অপরিহার্য, তেমনি অত্যাবশ্যক কোনো-না কোনো ভাব বা বক্তব্যও। কেননা, কোনো প্রকাশই তো নিরালম্ব, বায়বীয় হতে পারে না। তাই প্রকাশরূপের জন্যে ভাবরূপ চাই, সে ভাবরূপ যত অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ এবং ধোঁয়াটেই হোক না কেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, রূপ আছে অথচ ভাব নেই, সৃষ্টির রাজ্যে এমন ব্যাপার অকল্পনীয়। তাই প্রকাশরূপের জন্যেই ভাব বা বক্তব্যের প্রয়োজন। কিন্তু সাহিত্যের ভাব বা উপজীব্য বলতে সুনির্দিষ্ট কিংবা সুনির্ধারিত কিছু থাকতে পারে না, থাকা সম্ভব নয়। কেননা, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ই সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে। যদিও কোন বিষয় সাহিত্যের কতটা উপজীব্য হবে এবং শিল্পরূপ নেবে তা নির্ভর করে সাহিত্যিকের মানসগঠন ও সৃজনক্ষমতার ওপর। বস্তুত পৃথি-বীর যাবতীয় বিষয়ই কোনো-না-কোনো ভাবে সেই আদিকাল থেকেই

সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়েছে। সাহিত্য যদিও সৃজনীপ্রতিভার কল্পনার সৃষ্টি, তবুও সেই কল্পনার রূপময় প্রকাশের জন্যেই পৃথিবীর বিশেষতঃ মানব-জীবনের অঙ্গীভূত যাবতীয় বিষয়ের অবলম্বন। এই অবলম্বনই নানা ভাবে নানানরূপে সাহিত্যে বিভিন্ন জনের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে; তাই, ভাব বা উপজীব্য নয়, ভাব ও উপজীব্যের আবিষ্কার এবং উপস্থাপনাতেই সাহিত্যের মৌলিকতা।

বলেছি, সাহিত্যিক সামাজিক-মানুষ এবং কোন একটি দেশও সমাজ-পরিবেশের বাসিন্দা। তাই সে দেশ ও সমাজ পরিবেশ থেকেই তিনি প্রধানতঃ রচনার উপজীব্য আহরণ করেন। কিন্তু জন্মগতভাবে একটি বিশেষ দেশ বা সমাজের সীমানায় তাঁর পরিক্রমা হলেও সাহিত্যিকের মানসযাত্রা ও পরি-ভ্রমণের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের রাজ্যে চলে তাঁর অন্তহীন অবাধ বিহার। ব্যক্তিগত ও সামাজিক-জীবনে এবং দেশী-বিদেশী সাহিত্যে এই অবাধ পরিক্রমাকালে সাহিত্যিক প্রতি-নিয়ত নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। সব অভিজ্ঞতা যদিও সাহি-ত্যিককে উদ্বুদ্ধ অনুপ্রাণিত কিংবা প্রতিক্রিয়া উন্মুখ করে তোলেনা, তবুও অনেক অভিজ্ঞতা তাকে ভাবতে শেখায়, নিজের ও অন্যের মনোরাজ্যে হানা দিতে অনুপ্রাণিত করে। জন্মগতভাবে অবশ্য কোনো মানুষই বিশেষ অভিজ্ঞতা কিংবা আবেগ-অনুভূতি নিয়ে আসে না, সাহিত্যিক শিল্পীও নয়। কিন্তু জন্মের পর বিশেষ পারিবারিক ও সমাজ-পরিবেশে এবং মানসগঠনের ধরন অনুযায়ী অভিজ্ঞতা ও আবেগ অনুভূতির রূপ-ভেদ ঘটে। সাহিত্যিক শিল্পী অধিক অনুভূতিশীল। অন্তত অনুভূতির প্রকাশে পারঙ্গম বলে তাঁর রচনায় অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির নতুন নতুন এলাকার রূপ ধরা পড়ে। পারিবারিক, সামাজিক ও দৈশিক পরিবেশের ভিন্নতার দরুণ এই রূপায়ণও হয় বিচিত্রধর্মী। স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্য-পাঠের মাধ্যমে এই বৈচিত্র্যময় রূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়, আহরণ করা চলে সেই অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সম্পদ। এভাবেই ভাব বা উপজীব্যের ক্ষেত্রেও সাহিত্যে পারস্পরিক প্রভাব ও পরিগ্রহণের পালা চলে। সম্প্রসারিত হয়ে যায় সাহিত্যের এলাকা।

কিন্তু সাহিত্য যেহেতু 'যান্ত্রিক' সৃষ্টি নয়, মানুষের অনুভূতিশীল ও কল্পনা-প্রতিভাসমৃদ্ধ মনেরই ফসল, সে-কারণে তার এক ও অভিন্ন

রূপ কখনই সম্ভব নয়। এবং নয় বলেই একই অভিজ্ঞতার অধিকারী, একই বাস্তবের রূপকার সাহিত্যিকের রচনায়ও এমন বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্নরূপের সমাহার। বস্তুত সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকাশের এই বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতাই সাহিত্যের মৌলিকতা। যদিও এই 'মৌলিকতা'র মূলে থাকে 'পারস্পরিক প্রভাব ও পরিগ্রহণ' এর পরিচয়। কেননা প্রকাশের জন্যে সাহিত্যিক যে আঙ্গিক বা রীতিপ্রকরণ অবলম্বন করেন তা-ও কি একেবারেই স্বয়ম্ভূ? স্বদেশী-বিদেশী সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় যেমন ভাব ও উপজীব্য আহরণের ক্ষেত্রে সাহিত্যিককে বিশেষভাবে সাহায্য করে, তেমনি আঙ্গিক এবং রীতিপ্রকরণের ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সম্ভাবনায় অনুপ্রাণিত করে তোলে। সাহিত্যে ভাব বা উপজীব্য দেশ থেকে দেশান্তরে যাত্রা করে, আঙ্গিক এবং রীতি-প্রকরণও দেশান্তরী হয়। অনেক সময় ভাব ও উপজীব্যই নির্ধারিত করে রচনার আঙ্গিক এবং রীতিপ্রকরণ। তাই ভাব বা উপজীব্যের অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ের এলাকা সম্প্রসারিত হলে, আঙ্গিক এবং রীতিপ্রকরণের ব্যাপারে সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেয়, অন্তত সৃজনশীল সাহিত্যিক তা অনুভব করেন। এই প্রয়োজন থেকেই শুরু হয় আঙ্গিক ও রীতিপ্রকরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সমৃদ্ধ সাহিত্য থেকে এ-ব্যাপারে পরিগ্রহণের পালা।

শুধু রচনার উপজীব্য, আঙ্গিক এবং রীতিপ্রকরণ নয়, শিল্পরূপ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত ছন্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদি সব-কিছুই তো আসলে প্রভাব ও পরিগ্রহণের ফল, রচয়িতার কোনো মৌলিক আবিষ্কার নয়। কেননা, সাহিত্যিক যে ছন্দকে তাঁর রচনায় শিল্প-কৌশলে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ করে ব্যবহার করেন, তা-তো আসলে ভাষার এবং মানুষের উচ্চারণের কাছ থেকেই ধার করা। এমনকি তাঁর ব্যবহার-কৌশলের মূল ভিত্তিটিও পূর্বসূরীদেরই সংস্থাপিত। তিনি এতে কিছুটা নতুন কারুকর্ম এবং রূপবিন্যাস করেন মাত্র। উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রেও তিনি মূল্যগতভাবে কোনো কিছু নির্মাণ করেন না, আবিষ্কার এবং নতুন বিন্যাসে সংস্থাপন করেন মাত্র। কেননা উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদি নির্মাণের জন্যে যে-সব উপাদান দরকার সেগুলো প্রকৃতিতে এবং পারিপার্শ্বিক জগতে এমনকি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনেই ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু সন্ধানী

দৃষ্টি ফেলে, আবিষ্কারকের দক্ষতা নিয়ে সেগুলো তুলে আনা এবং নতুনরূপে সংস্থাপিত করাই সাহিত্যিকের কাজ। এই সংস্থাপনে ও বিন্যাসে যে সৃজনী-দক্ষতা, সেটিই বস্তুত সাহিত্যিকের মৌলিকতা। এবং এই মৌলিকতাও আসলে পারস্পরিক প্রভাব ও পরিগ্রহণের ফল।

কবিতায় শব্দ

কবিতার জন্যে একান্তরূপে অপরিহার্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলতে হয়: শব্দ। কিন্তু 'শব্দ' কি শুধু কবিতার জন্যেই অপরিহার্য? লিখিত-অলিখিত যে-কোন ধরনের সাহিত্য কর্মের জন্যেই তো 'শব্দ' চাই। 'শব্দ' ছাড়া মনোভাবের প্রকাশ, ভাবের আদান-প্রদান এবং সঞ্চারণ কিভাবে, কেমন করে সম্ভব? ইঙ্গিতে-ইশারায়, কোনো রকম 'শব্দ' বা 'ধ্বনি' উচচারণ না করেও অবশ্য মনোভাবের প্রকাশ এবং বক্তব্য উপস্থাপন করা চলে, একের বলার কথা অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেয়া যায়। কিন্তু ইঙ্গিতে-ইশারায় এভাবে মনোভাবের প্রকাশ কিংবা কোনো বক্তব্য উপস্থাপন সাধারণ রীতির অন্তর্গত নয়। মঞ্চে, নাট্যাভিনয়ে শব্দ বা ধ্বনির আশ্রয় ছাড়াও যে-সব মানুষ অথবা মানুষের প্রতীকরূপী চরিত্রকে কখনো কখনো মুখর এবং বাঙ্ময় হতে দেখা যায়, তারা সাধারণ সমাজ-সংসারের অধীন নয়, তাদের অভিনয় বা মূকাভিনয়ও নাট্যশালার নিয়মিত কর্মসূচীর বাইরে—কচিৎ-কদাচিৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল।

ইঙ্গিতে-ইশারায় কথা বলা, কিংবা মূকাভিনয়ের আশ্রয় নেয়া সুস্থ মানুষের স্বভাবধর্ম নয়। কেবল বাকশক্তিহীন এবং কোনো 'ধ্বনি' বা শব্দ উচচারণে অক্ষম, শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু মানুষকেই বাধ্য হয়ে নিয়তির নির্মম বিধানে সার্বক্ষণিক ইঙ্গিত-ইশারার আশ্রয় নিতে হয়। আত্মপ্রকাশের তাগিদে, মনোভাব ও বক্তব্য অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেয়ার মানবিক ও সামাজিক প্রয়োজনে চালিয়ে যেতে হয় মূকাভিনয়। উচচারিত কথার চেয়ে অনুচচারিত কথা, মুখরতার চেয়ে স্তব্ধতা যেমন অনেকসময় অনেক বেশী বাণী বহন করে, তেমনি বাণী-হীন স্তব্ধ অভিনয়, অথবা ইঙ্গিত-ইশারার আশ্রয়ে মূকাভিনয়ও সঞ্চারিত, সংক্রামিত

করে দেয় গভীরতর বক্তব্য, ব্যাপকতর আবেদন। কিন্তু তবুও শুধু মঞ্চের বা নাট্যশালার নয়, মূকাভিনয় সমাজ-সংসারেরও স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম।

মঞ্চে এবং মঞ্চেরই বিরাটতর সংস্করণ সংসারে, কেউই শব্দহীনতায় সমর্পিত নন। মঞ্চের অভিনেতারা কথা বলেন শব্দের সহায়তায়—ধ্বনির আশ্রয়ে। মনোভাবের প্রকাশ এবং বক্তব্য উপস্থাপনের প্রয়োজনেই, শব্দ-ধ্বনির আশ্রয় ছাড়াও তারা ইঙ্গিত-ইশারা অবলম্বন করেন। সংসাররূপী এই বিরাট মঞ্চেও যারা সার্বক্ষণিক অভিনয়ে ব্যস্ত, তাদের-কেও শব্দ, ধ্বনি এবং ইঙ্গিত-ইশারার আশ্রয় নিতে হয়। শব্দ ও ধ্বনির সহায়তা ছাড়া তাদের কোনো উচ্চারণই সম্ভব হয় না। সাহিত্য যেহেতু সমাজ-সংসারে বিচরণশীল সবাক মানুষেরই সৃষ্টি, এবং কোনো অর্থেই তা অরণ্যচারী কিংবা গুহাশ্রয়ী মানুষের সৃষ্টি নয়, সেহেতু শব্দ, ধ্বনি ইত্যাদির অবলম্বন ছাড়া সাহিত্যের মুক্তি নেই।

অনস্বীকার্য, অরণ্যচারী, গুহাশ্রয়ী মানুষও তার উচ্চারণকে ভাষা দিয়েছে নানা ধ্বনিতে, নানা সঙ্গীতে। কিন্তু সেই 'উচ্চারণ' কোনো লিখিতরূপের অপেক্ষা রাখেনি বলে, লিপিবদ্ধ শব্দের অপরিহার্য প্রয়ো-জন তার ছিল না। সেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে—একের মনোভাব বা বক্তব্য অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়ার তাগিদে। উচ্চারিত অনুচ্চারিত ধ্বনিকেই 'শব্দের' বন্ধনে ধরে রাখার এবং শব্দের আদলে ফুটিয়ে তোলার গরজে সৃষ্ট হয়েছে লিপি বা প্রতীকাক্ষর। এবং সাহিত্য-সঙ্গীত যেদিন থেকে ধ্বনির পিঞ্জর ছেড়ে শব্দের নীলিমায় মুক্তডানা মেলেছে, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে তার আরেক বন্দী-দশা। অর্থাৎ লিখিত রূপের আশ্রয়ে নির্ভর রাখার পর সাহিত্য-সঙ্গীত হয়ে পড়েছে একান্তরূপে অক্ষর-এর হাতে আত্মসমর্পিত।

কিন্তু যেহেতু একটি মাত্র 'অক্ষর' বা বর্ণ কোনো সুস্পষ্ট অর্থ বা ভাব প্রকাশ করে না, শুধু ধ্বনিদ্যোতনাই সৃষ্টি করে, সে কারণে শব্দ বা ধ্বনির উচ্চারণ এবং লিখিতরূপ নির্মাণের জন্যে একাধিক অক্ষ-রের প্রয়োজন। সাহিত্যের জন্ম যেহেতু শব্দ ধ্বনি-নির্ভর সঙ্গাত তথা কবিতা থেকে, তা-ই সাহিত্যের এই আদি শাখার উচ্চারণ এবং লিখিত রূপ নির্মাণের প্রয়োজনেই একাধিক অক্ষরের পারস্পরিক সংস্থাপন ও

অর্থ আবিষ্কার প্রচেষ্টা, প্রতীক-রূপ ফুটিয়ে তোলার আগ্রহ। আদি-সঙ্গীত কিংবা আদি কবিতা যতখানি শব্দ-ধ্বনি নির্ভর ছিল, ততখানি অর্থ-ধারক অথবা অর্থজ্ঞাপক ছিল না। বিশেষজ্ঞদের মতে, 'কবিতার শব্দ' যেদিন থেকে বহিরঙ্গ সংগীতের আশ্রয় হারালো, সঞ্চারিত হতে পারার দর্পে কোথায় যেন ঘা পড়লো। কেননা, সংগীত মানবহৃদয়ের সার্বজনিন ভাষা। সংগীতকে আশ্রয় করলে মানবচেতনার সন্নিহিত এবং প্রত্যন্ত প্রদেশগুলো স্পর্শ করা যায়।

এবং এ কারণেই আদিতে সুর-ধ্বনি অর্থজ্ঞাপকতার অপরিহার্য প্রয়োজন মেটাতে প্রতিশ্রুত ছিল না। আদি কবিতা যে হেঁয়ালি, কুহেলিকা-পূর্ণ এবং রহস্যময়, তারও সম্ভবতঃ এ একটা প্রধান কারণ। বিশেষতঃ আদি কবিতা লিখিত রূপের অপেক্ষা রাখেনি বলে, এবং মুখে মুখে প্রচারিত হওয়ার সুযোগ এর সীমাহীন থাকায়, অর্থজ্ঞাপকতার দায়িত্বও তার ওপর বর্তায়নি। শুধু কি আদি কবিতা? এ কালের কবিতাও কি হেঁয়ালি, কুহেলিকাপূর্ণ এবং রহস্যময় হয়ে ওঠার সেই প্রাচীনতম স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছে? করেনি। কিন্তু না করলেও, একালের কবিতা যেহেতু আর শুধু শব্দ-ধ্বনি, সুর ও সংগীত-নির্ভর নয়, যেহেতু কবিতা শুধু আর গীত হবার নয়, পঠিত এবং আবৃত্ত হবারও, সে কারণে প্রাচীন স্বভাবের নিগড় তাকে আস্তে আস্তে ভেঙে আসতে হয়েছে। এবং এই ভাঙার পালা চলার কালেও কবিতা বার বার ফিরে তাকিয়েছে তার অতীত রূপের দিকে, প্রলুব্ধ হয়েছে প্রাক্তনস্বভাবের ইশারায়, হাতছানিতে।

তাই, একালের কবিতাতেও রহস্যময়, হেঁয়ালি এবং কুহেলিকাপূর্ণ হয়ে ওঠার প্রবণতা প্রায়শঃই দৃষ্টিগ্রাহ্য। মনোগহনের দুর্জ্ঞেয় জটিলতা অন্তর-সত্তার রহস্যময় উদ্ভাসন—এসব অনেক কিছুই রয়েছে এই প্রবণতার মূলে। কিন্তু কবিতার আদি স্বভাব ও চারিত্র্যের গোপন অনুপ্রবেশও কি কাজ করে যাচ্ছে না? শুধু বক্তব্যহীন বক্তব্য উপস্থাপন, শুধু সুর, ধ্বনি, তান-লয়ের বিস্তার যেমন এই আদি প্রবণতাজাত, তেমনি 'শব্দ' এর বদলে কেবল 'অক্ষর' এবং 'প্রতীক চিহ্ন' স্বাক্ষরিত করে মনোভাব প্রকাশ কিংবা বক্তব্য উপস্থাপনের প্রচেষ্টাও কি সেই আদি উৎস থেকে পাওয়া নয়? শব্দের পরিবর্তে একটিমাত্র 'অক্ষর' বর্ণ বা 'প্রতীক চিহ্ন'

ব্যবহার করে যথেচ্ছভাবে সাজিয়ে এবং কল্পনার পরিতৃপ্তি অনুসারে, নানা রূপাভাসে বিন্যাস করে কবিতা গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা ও প্রবণতা, শিল্পকর্ম হিসাবে তা একালের হলেও, প্রবণতার বিচারে সেই আদিরই। কেননা, আদি-কবিতাও অর্থ-জ্ঞাপকতায় সমর্পিত ছিলনা, অর্থাৎ কোনো সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ তার দায়িত্ববদ্ধতার ব্যাপার ছিল না।

একালের কবিতাও এমন দায়িত্ব পালনে সবতোভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়। তবুও, অরণ্যচারী যূথবদ্ধ জীবনের বদলে মানুষের সংঘবদ্ধ সামাজিক জীবন বহু-বিস্তারী হয়ে উঠার ফলে সাহিত্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা থেকে প্রসাবিত হয়েছে অনেকটাই সমাজ-কেন্দ্রিকতায়। যদিও সাহিত্য একান্তরূপেই ব্যক্তি-মানুষের সৃষ্টি এবং ব্যক্তিপ্রতিভারই দান, তবুও সাহিত্য বহু মানুষের উপভোগের সামগ্রী, এবং এর অপেক্ষা রাখে। সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশের মূলেও এর প্রেরণার দান অনেকখানি। সংঘবদ্ধভাবে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব না হলেও, সাহিত্য—বিশেষতঃ সঙ্গীত সম্মিলিত উপভোগের সামগ্রী। নাটক, কবিতা, সঙ্গীত ইত্যাদি একের হয়েও আসলে অনেকের এবং অনেকের বলেই সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের মুখাপেক্ষী। নিজের ভাব বা বক্তব্য অন্যের মনে সঞ্চারিত করে দিতে হলে কিংবা নিজের স্বপ্ন, কল্পনা ও সৌন্দর্যবোধের অংশ-ভাগী করে তুলতে হলে 'শব্দ' 'ধ্বনি' ইত্যাদির সাহায্যেই তা করতে হবে। সাহিত্যে রূপ-কল্পনা, চিত্ররূপ রচনা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা যাই হোক না কেন, সব কিছু নির্মাণের জন্যেই চাই 'শব্দ', চাই 'ধ্বনি'। শব্দ ও ধ্বনির সহায়তা ছাড়া সাহিত্যে কোনো ভাব বা বক্তব্য প্রকাশ কিংবা কোনো রূপরচনাই সম্ভব নয়।

কবিতার জন্যে ভাষা, ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদি অনেক কিছুই দরকার। কিন্তু এর সবকিছুই তো নির্মিত হয় শব্দের সহায়তায়, ধ্বনির পারস্পরিক বিন্যাসে। ছন্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ইত্যাদি ছাড়াও কবিতা রচিত হতে পারে। কিন্তু ভাষা ছাড়া কবিতা নির্মিত হবে কি ভাবে? অনস্বীকার্য, শব্দসমবায়ে গঠিত ভাষা পরিহার করে, এমনকি শব্দের পূর্ণাঙ্গরূপ বিসর্জন দিয়ে কেবল অক্ষর বা প্রতীক চিহ্নের সহায়তায় কবিতা রচনার প্রয়াস দুর্লভ নয়। কিন্তু, এ প্রচেষ্টা মূকাভিনয়ের মতোই 'পরীক্ষা-নীরিক্ষা'র ফলশ্রুতি, কোনো স্বাভাবিক রীতির দান নয়। যেভাবে এবং যে-রীতিতেই কবিতাতে সংস্থাপিত

বিন্যস্ত হোক না কেন, কবিতার জন্যে 'শব্দ'—অর্থজ্ঞাপক অথবা অনর্থ-জ্ঞাপক—একান্তরূপে অপরিহার্য। গদ্যাত্মক, ছন্দোবদ্ধ—যে কোনো ধরনের উচ্চারণের জন্যেই শব্দ চাই। কবিতা অথবা নিছক পদ্য—শব্দের সহায়-তায় ছাড়া এর কোনো কিছুরই মুক্তি নেই।

কিন্তু 'শব্দ' নয়, শব্দসমবায়ই মনোভাব, বিশেষতঃ পূর্ণাঙ্গ মনোভাব প্রকাশের জন্যে জরুরী। কবিতায় যেহেতু মনোভাব কিংবা বক্তব্য প্রকাশই মুখ্য নয়, সে কারণে এর জন্যে প্রয়োজনীয় নিত্যদিনের শব্দ বা শব্দসমবায়ই নয়, ধ্বনি-সমৃদ্ধ রূপময় শব্দও। কেননা, নিছক বক্তব্য নয়, সেই সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি এবং স্বপ্ন-কল্পনা প্রকাশও কবিতার শব্দাবলীর দায়িত্ব। কবিতার রূপ, চিত্র, ছবি ইত্যাদি সবকিছু এবং সাঙ্গীতিক ধ্বনিদ্যোতনা সৃষ্টির জন্যেও চাই শব্দ ও শব্দসমবায়। এ জন্যেই নিত্যব্যবহার্য শব্দ বা শব্দ-সম্ভার দিয়ে কবিতার সব কাজ সম্পন্ন হবার নয়, আভিধানিক শব্দেরও দরকার। কেননা, শুধু অর্থ-জ্ঞাপকতা নয়, ধ্বনি-দ্যোতনাও কবিতার জন্যে জরুরী। শুধু কবিতাই বা বলি কেন, গদ্য রচনার জন্যও তো শব্দের এই ধ্বনিদ্যোতনা চাই। কিন্তু যেহেতু কবিতা সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্ধারিত ছন্দে সমর্পিত, সে কারণে কবিতার শব্দের জন্যে ধ্বনি-দ্যোতনা এবং ধ্বনিসম্পদ অপরিহার্যরূপে জরুরী। মনে রাখা প্রয়োজন, শুধু লিখিত গদ্যে নয়, প্রতিদিনের ব্যব-হারিক গদ্যে অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষায়ও শব্দের নিজস্ব ধ্বনি-দ্যোতনা এমনকি ছন্দ-তাল-মান-লয় ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু কথোপকথনের ভাষায় বিশেষতঃ প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মের অভিব্যক্তিতে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম মানা অথবা রীতি-ভঙ্গীতে আবদ্ধ থাকা অপরিহার্য নয় বলে এই ভাষায় শব্দ বা শব্দসমবায়ের ধ্বনি-দ্যোতনা ও ছন্দ-তাল-মান-লয় ইত্যাদিতে ব্যতিক্রম ঘটানোর অবকাশ আছে। কিন্তু কবিতা প্রতিদিনের ব্যবহার্য শব্দ এবং কথোপকথনের ভাষার শব্দরাজি অঙ্গীকার করে নিলেও, এর সম্পূর্ণতঃই আটপৌরে দৈনন্দিনের ভাষা হয়ে উঠার উপায় নেই; কেননা, কবিতায় যেহেতু আবেগ-অনুভূতি এবং স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-আকাংখা, ইচ্ছা-আর্তি রূপ পায় সে কারণে তাতে কিছুটা বর্ণসমুজ্জ্ব-লতা ও রূপবিভার স্পর্শ লাগে, ফলে কবিকে এর উপযোগী ও অপরিহার্য শব্দসম্ভারই নির্বাচন করে নিতে হয়।

এই নির্বাচনের প্রশ্নেই আসে কবিতার শব্দের ছন্দ, ধ্বনি ও রূপের প্রসঙ্গ। মনে রাখা দরকার, শব্দ যেহেতু অভিব্যক্তির অবলম্বন এবং উচ্চারণেই এর অস্তিত্ব, সে কারণে প্রত্যেকটি শব্দেরই নিজস্ব অন্তর্নিহিত ছন্দ, ধ্বনি ও রূপ থাকে। এবং শব্দমাত্রই মাত্রা-নির্ভর। উচ্চারণের রীতি অনুসারে শব্দের এই মাত্রার তারতম্য ঘটে, তারতম্য ঘটে বাক্যে সংস্থাপনের কায়দা অনুযায়ীও। উচ্চারণ ও ব্যবহারে এই ভিন্নতার দরুনই একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার মর্যাদা পায়, ছন্দে সমর্পিত হয়ে অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ইত্যাদি নামে চিহ্নিত হয়। ছন্দের অন্তরালে রয়েছে শব্দ এবং শব্দের অন্তরালে ছন্দ ও ধ্বনিদ্যোতনা। এদিক থেকে কোনো শব্দই ধ্বনি বিহীন এবং অনুচ্চার্য নয়। যদিও, উচ্চার্য শব্দ মাত্রই অর্থ প্রকাশ করেনা, এবং সব শব্দেরই কোন সুস্পষ্ট অর্থ নেই। কিন্তু অর্থ থাক বা না থাক, শব্দের মাত্রা ও ধ্বনি যেহেতু এর নিজস্ব অন্তর্নিহিত সম্পদ, অতএব, শব্দ থেকে এই ঐশ্বর্য আলাদা করে নেয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। শব্দ এই অপরূপ ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ বলেই কবিতায়—বলা যেতে পারে যে কোন সাহিত্য-কর্মে, শব্দের বাচ্যার্থই প্রধান নয়, প্রধান এর ধ্বনি-ব্যাঞ্জনা, সুর, রং ও রূপ। ব্যাঞ্জনার পাশাপাশি সুর, রং, রূপ এমনকি রস আছে বলেই রস-রূপ-সৃষ্টিতে শব্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সনেট ও চতুর্দশপদী

স্বল্পভাষণে 'সনেট'-এর প্রকৃতি ও চারিত্র্য তুলে ধরতে গিয়ে এই বিশেষ রীতি-ভঙ্গীর কবিতাকে বলা হয়েছে: 'মুহূর্তের কবিতা'। 'সনেট'-এর এই পরিচিতি থেকে স্বভাবতঃই এমন একটা ধারণা জন্মায়, 'সনেট' বুঝিবা একটি মুহূর্তেই জন্ম নেয়। কিন্তু 'সনেট'কে 'মুহূর্তের কবিতা'র অভিধায় চিহ্নিত করা হলেও, একটি সুনির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ মুহূর্তেই সনেটের জন্ম হয় না। যদিও আকৃতিগত দিক থেকে সনেট স্বল্পপরিসর এবং 'সীমাবদ্ধ চরণের' কবিতা বলে, এর লিপিবদ্ধকরণের সময় তুলনামূলকভাবে খুবই কম। লিপিবদ্ধকরণের এই স্বল্প-সময়ের নিরিখে বা পরিমাপে বিচার করলে অবশ্য সনেটকে 'মুহূর্তের কবিতা' বলা যেতে পারে। যদিও, যে-কোন কবিতা সৃজনের মানসিক প্রস্তুতিকাল এবং সৃষ্টির বেদনা সম্পর্কে যাঁরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিংবা ধারণার অধিকারী, তারা জানেন, একটি 'সনেট' কবিতা রচিত হতে হয়তো 'মাস-বর্ষ-কাল'ও কেটে যেতে পারে, আবার মানসিক প্রস্তুতির দীর্ঘপটে ক্ষণ-মুহূর্তেই সৃজিত হতে পারে একটি অনবদ্য 'সনেট'।

সুতরাং 'সনেট'কে 'মুহূর্তের কবিতা' বলার মধ্যে এর প্রকৃতি ও চারিত্র্যগত দিকের আংশিক সত্যই ধরা পড়ে মাত্র; কেননা, মুহূর্তের অনুভূতিকে একটি গাঢ়বদ্ধ সনেটে রূপায়িত করতে গিয়ে কবি যে সৃষ্টির বেদনা ও আর্তি-অকুলতা অনুভব করেন তা যে-কোন খন্ড কবিতা সৃষ্টিকালীন যন্ত্রণার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। সনেটকারদের কবি-অভিজ্ঞতা থেকেই জানা যায়, একটি মুহূর্তের কবিতার সৃজনকালীন বেদনা অতীব তীব্র এবং তীক্ষ্ম। তবে, পার্থক্য সাধারণতঃ এইটুকু যে, যে-কোন খণ্ড-কবিতায় 'সনেটে'র মতো আকৃতি এবং প্রকৃতিগত দিক থেকে কোন বাধ্যবাধকতা কিংবা সীমাবদ্ধতা আরোপিত নেই। খন্ড-কবিতায়

কবি রীতিভঙ্গীর স্বাধীনতা যথেচ্ছভাবে উপভোগ করতে পারেন, আত্ম-প্রকাশের ক্ষেত্রে হয়ে উঠতে পারেন অনেকটাই আত্মমুক্ত। কিন্তু 'সনেট'-এর বেলায় আকৃতি ও প্রকৃতি কোনো দিক থেকেই অমন অবাধ স্বাধীনতার অবকাশ নেই। বিশেষতঃ 'সনেট' যেহেতু 'চতুর্দশপদী' সে-কারণে এর বিচরণক্ষেত্র চৌদ্দ-পংক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদিও, 'চতুর্দশ-পংক্তি' হলেই কবিতা 'সনেট' হয়ে উঠবে, এমন মনে করার কোন কারণ নেই।

আরেক দিক থেকেও যে-কোন খন্ড-কবিতা এবং সনেটের মধ্যে একটি মূলগত পার্থক্য আছে। যে-কোন খন্ড-কবিতা রচনায় কবি-মানসের বৈশিষ্ট্য ও সৃষ্টি-প্রতিভার বৈপরীত্যের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন কবির ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা হওয়া সত্ত্বেও, সনেট রচনায় কবি চারিত্র্যের সমধর্মিতা রক্ষা প্রায় অপরিহার্য। কেননা, সনেটের আকৃতি এবং প্রকৃতির পূর্ব-নির্ধারিত 'ফর্ম'ই এই 'সমধর্মিতা'কে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে এক খন্ড-কবিতায় একজন কবি তাঁর কবিমানস ও কবিচারিত্র্য অনু-সারে যতটা অবাধ স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যের অবকাশ ও পরিবেশ পান, সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতায় তা পান না। স্মরণ রাখা দরকার, খন্ড-কবিতার সাথে সনেটের একটি চরিত্রগত পার্থক্য আছে, এবং এ পার্থক্য বিস্মৃত হলে কবিতা খন্ড-কবিতার মর্যাদা লাভ করা সত্ত্বেও, তা 'সনেট' বা চতুর্দশপদী' বলে বিবেচিত না-ও হতে পারে। অবশ্য বাংলায় ব্যবহৃত 'চতুর্দশপদী'র অর্থ চৌদ্দ-পংক্তির কবিতা। 'চতুর্দশপদী' এই অভিধার মধ্যে কবিতার পংক্তি-সংখ্যা ধরা পড়লেও, চারিত্র্য কিছু-তেই আভাসিত হয় না, ছন্দ-প্রকরণও নিজের প্রকৃতি তুলে ধরে না। সংক্ষেপে, 'চতুর্দশপদী' এই পরিচয় জ্ঞাপকতায় 'সনেটে'র বিশেষ চারিত্র্য-ধর্ম অভিব্যক্ত নয়! অন্যপক্ষে 'সনেট' শব্দটিতে সনেট-কবিতার চারিত্র্য-ধর্মই অভিব্যক্ত, পংক্তি-সংখ্যা নয়। যদিও 'পৃথিবীর সকল ভাষাতেই সনেটের আকৃতি ১৪ পংক্তিতে নিবদ্ধ।' এবং সম্ভবতঃ এ-কারণেই 'সনেট'-এর বাংলা পরিচয় 'চতুর্দশপদী' কবিতা। তবে, সনেটের প্রকৃতি এবং চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হওয়ার ফলে, কিংবা তুল্যমূল্য না পাও-য়ায়, বাংলা সাহিত্যে যত সার্থক চতুর্দশপদী কবিতা সৃজিত হয়েছে, তার তুলনায় সার্থক সনেটের সংখ্যা নিতান্তই কম স্বল্প।

এর কারণ বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশের ধারার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যে সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার আদিস্রষ্টা হিসাবে অদ্যাবধি মধুসূদনের নামই উচচারিত হয়ে থাকে, যদিও পংক্তিসংখ্যা বা আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের বিচার না করে গীতি-কবিতা এবং বিশেষভাবে সনেটীয় গীতিকবিতার স্বভাব-ধর্ম অনুসারে বিচারে প্রবৃত্ত হলে লক্ষ্য করা যাবে যে, সনেট জাতীয় কবিতা মধুসূদনের আগে বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ ছিল না; অবশ্য পংক্তি-সংখ্যা এবং অষ্টক-ষটকের পরিমাপে দেখলে সেসব কবিতাকে 'সনেট' নামে চিহ্নিত করা যাবে না। আবদুল কাদিরের মতে, 'প্রাচীন কাল হইতেই বাংলা ভাষায় চতুর্দশ পংক্তি কবিতা বিরচিত হইয়াছে। কিন্তু একটি ভাব বা বিষয় ঠিক চতুর্দশ পংক্তির আবেষ্টনে প্রকাশ করিবার সচেতন প্রয়াস সে সকল রচনায় দেখা যায় না। সেকালের সিদ্ধাচার্য বা ভাবুকগণ তাঁহাদের বক্তব্য বা ভাবনা তার রসানুকুল বচনে ও ছন্দে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে রচনার পংক্তিসংখ্যা কখনও কখনও চৌদ্দ হইয়া গিয়াছে। সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক সমায়তন পংক্তির মধ্যে সুসংহত রাখিয়া রচনার রূপাবয়ব গঠনের তাগিদ তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই। চতুর্দশ পংক্তির সুগঠিত রূপবন্ধে একটি প্রবল ভাব-প্রেরণা বা উচ্ছ্বসিত রস-কল্পনাকে বন্দী করার সাধনা তাঁহাদের ছিল না—তাঁহারা অন্তরের আবেগ ও উপলব্ধিকে কথায় ও সুরে সচ্ছন্দভাবে বাজিয়া ওঠার অবাধ অবকাশ মঞ্জুর করিয়াছেন।' (আবদুল কাদির সম্পাদিত 'সনেট শতক'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। এ-প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ আদিযুগের কাহ্নপাদ, মধ্যযুগের চন্ডীদাস ও যুগসন্ধিকালের ঈশ্বরগুপ্তের তিনটি চতুর্দশপংক্তি কবিতা, উদ্ধৃত এবং সে-সবের ছন্দ-বিচার করে আবদুল কাদির বলেছেন, 'সকল কবিতার ভাবদেহ দীর্ঘায়িত করা যেমন দুরূহ নহে, তেমনি সংকুচিত করাও সম্ভবপর।' (ঐ) 'চতুর্দশ পংক্তির সুনির্ধারিত রূপমন্ডলে' বাংলায় প্রথম রচনা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: 'কিন্তু চতুর্দশ পংক্তির সুনির্ধারিত রূপমন্ডলে ভাবাবেগ বা রসপ্রেরণাকে দৃঢ়-নিবদ্ধ রাখিয়া ইতালীয় সনেটের ছাঁচে বাংলায় প্রথম কবিতা রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'কবি-মাতৃভাষা' বাংলা ভাষায় বিরচিত প্রথম সনেট। ---মধুসূদন 'সনেট' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরী করেন 'চতুদশপদী'। (ঐ)

এ থেকেই লক্ষ্যণীয় যে, মধুসূদন তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীকে 'সনেট' এই অভিধায় চিহ্নিত করেননি। সনেটের অষ্টকে যে প্রস্তাবনা এবং ষটকে যে সমাপ্তির ধারা স্বীকৃত রয়েছে তার আলোকে বিচার করলে মধুসূদনের চতুর্দশপদাবলীর অনেকগুলোকেই হয়তো যথার্থ সনেটরূপে আখ্যায়িত করা যাবে না। পংক্তি-বিচারে সবগুলো চতুর্দশপদী উত্তীর্ণ হলেও, প্রকৃতি-বিচারে সবগুলো সমমানে উত্তীর্ণ হবার দাবী রাখে না। সনেটকে বলা হয় আত্মসত্তার অকৃত্রিম অভিব্যক্তির আধার; ব্যক্তিসত্তা সনেটের গীতিধর্মিতাকে এবং বিশেষ করে এর রোমান্টিক হাহাকার বা আর্তি-আকুলতাকে যথাথ রূপে প্রকাশিত হতে দেয় না। মুহূর্তের আবেগ-অনুভূতিকে প্রকাশরূপ দিতে গেলে যে সাঙ্গীতিক-সংহতি এবং পিনদ্ধতা প্রয়োজন, ব্যক্তিসত্তা আত্মসত্তার ওপর বিজয়ী হলেও তা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। মধুসূদনের চতুর্দশপদীতেও এ অনুভূতি, উপলব্ধি, নয়, বক্তব্যবিষয়ই প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। বিভিন্ন ইউরোপীয় কাব্যপাঠের পর এবং সর্বোপরি বিদ্রোহী কবিপুরুষ মধুসুদন হয়তো এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, এবং এ কারণেই তিনি তাঁর কবিতার নামকরণ করেছেন 'চতুর্দশপদী'। এ প্রসঙ্গে মধুসূদনের স্বীকৃতি: "আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কার কাব্য পড়িতেছিলাম এবং তাঁহার রীতি অনুসরণে কতকগুলি সনেট রচনা করিয়াছি।---আমি সাহসের সঙ্গে বলিতে পারি, সনেট 'চতুর্দশপদী' আমাদের ভাষায় চমৎকার উৎরাইবে।" (বন্ধু গৌর দাস বসাককে লেখা মধুসূদনের পত্র)।

এ থেকেই স্পষ্ট যে, ইটালীয় কবি পেত্রার্কার অনুসরণে মধুসূদন বাংলা ভাষায় চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট রচনা করেন এবং 'সনেট' শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবেই ব্যবহার করেন 'চতুর্দশপদী'। উপরোক্ত পদাংশেও এর প্রমাণ মেলে। আবদুল কাদিরের মতে, 'মধুসূদন 'পদ' অর্থে ছন্দ পংক্তি (Metrical line) বুঝিয়াছেন এবং 'চতুর্দশপদী' বলিতে চতুর্দশ পংক্তি বুঝাইয়াছেন। 'চতুর্দশপদী' কথাটি দ্ব্যর্থবাচক; সে জন্যেই 'সনেট' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে এ-কথাটি বহুল প্রচলিত হয় নাই।' (ঐ) না হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, সনেটের আঙ্গিক-স্বাতন্ত্র্যেই এর শ্রেষ্ঠ পরিচয় নিহিত নেই, এর পরিচয় উদ্‌ভাসিত নিজস্ব স্বভাবধর্মে। সনেটের এই নিজস্ব স্বভাবধর্ম সম্পর্কে সচেতন না হলে সনেট সৃষ্টি

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। পংক্তির হিসাবে সনেট বা চতুর্দশপদী রচনা অপেক্ষাকৃত অনায়াস-সাধ্য, কারণ, চৌদ্দ-পংক্তির সুনির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ আয়তনে একটি গীতিধর্মী খণ্ড-কবিতার দ্যোতনা সৃষ্টির কাজটি দুরূহতম নয়; কিন্তু সনেটের গাঢ়বদ্ধ সাঙ্গীতিক দ্যোতনা-সৃষ্টি নিতান্তই জটিল। এ-কারণেই চৌদ্দপংক্তিবিশিষ্ট কবিতা রচনায় অনেক কবিকেই চিত্তের স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্তি অনুভব করতে দেখা যায়, কিন্তু সনেট রচনায় অনেকেই সার্থককাম হন না।

বাংলা 'সনেট-'এর সার্থকতা এবং শিল্পরূপের বিচারের আগে, এর আদি ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা যেতে পারে। বলেছি, মধুসূদনই বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার আদি স্রষ্টা, যদিও ব্যাপক অর্থে বাংলা কবিতায় চতুর্দশপদী রচিত হয়েছে তারও অনেক আগে। উল্লেখ্য, ইটালীর কবি পেত্রার্কা সনেটের জনক হিসাবে কীর্তিত এবং মধুসূদন সনেট কবিতা রচনায় অনুপ্রেরণা এবং আদর্শের-আদল লাভ করেন পেত্রার্কা থেকেই। যদিও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পেত্রার্কার আগে আন্দালুসীয় মুসলিম কবিরাই এই বিশেষ আঙ্গিক ও স্বভাব-ধর্মের কবিতা রচনা করেন। বস্তুতঃপক্ষে, স্পেনেই গীতিকবিতার জন্ম হয় এবং আরবী কবিতার প্রভাবে স্পেনীয় কবিতা উপজীব্য-বিষয় আঙ্গিক ইত্যাদির দিক থেকে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। ইতিহাস বলে, ইটালীর আদি ও জনপ্রিয় কবিতার সাথে আন্দালুসিয়ার আদি কবিতারও বিশেষ মিল ও সাযুজ্য রয়েছে। আরবদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী পেত্রার্কার বিক্ষোভের ভাষার মধ্য দিয়েও এ-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, তাঁর সময়েও ইটালীতে আরবী কবিতার বিশেষ সমাদর ও প্রভাব ছিল। তাঁর কবিতায়ও রয়েছে এই প্রভাবের ফলশ্রুতি। এই প্রভাবের আওতায় এসেই পেত্রার্কা সনেটীয় গীতিকবিতা রচনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, আঙ্গিকের ইশারাও পেয়েছিলেন এভাবেই।

সনেট-কবিতার জন্ম, গীতি-কবিতার ব্যাপক প্রসার ও প্রচার এবং সনেট রচনায় পেত্রার্কার ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জগদীশ ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে বলেছেন: 'আধুনিক য়ুরোপের কাব্য-সাহিত্যে গীতি-কবিতা প্রাচ্যেরই দান। য়ুরোপের প্রাচীন প্রজ্ঞাভূমি অর্থাৎ গ্রীক-রোমক সাহিত্যে মহাকাব্য ও নাটকেরই প্রাধান্য। আধুনিক য়ুরোপ অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ

গীতিকবিতার প্রকৃত আস্বাদন পেল আরবের কাছ থেকেই। প্রাচীন য়ুরোপের মাত্রিক কাব্য যে আধুনিককালে আক্ষরিককাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে তার মূলেও প্রাচ্যের প্রভাব বিদ্যমান। তা'ছাড়া আরবী গজলের মিল-বিন্যাস এবং মিলের মালা গেঁথে স্তবক-গ্রন্থনরীতিও আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকবিতাকে প্রভাবিত করেছে। Terza Rima যেমন মিল-বিন্যাসে প্রাচ্যরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত, তেমনি প্রাচ্যের সনেটও আরবি গজলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। --- আরবি সাহিত্য শুধু বাগদাদ থেকেই আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকবিতাকে প্রভাবিত করেনি। স্পেনে এবং সিসিলিতেও খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দের শেষভাগে, নবম ও দশম শতকে আঞ্চলিক আরবি সাহিত্য গড়ে ওঠে। স্পেনীয় আরব এবং সিসিলীয় আরবদের সেই গীতিকাব্য-সাহিত্য আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকবিতার বিচিত্র ছাঁচ রচনায় বিশেষ প্রেরণা দিয়েছে।' (সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ২০—২১)।

আবদুল কাদির বলেছেন, 'পেত্রার্কার পূর্বেও ইতালীতে সনেটের অনুশীলন ছিল, কিন্তু পেত্রার্কার সনেটেই মানবিক অভিজ্ঞতা লাভ করে অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি। এখানেই তিনি প্রেম-কবিতার সমগ্র ঐতিহ্যের সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত, এবং এবই কালে ইওরোপীয় গীতিকবিতার উৎসমুখ। পেত্রার্কার সনেট-গ্রন্থ Rime প্রেমকাব্য ; তাঁর প্রেমাস্পদা লরা (Laura) তার মর্মমূলে সঞ্চার করিয়াছে নিবিড় রসপ্রেরণা। কিন্তু মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে একটিও প্রেমাত্মক রচনা নাই। অবশ্য কবির মানবিক অনুভূতি ও জীবন-প্রত্যয়ের প্রকাশ কোথাও কোথাও হৃদয়স্পর্শী রূপলাভ করিয়াছে।' (সনেট শতক, ভূমিকা) রোমান্টিক কবির সনেট-জাতীয় গীতিকবিতা বা চতুর্দশপদী কবিতার যে হাহাকার ধ্বনিত তাকে বলা যেতে পারে, আত্মমুক্তির হাহাকার কিংবা আত্মশক্তির বিলসন। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেট-কবিতার বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তিও গ্রাহ্য। সাধারণভাবে যে-ধারণা করা হয়ে থাকে যে, সনেটের বিষয়বস্তু প্রেম, এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে তার সীমাবদ্ধতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আত্মমুক্তির হাহাকার বা আত্মশক্তির বিলসনই যদি হয় সনেট কবিতার আরাধ্য, তা'হলে শুধু 'প্রেম'-এর উপলব্ধির মধ্যে সনেটকে সীমায়িত রাখা অর্থহীন হয়ে পড়ে। প্রেমের অনুভূতি

নিঃসন্দেহে একটি বিশুদ্ধ এবং তীব্রতা সঞ্চারী অনুভূতি। এ অনুভূতি সনেটজাতীয় গীতিকবিতায় স্বাভাবিকভাবেই স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সাংগীতিক-প্রাণ প্রবাহ খুঁজে পায়। অন্যতর চিন্তাধারা বা উপজীব্য বিষয় সনেটে তুলনীয় সজীবতা নাও লাভ করতে পারে। অবশ্য প্রতিভাবান এবং সনেট রচনার উপযোগী সৃজনধর্মী কবির হাতে সবকিছুই সমভাবে স্ফূর্তি পেতে পারে; আর এও তো সত্য যে, সাহিত্যে বিষয় গৌণ এবং প্রকাশরূপই মুখ্য। প্রকৃতিগত ও স্বাভাবিকধর্মের দিক থেকে সনেট না হলে কোনো বিষয়ই তো সনেট পদবাচ্য হবে না।

মধুসূদন প্রেম নিয়ে একটিও সনেট রচনা করেননি, এ-কথা সত্য। কিন্তু তাঁর সনেটের বন্ধনে শারীরীপ্রেমের অনুভূতি ধরা না দিলেও স্বদেশ-প্রেম এবং বিশেষ অর্থে মাতৃভাষা-প্রেম তীব্রতা নিয়ে ধরা দিয়েছে। বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় ভংগীতে এবং আংগিকের অনুসরণে রচিত মধুসূদনের সনেটে এই বিশেষ প্রেমানুভূতিই অনেকক্ষেত্রে তীব্রতামণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সনেট রচনায় মধুসূদনের গুরু পেত্রার্কার সাফল্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আবদুল কাদির বলেছেন, 'যে দুইটি রূপবন্ধ পেত্রাকার আবির্ভাবের পূর্বে, এমন-কি প্রাক দান্তে যুগেও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু পেত্রার্কার কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি সেই ক্লাসিক্যাল ছন্দোবন্ধের আকারের সহিত তাহার স্বানুভূত ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ভাব-প্রেরণা সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস করিয়া আশ্চয সুন্দররূপে মূর্ত করিতে সমর্থ হন, ফলে তাহা 'পেত্রার্কীয় রীতি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।' (ঐ) কিন্তু পেত্রার্কার শিষ্য কবি মধুসূদনের সনেটে সর্বত্রই স্বানুভূত ব্যক্তিগত বিশিষ্ট ভাব-প্রেরণা রূপায়িত হয়নি। পেত্রার্কার মতো উপজীব্যকে প্রেম এর মধ্যে সীমায়িত না রেখে মধুসূদন 'চতুর্দশপদী'তে নানা বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। উল্লেখনীয়, তাঁর 'চতুর্দশপদী' শুধু আত্মহাহাকারের বাহনই নয়, ঐতিহ্যবোধেরও রূপকার। চতুর্দশপদীর গীতিধর্মিতার মধ্যে দিয়ে তিনি কেবল নিজের কথাই বলেননি, অন্যের কথাও বলেছেন। অনেকক্ষেত্রে এমনও অনুভবযোগ্য যে, কবি যে বক্তব্য একটি সুনির্দিষ্ট ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন, তা অনেকখানি অভ্যাসের বশেই যেন, চতুর্দশপদী কবিতায় প্রকাশ করেছেন—অর্থাৎ এসব কবিতায় 'সনেট' এর আকৃতি রূপ পেলেও, প্রকৃতি

বাঙ্ময় হয়নি। এসব ক্ষেত্রে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা নিছক শিক্ষিত অভ্যাসের কারুকর্মে পরিণত হয়েছে।

বস্তুত, সনেট-রচনার ক্ষেত্রে এর প্রকৃতিধর্মের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে কেবল আকৃতি এবং মিল-বিন্যাসের দিকে অধিক নজর দিলে, কবিতা-রচনা নিছক শিক্ষিত-অভ্যাসের কারুকর্মে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা, অমন বন্ধন-দশায় আবেগ-অনুভূতি এবং স্বপ্ন-কল্পনার অবাধ বিকাশ সম্ভব নয়, গাঢ়বন্ধ এবং রূপ-সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠাতো দূরের কথা। সনেটের গঠন-প্রকৃতি বস্তুত এর মিল-বিন্যাসের মধ্যেই কেবল সার্থকরূপ লাভ করে না; কারণ, অষ্টক ও ষটকের যে গঠন ও রূপ-বিন্যাস সাধারণ মিলের অর্থে তা প্রায় সব কবিরই সৃষ্টিসাধ্য, কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে কিংবা স্বভাবধর্মে কয়জন কবিই বা সার্থক সনেট রচয়িতা? যে-কোন কবির পক্ষেই সনেট রচনা সম্ভব নয়, যদিওবা চতুর্দশ-পংক্তি রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কারুকর্ম আকর্ষণীয় দক্ষতার পরিচায়ক হতে পারে। মিল-বিন্যাসই 'সনেট'-এর সাফল্যের একমাত্র নিয়ামক কিংবা পরিচায়ক নয় বলেই, সনেট-কবিতার চারিত্র্য তুলে ধরতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক-কবিরা এর 'অষ্টক' ও 'ষটক'-এর ওপর যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন, মিল-বিন্যাসের প্রতি ততটা গুরুত্ব দেননি। এর কারণ, মিল-বিন্যাস সনেটে' নানা ধরনের হতে পারে, এমন কি 'অষ্টক' 'ষটক' ও স্থান বদল করে 'ষটক' 'অষ্টক' এ রূপ নেওয়া বিচিত্র নয়। কেনো-কোনো প্রতিভাবান কবি তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন। জানা যায়, 'verlaine' নামক একজন আধুনিক প্রসিদ্ধ ফরাসি কবি অনিয়ন্ত্রিততার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। তাঁহার রচিত দু-একটি সনেটে ষটকাষ্টক বিভাগ একেবারে বিপরীত। ষটক আরম্ভে—অষ্টক শেষে। --- এখানে একটি কথা উঠিতে পারে—কবিতার উৎকর্ষই সর্বাগ্রে দ্রষ্টব্য, নিয়মপরতন্ত্রতা পরে। রচনার নিয়মতো আর আগে হইতে উদ্ভূত হয় না। কবিতা-বিশেষের সুন্দর গঠন-প্রণালী, ও শিল্পসৌষ্ঠবের আলোচনা হইতেই রচনার নিয়মাবলী নিরূপিত ও নির্দিষ্ট হয়। এবং নির্দিষ্ট কোনো একটি নিয়মের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও যদি কোনো কবিতা সর্বাঙ্গসুন্দর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমরা সে নিয়মের মর্যাদা রাখিতে বাধ্য নই। বরং সে-নিয়মের ব্যতিক্রমই নুতন নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়।' (প্রিয়নাথ সেন, সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩২০)।

সনেটের প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই বিশেষ আঙ্গিকের কবিতার আকৃতির আলোকে আবদুল কাদির বলেছেন, 'সনেটের গাঢ় ও গভীর ভাব-প্রবাহ অষ্টকে সর্বোচচ আয়তন ও বেগ লাভ করে এবং তারপরই ষটকে তাহা দ্রুত প্রশমিত হইয়া ক্রমে অতলে নিঃশেষিত হয়। যে দুইটি চতুষ্ক-যোগে অষ্টক গঠিত হয়, তাহার প্রথমটিতে থাকে বক্তব্যের উদ্বোধন বা প্রস্তাবনা, দ্বিতীয়টিতে থাকে বিশ্লেষণ বা কারণ-নির্দেশ। যে দুইটি ত্রিপদিকাযোগে ষটক গঠিত হয়, তাহার প্রথমটিতে থাকে বিষয়ের পরিপূরণ হিসাবে তাহার বিপরীত বা অপর দিকের বর্ণনা, দ্বিতীয়টিতে থাকে সমগ্র ভাববস্তুর একটি মিমাংসা কিম্বা ভাবের প্রারম্ভিক উপলব্ধিতে উপসংহার। খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেটে অষ্টকে দুইটি চতুষ্ক যেমন পরস্পর-সংযুক্ত নহে, ষটকে দুই ত্রিপদিকাও তেমনই পূর্ণ ভাব-যতি (Thought pause) দ্বারা পরস্পর হইতে বিযুক্ত। কোন দৈব মুহূর্তে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের প্রেরণায় কবি-চিত্ত যখন রূপের দিব্য বিভায় উদ্দীপিত হইয়া ওঠে, সনেট সেই বিরল ভাব-মুহূর্তের অসীম-স্পর্শ আলোড়নের অখন্ড বাণীমূর্তি--সেই অপরূপ রসমূর্তিকে ভাস্কর্য-প্রতিম করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই এরূপ কঠিন নিয়মবন্ধনের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্র এমন কঠিন নিয়ম-নিগড় দৃষ্ট হয় না--বহু সনেটে প্রথম চতুষ্কের প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অথবা ত্রিপদিকার নির্ধারিত সীমারেখা লংঘন করিয়া ভাবরাশি পরবর্তী পংক্তিতে প্রবহমান হইতে দেখা যায়।" (সনেট-শতক, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

সনেটের এই প্রকৃতি বিশ্লেষণেও 'অষ্টক' ও 'ষটক' এর গঠন এবং ভাবের বিন্যাসের ওপরই মূলত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, পংক্তির মিল-বিন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, যে-দুটি 'চতুষ্কযোগে-অষ্টক গঠিত তার সংস্থাপনেরও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে যে-দুটি 'ত্রিপদিকা'-যোগে 'ষটক' গঠিত তাতেও সংস্থাপনরীতিতে নানা-ধরন লক্ষ্যণীয়। বিশেষত তিনটি 'চতুষ্ক' আলাদাভাবে সংস্থাপিত করে এবং সর্বশেষে 'দ্বিপদিকা' অর্থাৎ দুটি পংক্তির সমবায়ে ও অন্ত্যমিলের মধ্য দিয়ে গঠিত 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী' কবিতায় 'অষ্টক' 'ষটক' এর চারিত্র্যে ও প্রকৃতিধর্ম বজায় রাখা সম্ভব হয় না। সুতরাং 'সনেটের গাঢ় ও গভীর ভাব-প্রবাহ অষ্টকে সর্বোচচ আয়তন ও বেগ লাভ করে এবং তারপরই

ষটকে তাহা দ্রুত প্রশমিত হইয়া ক্রমে অতলে নিঃশেষিত হয়'--এই চারিত্র্য উপরোক্ত ধরনের কবিতায় তেমন বজায় থাকে না। এর প্রধান কারণ, বাংলা পয়ারে (যদি তা প্রবহমান পয়ার না হয়) এমনিতেই পংক্তি-শেষে 'ভাবে' যতি পড়ে যায়। অন্ত্যমিল-বিশিষ্ট পয়ারে তো এই যতিপাত প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ কারণেই, অনেক সময় 'সনেট' এর 'চতুষ্ক'ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবমন্ডিত হয়ে পড়ে, ফলে ভাবের প্রবাহ, আবর্ত কিংবা সাঙ্গীতিক-দ্যোতনা বজায় থাকে না। এ-কারণেই, সনেট-রচনায় শেক্সপীয়রিয়-রীতি অপেক্ষা পেত্রার্কীয়-রীতি এবং ইতালীয় আদর্শই (অষ্টক ও ষটক এর বিভাগ) অধিক উপযোগী বিবেচনা করা হয়। যদিও এই রীতির সফল-অনুসরণ খুবই কঠিন। এবং এ-কারণেই সনেট-রচয়িতারা মিল-বিন্যাসে নানা রীতি অনুসরণের স্বাধীনতা নিয়েছেন। বিশেষত 'ষটক' বা 'ষটপদকে'। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, 'ষটপদকের ছয়টা পংক্তির বিন্যাস সম্বন্ধে নানা মুনির নানামত; সনেটের আদি জন্মভূমি ইতালিতেই এই অংশের তিনচার রকম মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন-১. প্রথম ও চতুর্থ পংক্তিতে মিল, দ্বিতীয় ও পঞ্চমে মিল এবং তৃতীয় ও ষষ্ঠে মিল। ২. প্রথমে পঞ্চমে, দ্বিতীয়ে চতুর্থে এবং তৃতীয়ে ষষ্ঠে মিল। ৩. প্রথমে তৃতীয়ে পঞ্চমে মিল এবং দ্বিতীয়ে চতুর্থে ষষ্ঠে মিল। ষটপদকের এই চারিটি মূর্তিই স্বয়ং পেত্রার্কার মূল রচনার মধ্যে দেখিয়াছি। --- প্রথমেই অষ্টদল (Octave) পদ্মের চারিটি দল খুলিয়া যাইবে ও ভাব-বস্তু উন্মেষিত হইবে; তার পর আর চারিটি পাপড়ি প্রস্ফুরিত হইয়া উহাকে সৌষ্ঠব-সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। সর্বশেষে ষট্‌পদের মতো ষট্‌পদক (Sestet) আসিয়া উহাতে সংলগ্ন হইবে এবং উহাকে সার্থক করিবে। ইহাই সনেটের বিকাশ-বিধি।' (ভারতী, শ্রাবণ, ১৩২০)।

কিন্তু অষ্টক ও ষটকের এই সন্নিবেশ এবং সংস্থাপন-রীতি, সনেটের 'বিকাশ-বিধি' সব কবির হাতেই অলংঘনীয়রূপে বজায় থাকেনি। কেননা, সনেটের এই রূপরীতি তো মানুষেরই আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনী-প্রতিভার দান, নিয়তি-নির্ধারিত কোনো অলংঘনীয় বিধান নয়। এবং এই রীতিলংঘনে কোনো পাপাচারেরও আশংকা নেই। আর নেই বলেই প্রতিভাধর, সৃজনী-ক্ষমতায় বলীয়ান কবিরা যুগে-যুগেই 'সনেট' রচনায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা

করেছেন—অষ্টক ও ষটকের গঠনে, সন্নিবেশে, পংক্তির সংস্থাপনে, অন্ত্যমিলে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল যে কত বিচিত্র-বিধ হয়েছে আবদুল কাদির তাঁর 'সনেট-শতক' সংকলনগ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকায় সনেট-কবিতার রূপরীতির উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য, ভাবের অবাধ-মুক্তি এবং স্বাধীন স্ফূর্তির প্রয়োজনে 'সনেট' রচনায় কবিরা স্বেচ্ছাচারী হয়েছেন, এবং তাঁদের মনে 'সনেট কেন চতুর্দশ-পংক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে?'—এমন প্রশ্নও জেগেছে। কারণ, সনেট তো একটি বিশেষ 'কবিতা-রচনা পদ্ধতি'র নাম এবং সৃজন-ধর্মী কবিরাই এর উদ্ভাবক। সুতরাং মৌল-প্রকৃতি বজায় রেখে চতুর্দশ-পংক্তির বেশি কিংবা কমে 'সনেট' রচনা সম্ভব হবে না কেন? 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' এই শিরোনামের এক আলোচনায় 'সনেট-পঞ্চাশৎ' এর কবি প্রমথ চৌধুরী এর কিছুটা কারণ নির্দেশ করেছিলেন বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দশ হবার কার্যকারণের আলোকে। তিনি বলেন, 'পয়ারে চতুর্দশ অক্ষরের মতো, সনেটে চতুর্দশ পদের একত্র সংঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই কারণে একই রকমের যোগা-যোগ সিদ্ধ হয়েছে।' প্রমথ চৌধুরী অবশ্য তাঁর এই মত প্রসঙ্গে পূর্বাহ্নেই বলেছেন, 'কী কারণে সনেট চতুর্দশপদী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে এবং সে-মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সপক্ষে কোনোরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ।' (ভারতী ভাদ্র, ১৩২০)। প্রিয়নাথ সেন এর কারণ নির্দেশ করে বলেছিলেন, 'খুব সম্ভব কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণ-রসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দশপদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।' (সাহিত্য)।

সনেট-এর গঠন-রীতি, ছন্দ ইত্যাদি বিষয়ে এবং সনেট কেন চতুর্দশপদী এই প্রশ্নে পরবর্তীকালেও সনেট-রচয়িতা-ছন্দ-কলাবিদেরা নানা বক্তব্য রেখেছেন। মোহিতলাল মজুমদারের মতে, 'সনেটে চৌদ্দটি একছন্দের পংক্তি থাকে—ইংরাজীতে Iambic pentameter ছন্দই সনেটের ছন্দ; বাংলাতেও তাহার অনুরূপ চৌদ্দ-অক্ষরের পয়ারই প্রশস্ত।' বুদ্ধদেব বসু অবশ্য ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন, তাঁর মতে, 'চৌদ্দ অক্ষরের চৌদ্দটি লাইনে কতটুকু কথাইবা বলা যায়? আমার মনে হয়, আঠারো অক্ষরের ছন্দই

বাংলায় সনেট রচনায় সবচেয়ে উপযোগী।' এ-দুটি উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট যে, মোহিতলাল মজুমদার 'চৌদ্দ-অক্ষরের পয়ারই' সনেট রচনার জন্য প্রশস্ত এবং বুদ্ধদেব বসু 'আঠারো অক্ষরের ছন্দই সবচেয়ে উপযোগী' জ্ঞান করেন। অথচ বাংলা কবিতার দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে বাংলা ভাষায় 'চৌদ্দ-অক্ষরের পয়ার' এবং 'আঠারো অক্ষরের পয়ারে'ই অজস্র উৎকৃষ্ট 'সনেট' রচিত হয়েছে। সুতরাং, 'সনেট'-এর সার্থকতা যতখানি ছন্দ-নির্ভর নয়, তার চেয়েও বেশি কবির প্রকৃতি এবং স্বজনী-ক্ষমতা নির্ভর। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়, ''সনেটে বাক্যকে পল্লবিত করিবার উপায় নাই; বাচালতার অবসর নাই। যাহাদের ভাষা ভারে কাটে, ধারে কাটে না, তাহারা কখনো ভালো সনেট লিখিতে পারে না। যাহারা ফেনাইতে ভালোবাসে, রস-সংযমে (reticence) অক্ষম, তাহারা সনেট লিখিলে তাহা কাঁচা থাকিয়া যায়। যাহাদের ওজনজ্ঞান প্রবল তাহারাই এই পাকা ছাঁচে ছাঁচ তুলিতে পারে। যে প্রকৃত গুণী সে বাঁশির সাতটা ছিদ্র দিয়া হৃদয়ের হাজার দরজা খুলিয়া দিতে পারে; যে-বাস্তবিক নিপুণ শিল্পী সে সনেটের এই কঠিন বন্ধনের ভিতরেই মুক্তির আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হয়। সনেট সঙ্গীত-বিজ্ঞানের প্রকৃষ্ট নিয়মানুসারে পরিকল্পিত সংগঠিত ও পরিবর্ধিত। উহা ক্ষুদ্র আয়তনে বৃহতের আভাস।'' (ঐ)।

সুতরাং, সনেটের সাফল্য আকৃতি এবং প্রকৃতিনির্ভর। একটি সনেটের শিল্প-সার্থকতার জন্যে বিশেষ দক্ষতার সাথে এই আকৃতি ও প্রকৃতি বজায় রাখা দরকার। এই দুইয়ের সমন্বয় যেখানে ঘটেছে সেখানে 'চৌদ্দ অক্ষর' 'আঠারো অক্ষর' ইত্যাদির প্রশ্ন, এমনকি 'অক্ষরবৃত্ত' 'মাত্রাবৃত্ত'---ইত্যাদি ছন্দের প্রসঙ্গও অবান্তর হয়ে গেছে, সব কিছুর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে অনবদ্য কবিতার বাণী-মূর্তি ও রূপ-সুষমা। কিন্তু 'সনেট'-এর আঙ্গিকে এই বাণীমূর্তি ও রূপ-সুষমা গড়ে তোলার জন্যে চাই কবিমানসের একটি বৈশিষ্ট্যধর্মী গড়ন। ক্লাসিক ও রোমান্টিক এই উভয়ধর্মী কবির ক্ষেত্রেই এই মানস-গড়নের সাযুজ্য অনু-সন্ধানযোগ্য। ক্লাসিকধর্মী কবির সনেট সুঠাম-বন্ধনের মধ্য দিয়ে কবিতার ভাবদেহ সৌকর্যমন্ডিত হয় এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তা বর্ণসজ্জাকেই প্রতিফলিত করে। এ-কারণে ক্লাসিকধর্মী কবির সনেটে ভাবদেহ কাঠিন্যের

আবরণে প্রকাশিত হয় এবং ব্যঞ্জনার চেয়ে তা অধিকতর সুঠাম-- বন্ধনের পরিচয়ই বহন করে। ফলতঃ সনেটের প্রাণসত্তায় যে সাঙ্গীতিক প্রবহমানতা ও আবহ নিহিত থাকে, ক্লাসিকধর্মী কবির রচনায় তা তেমন আবেগ-সঞ্চারী হয় না। বস্তুত, আবেগই হলো সনেটের ধ্বনির বিস্তৃতি বা গীতোচ্ছ্বাস। উল্লেখনীয়, গীতিকবিতার গীতোচ্ছ্বাসের সাথে সনেটীয় গীতোচ্ছ্বাসের সুস্পষ্ট ও অনুভবযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। সনেটের যে সাঙ্গীতিক রূপ তা শিথিল-বন্ধন হতে পারে না, তাকে হতে হয় 'সংহত এবং ঘনীভূত।' এ-কারণেই, শুধু পংক্তি-বিচারে নয়, প্রকৃতিগত ও গঠনগত কারণেই সাধারণ গীতিকবিতার সাথে সনেটের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ক্লাসিকধর্মী ও রোমান্টিক—এই উভয় চারিত্র্যের কবির রচনার মধ্যেই সনেটের উপরোক্ত রূপরীতি অনুসন্ধানযোগ্য। কিন্তু 'সনেটের' ভাবদেহের ঘনবদ্ধরূপ রোমান্টিক কবির রচনায় যতটা লক্ষ্যযোগ্য, ক্লাসিকধর্মী কবির রচনায় ততটা নয়। কিন্তু ক্লাসিকধর্মী কবির সনেটীয় কারুকর্মে ভাবদেহের ঘনবদ্ধরূপ সুস্পষ্ট না হলেও, এর আঙ্গিক ও গঠন অপেক্ষাকৃত সুঠাম, কারণ ক্লাসিকধর্মী কবি স্বভাবগত কারণেই আঙ্গিকের প্রতি অধিক সচেতন। কিন্তু এই সচেতনতার অর্থ এই নয় যে, ক্লাসিকধর্মী কবির হাতেই সনেট অধিকতর সার্থকরূপে বিকশিত হতে পারে। বরং অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ক্লাসিকধর্মী কবির স্বাভাবিক আঙ্গিক-সচেতনতা সনেটের স্ফূর্তিকেই ব্যাহত করেছে, ফলে ভাবদেহ সুষ্ঠুরূপে নির্মিত হতে পারেনি। এবং এ-কারণে সুঠামগঠনের মধ্যে তা অনেকখানি বিপর্যস্ত হয়েছে। অন্যদিকে রোমান্টিক কবির দূরভিসারী কল্পনা ও অনুভূতির তীব্রতা স্বাভাবিকভাবেই সনেটের প্রাণসত্তাকে জীবন্ত করে তোলে; তবে শব্দচয়ন ও কারুকর্মে শিথিলতা যে-কোন ক্ষেত্রে সনেটের দেহরূপকে নিটোল হয়ে উঠতে দেয় না, এও মনে রাখা দরকার। 'মুহূর্তের কবিতা' কিংবা ইংরেজ কবি রসেটির A sonnet is a moment's monument এই অভিধার মধ্যে সনেটের যে স্বভাবধর্ম ও প্রকৃতি প্রকাশিত, তাতে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গটি মুখ্য, সনেট-এর গঠনপ্রকৃতির কথাটি গৌণ। বস্তুত, মুহূর্তের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা রোমান্টিক কবির রচনাতেই বিধৃত এবং এ-কারণেই সনেট রচনার ক্ষেত্রে রোমান্টিক-ভাবব্যঞ্জনা সবিশেষ

সহায়ক। তবে আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই রোমান্টিক কবির ভাব-প্রবাহকে ব্যঞ্জনাময় কিংবা মূর্ত হতে দেয় না। সনেটীয় মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রেও রোমান্টিক-কবির শিথিলতা অধিক লক্ষ্য-যোগ্য। কি শেক্সপীয়রিয়, কি পেত্রার্কীয়-উভয়রীতিতেই এ-শৈথিল্য দৃষ্টিগোচর।

নাটক ও কাব্যনাটক

নাটক হচ্ছে এক ধরনের শিল্পকর্ম। নাটকের শিল্পমূল্য বস্তুত সাহিত্যমূল্যই নয়, মঞ্চের সঙ্গে এর শিল্পমূল্য বিশেষভাবে জড়িত। সাহিত্য হিসাবে নাটকের স্বতন্ত্র আবেদন থাকলেও মঞ্চ-সাফল্যের ওপরই নির্ভর করে নাটকের সার্থকতা। এ কারণেই পাঠ্যসংলাপ হিসাবে কোন রচনার শিল্পকৃতি যত উঁচুদরেরই হোক না কেন, মঞ্চ সফল না হলে তাকে নাটক হিসাবে গ্রহণ করতে স্বভাবতই দ্বিধা ও কুণ্ঠা জাগে। পাঠ্যসংলাপে আমরা চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, চরিত্রের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা আমাদের মনে সঞ্চারিতও হতে পারে, কিন্তু অভি-নয়ের মাধ্যমে মঞ্চে যেভাবে চরিত্রের বিকাশ বা স্বতঃস্ফূর্তির সঙ্গে পরি-চিত হওয়া চলে, নাটক পাঠের দ্বারা তা লাভ করা সম্ভব নয়। শ্রোতা বা দর্শকের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলতে পারে নাটকের অভিনয়, অপরিচিত জগৎকেও তখন এক ধরনের বিস্ময়বোধের মধ্য দিয়ে একান্ত পরিচিত বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয়, যে জগতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড়, যে প্রাত্যহিক জীবনধারার সঙ্গে আমরা ওৎপ্রোতভাবে জড়িত, মঞ্চে সে-জগৎ ও জীবনধারার রূপায়ণ আমাদেরকে বিস্ময়ে অভি-ভূত করে—আমরা তার সুখ-দুঃখের ছবি দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি, কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খণ্ডবিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো তখন একটা সামগ্রিক রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নাট্যকার চরিত্রকে যতটা বাস্তবতা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন তার সংগে তখন যুক্ত হয় অভিনেতার অন্তরংগতা। নাট্যকার ও অভিনেতা—এই দুইয়ের অন্তরংগ অনুভূতির সংমিশ্রণে তখন নাটকীয় রূপ সৃষ্টি নতুন মহিমা লাভ করে। বিচ্ছিন্ন ঘটনারাজির সংগতি স্থাপনের মধ্যে যে ঘটনাবর্তের সূচনা তা নাটকের কাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করে রাখে। কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে

সংহত সম্পর্ক স্থাপন করেও সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যাবার মধ্যে নানা ঘটনার অবতারণা ; কিন্তু এ-সত্ত্বেও এই কেন্দ্রীয় ঐক্যই নাটককে মূর্ত হতে সহায়তা করে। কেন্দ্রীয় ঐক্য না থাকলে নাটক যে শুধু শিথিল গঠনই হবে তাই নয় ; নাটকের চরিত্রানুসারে—এই বিশেষ শিল্পরীতির সুষ্ঠু বিকাশও সম্ভব হবে না। মঞ্চাভিনয়ের সময় নাটকের সংলাপ তার লিখিতরূপেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তখন তা রক্তমাংসের অবয়ব লাভ করে অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীর কণ্ঠনিঃসৃত সংলাপ তখন তাদের জীবন-চেতনার পরিচায়ক বলেই মনে হয়। এ কথা মনে করবার তখন কোন সংগত কারণই থাকে না যে, এই সংলাপের পিছনে একটি ব্যক্তিমানসি-কতার স্পর্শ রয়েছে। সার্থক অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকের চরিত্র যদি যথাযথরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে তখন সে চরিত্রগুলোকে শুধু নাটকের কাহিনীরই নয়, নাটকের সামগ্রিকতার অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচনা করতে দর্শকের মন বা চেতনা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না। কিন্তু ঘটনা বা চরিত্রের এই বিকাশ নির্ভর করে প্রধানত নাট্যকারের রচনা-শক্তির ওপর ; কারণ, অভিনেতা-অভিনেত্রী যত শক্তিশালীই হোন না কেন, চরিত্রগুলো যদি নাট্যকারের হাতে properly treated না হয় তা হলে তা যথার্থরূপে বিকশিত হতে পারে না। কারণ এতো খুবই জানা কথা যে, নাটকের সার্থকতা নির্ভর করে কাহিনী নির্বাচন, চরিত্র রূপায়ণ ও সংলাপ সৃষ্টির দক্ষতার ওপর। সংলাপ যথার্থ না হলে নাটকের কাহিনী-বিন্যাস সম্ভবপর নয়, কারণ সংলাপের মধ্য দিয়ে যদি চরিত্রের বিকাশ না ঘটে তা হলে নাটকের কাহিনী কতকগুলো ঘটনার বিনিস্থি-তেই পর্যবসিত হতে বাধ্য। তখন একথা স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, নাট্যকার একটি কাহিনীরই অবতারণা করেছেন মাত্র, কাহি-নীটিকে নাটকোচিত গুণে গুণান্বিত করে তুলতে পারেননি।

চরিত্রের যথার্থতা নাটকের একটি বিশেষ গুণ, কারণ, নাটকে সংলাপ ও ঘটনাসংস্থানে স্বাভাবিকতা যেমন আবশ্যক, তেমনি আবশ্যক নাটকোচিত পরিবেশ সৃষ্টির। প্রসংগত স্মরণীয় যে, নাট্যসংলাপে ভাবালুতা নাটকের মৌলিক চরিত্রকেই ক্ষুণ্ণ করে, কারণ সংলাপে নাট্য-কার যদি তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনাকে চরিত্রের মুখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চান, তা হলে সে-চরিত্র নাটকানুগ না হয়ে অনেকটাই কৃত্রিম হয়ে পড়ে

এবং নাটকেও অবাস্তবতার অনুপ্রবেশ ঘটে। সংলাপে ঘরোয়া স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হলে অনেক সময় তা নাটক সৃষ্টির অন্তরায় হিসাবেই বিবেচিত হয়। নাটকে মানব-জীবনের নানা গতিধারা ও মানবীয় প্রবৃত্তি-সমূহের সংঘর্ষ প্রধানত ঘটনা-আশ্রয়ী হয়ে প্রকাশিত হয়। কাহিনী ও পরিবেশ অনুযায়ী না হয়ে চরিত্র যদি প্রধানত নাট্যকারের নিজস্ব দৃষ্টি-ভংগির আলোকে উদ্‌ভাসিত হয় তা হলে তাতে ভাব-প্রবণতা প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। সে-ক্ষেত্রে নাটকের চরিত্রের যে উত্থান-পতন তা সংঘটিত না হয়ে চরিত্রগুলোর একহারা কিংবা অবিভাজ্যরূপ পরিগ্রহ করার সম্ভাবনাই থেকে যায়। অন্যান্য শিল্পকর্ম থেকে নাটকের পার্থক্য সম্ভবত এইখানে যে, গল্পে বা উপন্যাসে চরিত্রগুলো রূপ লাভ করে লেখকের বর্ণনা বা চরিত্রগুলোর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু নাটকে চরিত্রের বিকাশ ঘটে action বা সংঘাতের মধ্যে দিয়ে।

নাটকের এই সাধারণ শর্তগুলো কাব্যনাটকেও পালনীয়। কারণ, কাব্যনাটকের সংলাপ কবিতায় রচিত হলেও মূলত তা নাটক। সংলাপের এই স্বাতন্ত্র্যকে মেনে নিয়েই কাব্যনাটকের শিল্পোৎকর্ষ নির্ণয়ে ব্রতী হওয়া উচিত। কাব্যনাটক বস্তুত কাব্য ও নাটকের সমন্বয় হলেও আসলে তা নাটক এবং এ-কারণেই কাব্যধর্মিতার প্রাধান্য নাটকের চরিত্রসৃষ্টিতে অনেক সময় ভাবালুতার প্রশ্রয় দেয়, এর ফলে কাব্যনাটক কখনো কখনো দৃশ্যকাব্যের মর্যাদা হারায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, কাব্য-নাটকের আংগিকের সংগে গদ্যে রচিত নাটকের আংগিকের যে পার্থক্য তা হচ্ছে প্রধানত সংলাপের ভাষার এবং চরিত্রের বাচনভংগীর। কারণ গদ্যে রচিত নাটকের চরিত্র যেভাবে কথা বলে, পদ্যে রচিত নাটকে চরিত্রের বাচনভঙ্গী তার চাইতে একটু স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র এই কারণে যে, কবিতার ভাষায় কথা বলাটা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত নয়। কবিতায় কথা বলার ব্যাপারটি অভিনয়ের সময় কৃত্রিম মনে না হলেও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নাটকীয় বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ অভিনয়কালে যে নাটকীয় ভ্রান্তির মধ্যে দর্শক তার সত্তাকে জড়িয়ে নেয়, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় তা সম্ভব নয়। মঞ্চে কাব্যনাটকে চরিত্রও দর্শক বা শ্রোতার মনকে স্পর্শ করে, দর্শক তাকে বাস্তব বলে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করে না। এমন কি নাটকটি যদি

দক্ষ হাতে রচিত হয় তা'হলে সংলাপের এই পার্থক্যের ব্যাপারটি শ্রোতার মনে খুব কমই রেখাপাত করবার কথা। সুতরাং এ থেকে স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া চলে যে, নাটকের চরিত্রগুলো কবিতায় কিংবা গদ্যে যে—ভাষায়ই কথা বলুক না কেন, তাদের চরিত্রের বিকাশের জন্যে ভাষা আসলে কোন বাধাই নয়। নাট্যকার যদি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হন এবং মানবচরিত্রের জটিল ও দুর্জ্ঞেয় রহস্য যদি তিনি উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হন তা হলে সে নাটক মানুষের মনকে অবশ্যই স্পর্শ করতে বাধ্য। কাব্যনাটক প্রসঙ্গে ভাবালুতার প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে, কারণ কবিতার ভাষা সাধারণত একটু উদ্দীপ্ত কল্পনা ও আর্দ্র ভাবালুতার ভাষা---সে ভাবালুতার সঙ্গে জড়িত এক ধরনের ইঙ্গিতময়তা। এ-কারণেই গদ্যে রচিত নাটকের ক্ষেত্রে ভাবালুতার প্রশ্নটি যত সহজে মনে না জাগে কবিতায় রচিত নাটকের প্রসংগে তা তত সহজেই মনে উঁকি দেয়। সম্ভবত তখন কবিতা সম্পর্কে মানুষের চেতনায় যে বিশেষ শিল্পরীতির পরিচয়টি উপ্ত হয়ে আছে, তা-ই জেগে ওঠে। কিন্তু পদ্যে বা গদ্যে—যে মাধ্যমেই রচিত হয়ে থাকুক না কেন, নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শকের চেতনাকে জাগ্রত করে তাকে আনন্দ দান। সাধারণ নাট্য-উপভোগের আনন্দ থেকে কাব্য-পাঠের আনন্দ যে যে-কোন অর্থেই স্বতন্ত্র তা অবশ্য উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না, কারণ কাব্যপাঠ শুধু আমাদের চেতনাকেই জাগ্রত করে না, ইন্দ্রিয়ানুভূতির উদ্দীপনের সাথে সাথে কল্পনাশক্তিকেও অবাধ করে দেয়। কিন্তু কাব্যনাটকে শুধু আমাদের চেতনাই উচচকিত হয়, দৃশ্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন অনুভূতির যে রূপান্তর ঘটে তা মূলত নাটকীয় ভ্রান্তিকে মেনে নিয়েই, কিন্তু কাব্যপাঠে যে নিমগ্নতার আনন্দ পাওয়া সম্ভব তা কাব্যনাটকে—অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়টের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে যে-কোন ঘটনাই কাব্যে বর্ণিত হবার উপযোগী নয়, কারণ নাটকীয় সংঘাত যখন চূড়ান্তে পৌঁছে যায় তখনই মাত্র তা কবিতায় প্রকাশিত হতে পারে। কারণ কবিতা হচ্ছে আবেগ-প্রকাশের ভাষা। কিন্তু নাটকে সর্বত্রই যদি আবেগ-প্রবণতা রূপ পায় তা হলে নাটকের চরিত্র মূর্ত হতে পারে না এবং তখন এলিয়ট কথিত Remoteness নাটকের ভাষায় ও চরিত্রে ছায়াবিস্তার করতে বাধ্য। কাব্যনাটকের ভাষা প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি কবিতার আঙ্গিকে রূপায়িত হতে গিয়ে তা কিছুটা কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। কারণ কবিতাকে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ঘরোয়া পরিবেশের উপযোগী করে নিলেও কবিতার নিজস্ব ভংগী এবং স্বতন্ত্র চেহারাকে পরিবর্তিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। মঞ্চে যখন নাটকের বিভিন্ন চরিত্র সাজানো-গোছানো কথা বলে তখন তার ভাষা নিরেট গদ্য হলেও তা আমাদের কিছুটা অনাত্মীয় মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু নাটকীয় ঘটনাবর্তের আকস্মিকতার জন্যে এই অনাত্মীয়তাবোধের ব্যাপারটি আমাদের মনে তেমন রেখাপাতের অবকাশ পায় না। দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে ভাষা বা বাচনভংগী লক্ষ্য করা যায় তার সংগে লিখিত গদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই, পদ্যের তো নেই-ই। সুতরাং মঞ্চে পদ্য-সংলাপের ব্যবহার যেমন কৃত্রিম বলে মনে হয়, তেমনি গদ্যের ব্যবহারকেও অকৃত্রিম বলে মেনে নিতে স্বাভাবিক দ্বিধা জাগে। সে-দ্বিধাও দূর হতে পারে, যদি নাট্যকার চরিত্রের এবং ঘটনা-সংস্থাপনের উপযোগী সংলাপ রচনা করতে সক্ষম হন। গদ্য এবং পদ্য, এই উভয় আংগিকের নাটক সম্পর্কেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য। স্মরণযোগ্য যে চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচিত হলে পদ্যও গদ্যের চেয়ে অনেক বেশী অকৃত্রিম মনে হতে পারে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, চরিত্র-বিকাশের ক্ষেত্রে ভাষা প্রধানতম নয়---অন্যতম সহায়ক মাধ্যম মাত্র। কারণ নাটকের চরিত্র শুধু তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই নয়, সামগ্রিক ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমেই বিকশিতরূপ লাভ করে। সংলাপে তীব্রতা এবং ঘটনা-সংস্থানের উপযোগী চরিত্রের অবতারণা করতে পারলে মঞ্চে কাব্যধর্মী সংলাপও সাধারণ কথাবার্তার মতোই মনে হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে অভিনেতার অভিনয়-দক্ষতা বিশেষ ভূমিকার অধিকারী। খুব কমসংখ্যক লোকই নাট্যাভিনয় উপভোগ করবার সময় পদ্য বা গদ্যসংলাপের পার্থক্য টুকু অনুভব করেন। উল্লেখযোগ্য যে, নাটকীয় ঘটনার আবর্ত কিংবা নাটকীয় সংলাপ দু'টি জিনিস আপাতঃ ভিন্ন মনে হলেও আসলে তা একই রূপসৃষ্টির অংগ। রচনারীতির প্রভাব দর্শকদের ওপর দু'ভাবে বর্তাতে পারে। কিন্তু সে-প্রভাব সম্পর্কে দর্শকমণ্ডলী সচেতন নন, তারা নাটকের কাহিনীর আবর্তেই নিমজ্জিত থাকেন।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, পাঠ্যকবিতার চেয়ে কাব্যনাটকের এক-ঘেঁয়েমি (Monotony) একটু বেশী পরিমাণেই অনুভূত হবার কথা, কারণ পাঠ্যকবিতায় পাঠকের মনকে যে তা শুধু Communication এর মারফতে অভিভূত করে তাই নয়, কবিতার রূপকল্প পাঠকের মনকেও কল্পনা-শক্তির মাধ্যমেই জাগিয়ে তোলে, এবং তাকে ভাবতে শেখায়। কিন্তু মঞ্চে কাব্যনাটক দর্শকের চেতনাকে জাগ্রত করে, তার মনকে উচ্চকিত রাখে; কিন্তু তাকে ভাবতে শেখাবার অবকাশ তার কম। এ-কারণেই সাধারণভাবে গদ্যে রচিত নাটকেও পদ্যসংলাপ কিংবা গানের সংযোজনার মাধ্যমে দর্শক-মনে এক ধরনের Relief বা স্বস্তিবোধ জাগাবার চেষ্টা হয়ে থাকে। কিন্তু এলিয়টের মতে একই নাটকে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণমূলক সংলাপ পরিহার করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ, সংলাপের যে পরিবর্তন তা শ্রোতার মনকে উচ্চকিত করে এবং তার ফলে নাটকের অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবর্তের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়, কারণ তখন শ্রোতা বা দর্শকের তখনও মনোযোগ সেই নাট্যমঞ্চের ওপরই বিশেষভাবে নিবদ্ধ হয়। নাট্যকার যদি শ্রোতার বা দর্শকের মনে মোচড় দিতে চান তা হলে অবশ্য এ জাতীয় সংলাপে নাটকের আকর্ষণীয়তা আরো বৃদ্ধি পাবার কথা। এ-সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, দর্শকের শিক্ষা, রুচি এবং গ্রহণশক্তির ওপর কি ধরনের নাটক জনপ্রিয় এবং উপভোগ্য হবে তা নির্ভর করে। আগেই বলা হয়েছে কাব্যপাঠকের আনন্দটুকু সাধারণ অর্থেই একটু স্বতন্ত্র, কারণ পাঠের মাধ্যমে রসিয়ে রসিয়ে আনন্দ উপভোগের যে-সুযোগ কবিতার নিত্যসঙ্গী, মঞ্চে অভিনেতব্য কাব্যনাটকে সে-রস আহরণ সম্ভব নয়। তখন সংলাপের নামে কাব্যপাঠ এক ধরনের একঘেঁয়েমিতে পরিণত হতে বাধ্য। তখন কাব্যনাটক কবিতার উন্নাসিকতায় পর্যবসিত হওয়াও বিচিত্র নয়। এজন্যেই গদ্যনাটকে পদ্যসংলাপের Relief-এর মতো কাব্যনাটকে ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টির আবশ্যকতা সমধিক। এলিয়টের মতে সমকালীন জীবনের ভিত্তিতে রচিত কাব্যনাটকের পক্ষে এ আবশ্যকতা সম্ভবত সবচেয়ে বেশী। কারণ সমকালীন জীবনের যে বৈচিত্র্যের সংগে দর্শকের পরিচয় তাতে কল্পনার অবকাশ খুবই কম। তখন তা কোন রোমান্সেরই অন্তর্গত নয়, নিজের জীবনেরই অনুসংগী।

যুগ-পরিবর্তনের সংগে সংগে সাহিত্যরীতির স্বাভাবিক পরিবর্তনের

মতোই নাট্যরীতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে নাটক অর্থে যে শিল্পকর্ম মঞ্চস্থ করা হতো তাতে সাহিত্যগুণ ছিল কিনা সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। সে-সব শিল্পকর্মের প্রধানতম লক্ষণ বা উদ্দেশ্য ছিল অভিনয়ের মাধ্যমে অতি দ্রুত দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তবে যথার্থ নাটকে একই সংগে এমন এক শিল্পকর্মের সমন্বয় ঘটে যাতে সুলিখিত শিল্পকর্ম এবং মঞ্চ-সাফল্যের সম্ভাবনা প্রচুর বিদ্যমান। একালে মঞ্চের উপযোগী সাহিত্যসৃষ্টির এবং মঞ্চের আকর্ষণ সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রবল। কিন্তু নানাদিক থেকে বর্তমানকালে মঞ্চোপযোগী রচনা জটিল হয়ে পড়েছে। বর্তমান যুগ জটিল মনোবিকাশের যুগ। সম্ভবত এ-কারণেই একালের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, একালে দর্শক বা শ্রোতারা শুধু নাটক দেখে বা শুনেই পরিতৃপ্ত নয়, তারা সুলিখিত নাটক পড়বার জন্যে সমপরিমাণে উৎসুকও বটে। একারণে পঠিতব্য নাটক অভিনয়ের দিকে তাদের ঝোঁকও প্রবল।

উল্লেখযোগ্য যে, একালের কাব্যনাটকের উদ্ভব খুব বেশী দিনের নয়। শেক্সপীয়রের নাটক কবিতায় রচিত; শেক্সপীয়রের আমলে ইংরেজী সাহিত্যের যে সমৃদ্ধি তাতে পদ্যের প্রাঞ্জলতাই লক্ষণীয়। এলিজাবেথীয় যুগেও নাটকের সংলাপে পদ্যের ব্যবহারই সমধিক। কিন্তু আধুনিককালে গদ্যের সমৃদ্ধির সাথে সাথে নাট্যসংলাপে পদ্যের ব্যবহারোপযোগিতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কাব্যনাটকের সৃষ্টি এবং এর তাৎপর্য বৃদ্ধির ব্যাপারটি নানাদিক থেকেই বিচার করে দেখা যেতে পারে। একথা স্বীকার্য যে, রূপপদ্ধতি এবং বিষয়-বস্তুর দিক থেকে কাব্যনাটক এখনো অপরিণত রয়ে গেছে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা স্তর অতিক্রান্তি চলছে। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে বিশেষ উৎসব উপলক্ষে ইংরেজী কাব্যনাটকের সূচনা হলেও, অদ্যাবধি এর অভিনয় চলছে সীমাবদ্ধ পরিবেশে। গত মহাযুদ্ধে পরবর্তীকাল থেকে ব্যবসায়ী মঞ্চে কিছু কিছু কাব্যনাটকের অভিনয় চলছে বটে, কিন্তু পাঠ্যনাটক হিসাবে কাব্যনাটকের যে বিস্তৃতি সে-তুলনায় কাব্যনাটকের অভিনয় এখনও কোনো সাধারণ রেওয়াজে পরিণত হয়নি। তবে একথা সত্য যে, কাব্যনাটক সাম্প্রতিককালে মঞ্চের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করছে। কাব্যনাটকের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সম্পর্কে এ সত্ত্বেও প্রশ্নের অন্ত নেই।

১৯৬১

যন্ত্র ও শিল্প

আভিধানিক ও নন্দন-তাত্ত্বিক সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের নিরিখে শিল্প-সাহিত্যের মূল্য-বিচারে সব সময় সুফল মেলে না। কেননা, সাহিত্য-শিল্প ব্যক্তি-প্রতিভা, ও ব্যক্তিমানসের অবদান, কোনো যান্ত্রিক-কলা-কৌশলের সৃষ্টি নয়। যদিও এই শিল্পকৃতিতেও বৈজ্ঞানিক-বিন্যাস এবং যান্ত্রিক সূক্ষ্মতার পরিচয় মিলতে পারে। কিন্তু তবুও ব্যক্তিমন এবং ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান বলেই কোনো সুনির্দিষ্ট, সুনির্ধারিত যান্ত্রিক-পরিমাপে শিল্প-সাহিত্যের মূল্যায়ন হতে পারে না। কেননা, শিল্প-সাহিত্য যদিও মোটামুটিভাবে অভিধানিক ও নান্দনিক সংজ্ঞা-নির্ভর, তবুও ব্যক্তি-প্রতিভা এবং ব্যক্তিমনের ধরণ ও গড়ন অনুসারেই এর জন্ম ব'লে যান্ত্রিক সৃষ্টির মতো একে হুবহু ছাঁচে ফেলে পরিমাপ করা চলে না, মূল্যায়ন সম্ভব হয় না। যন্ত্র অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান এবং এক বা একাধিক ব্যক্তির দীর্ঘকালীন সাধনা ও সৃষ্টি-প্রয়াসের ফল। কিন্তু যন্ত্রের কোনো স্বাধীন সৃষ্টি-ক্ষমতা নেই; বৈজ্ঞানিক-নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট পথেই তাকে পরিক্রমা করতে হয়, জন্ম দিয়ে যেতে হয় অবিরাম সৃষ্টির সম্ভার। এবং যান্ত্রিক-উৎপাদন ও সৃষ্টি-সম্ভারে কোনো বৈচিত্র্য কিংবা রূপ-ভিন্নতা আনতে হলে তাতেও বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি-প্রতিভার প্রয়োজন পড়ে এবং তা-ও মানুষেরই সৃজনী ও কল্পনা-প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। যন্ত্রের এই সীমাবদ্ধতার দরুনই যান্ত্রিকসৃষ্টি-সম্ভারের বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা মানুষের সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও ভিন্নতার মত অফুরন্ত এবং অন্তহীন হতে পারে না। এবং এ-কারণেই একটি যন্ত্র তার সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত ছাঁচে একই আদলের সৃষ্টি অনবরত বৈচিত্র্যহীনতভাবে উৎসারিত করে থাকে। এই সৃষ্টির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের জন্য যন্ত্রপাতি ও ছাঁচ বদল অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, প্যাটার্ণ পাল্টাতে হয়; কিন্তু

এই প্যাটার্ণ বদলানো এবং যন্ত্রপাতির পরিবর্তনের ক্ষমতা যন্ত্রের নিজস্ব অধিকারে নেই। এর জন্যেও সৃজন-ক্ষমতা ও কল্পনা-প্রতিভাধর মানুষেরই দরকার, দরকার বৈজ্ঞানিক মনীষা ও কারিগরি-দক্ষতার। অবশ্য এই পরিবর্তনের পরও যন্ত্র পুনরায় আরেকটি প্যাটার্ণে বা ছাঁচে দাঁড়িয়ে যায়, এবং এর সৃষ্টি-ক্ষমতাও সুনির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে পড়ে। যতক্ষণ না আবার যন্ত্রপাতি ও প্যাটার্ণের পরিবর্তন করা হয়। যন্ত্রের এই 'যান্ত্রিক-চারিত্র্যের' দরুনই একটি যন্ত্র একই ধরনের জিনিস অনবরত দীর্ঘকাল ধরে উৎপাদন করে চলে, সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যাওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত।

উৎপাদনশীল যন্ত্রের 'সৃজন-ক্ষমতার' অভাবের দরুনই, এর উৎসারিত সম্ভার কোনো প্রতিভার দান নয়, এতে কল্পনা ও ধ্যান-চিন্তার কোনো বৈচিত্র্যময় রূপ উদ্ভাসিত হয় না। ফলে একই যন্ত্রের একই প্যাটার্নের একাধিক কিংবা অগণিত 'সৃষ্টি'র 'হুবহু' অভিন্ন চেহারা এবং প্রকৃতি মেলে। উৎপাদনের মুহূর্তে যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা যন্ত্র-পরিচালকের কারিগরি-দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সতর্কতার অভাবের দরুন, এক বিশেষ পর্যায়ে হয়তো সৃষ্টি-সম্ভারের অবয়বে 'ত্রুটির-স্বাক্ষর' চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে যা বৈচিত্র্যের না-হলেও ভিন্নতার পরিচায়ক। কিন্তু অনুরূপ 'স্বাক্ষর' ছাড়া যন্ত্রে-উৎপাদিত একই ছাঁচে তৈরী দ্রব্যাদি হুবহু একই আদল ও চেহারা পায়। ফর্মূলা মিলিয়ে যা রচিত হয় তাতে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে আকস্মিক কিংবা অজ্ঞাত ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটলে, বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা আসা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ফর্মূলার নিরিখে এবং ব্যবহারিক উপযোগিতার পরীক্ষায় নির্ণিত হয় যান্ত্রিক-সৃষ্টির মান, কার্যকারিতা ও সাফল্য। এবং ফর্মূলার সৃষ্টি বলেই, এই সাফল্যের ক্ষেত্রে যন্ত্রের অগণিত সৃষ্টি একই মান ও মর্যাদা পায়।

কিন্তু শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তিমনের সৃষ্টি, তার মানসিক-যন্ত্রের উৎসারণ। কিন্তু এই সৃষ্টির প্রক্রিয়া ভিন্ন বলে এর কোন যান্ত্রিক ছাঁচ না-থাকায়, কোনো শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষেই যন্ত্রের মতো অনবরত একই 'সৃষ্টির' উৎসারণ সম্ভব হয় না। তার প্রত্যেকটি রচনাতেই ভিন্ন চারিত্র্য, আদল ও অবয়ব এসে যায়। এমন কি পুনরাবৃত্তির কালেও তার রচনা 'হুবহু' একই জিনিস হয়ে দাঁড়ায় না। এর কারণ, শিল্পী-সাহিত্যিকও রচনাকর্মে এক ধরনের ফর্মূলা, আঙ্গিক ও রীতিভঙ্গী অনুসরণ

করেন, কিন্তু তার সৃষ্টিশীল-মনের স্বাধীনতা অবাধ হওয়ার দরুন, এই অনুসরণ সত্ত্বেও, বৈজ্ঞানিক কিংবা কারিগর-নির্দিষ্ট যন্ত্রের মতো নিছক অনুসরণ হয়ে দাঁড়ায় না, দাঁড়াতে পারে না। এবং এ কারণেই 'সৃষ্টিশীল' প্রতিভা আভিধানিক ও নন্দন-শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় নির্ভর রেখেও, তাঁর সৃষ্টির রাজ্যে ও নিজস্ব ভুবনে অবাধে বিহার করে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়। তার প্রত্যেকটি 'রচনা' এবং সৃষ্টিই যেহেতু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চারিত্র্য, আদল ও অবয়ব পায়, সে-কারণে নিজস্ব ভুবন-বিহারী শিল্পীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষর চিহ্নিত হয় প্রত্যেকটিতে। যদিও সৃজনক্ষমতা ও প্রতিভার তারতম্য অনুসারে সেই 'স্বাতন্ত্র্য' এবং মানের ভিন্নতা ঘটতে পারে। অধিক প্রতিভাবান ও সৃজনীক্ষমতাসম্পন্ন লেখক-শিল্পীর রচনায় 'স্বাতন্ত্র্য' ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রায় প্রত্যেকটি সৃষ্টিতে'ই থাকা সম্ভব। এমনকি কম প্রতিভাধর ও সৃজনশক্তির অধি-কারী লেখক-শিল্পীর রচনাতেও, অমন স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য না থাকা সত্ত্বেও, প্রত্যেকটি'ই কোনো না কোনো দিক থেকে আলাদা---একটি আরেকটির হুবহু অনুকরণ, অনুরূপ বা প্রতিরূপ নয়।

এমন হয় না এই জন্য যে, লেখক-শিল্পীরা অনুভূতিশীল মানুষ, আবেগ ও অনুপ্রেরণা তাদের সহজাত। লেখক-শিল্পী বলে নয়, মানুষ এবং সজীব প্রাণের অধিকারী বলেই তারা অনুভূতিশীল, আবেগপ্রবণ, অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। যারা লেখক-শিল্পী নন, লিখে কিছু প্রকাশ করবার ঐন্দ্রজালিক-ক্ষমতা যাদের নেই, তাদেরও অনুভূতি, আবেগ ও অনুপ্রেরণা থাকে। পার্থক্য শুধু তারা সেই আবেগ-অনুভূতি ও অনুপ্রেরণাকে অন্যের মনে সঞ্চারিত করে দেবার মতো ভাষায় ও আকর্ষণীয় রীতি-ভঙ্গীতে প্রকাশরূপ দিতে পারেন না। সন্দেহ নেই যে, সব মানুষেরই একই রকম আবেগ, অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা থাকে না, এবং সে-কার-ণেই সব লেখক-শিল্পীরও আবেগ, অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা এক ও অভিন্ন-রূপ নয়, অভিন্নরূপ নয় তাদের প্রকাশের ভাষা এবং রীতিভঙ্গীও। লেখক-শিল্পীর আবেগ অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে এবং এই প্রকাশের বেদনা বা আর্তি আবেগ-অনুপ্রেরণার মতোই সহজাত। সহজাত বলেই কোনো লেখক-শিল্পীর পক্ষেই তার আবেগ-অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার এবং স্বপ্ন-কল্পনার উৎসারণ অর্থাৎ 'লিখিত রূপে' ধরে

রাখার ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখা সম্ভব হয় না। এই অন্তর্গত তাগিদই তাকে প্রকাশের ভাষা জোগায়, আঙ্গিক ও রূপরীতি অনুসরণে প্রেরণা দেয়। একঅর্থে ভাষা ও রীতিভঙ্গীর হাতে বন্দী বলেই, লেখক-শিল্পীকেও তার আবেগ অনুভূতি ও অনুপ্রেরণাকে পরিশুদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত করে নিতে হয়, যেমন খুশী তেমনভাবে আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। যেহেতু লেখকের আত্মপ্রকাশের অবলম্বন তার ভাষা, এবং এই ভাষাও একান্তরূপে তার ব্যক্তিগত কিংবা নিজস্ব আবিষ্কার নয়, সচল সামাজিক-জীবন থেকেই আহরিত, সে-কারণে ভাষার ব্যবহার ও প্রতিটি উচ্চারণে সামাজিক ও পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণও অলক্ষ্যেই তার ওপর আরোপিত হয়ে যায়। লেখকের আত্মকাশের ক্ষেত্রে সমাজ ও ভাষা পাশাপাশি একই সঙ্গে এই নিয়ন্ত্রণধারা অব্যাহত রাখে। লেখক যতই অভিধান-নিষ্ঠ হোন না কেন, ভাষার-ব্যবহারে তাকে সচল সামাজিক জীবনের দিকে ফিরে তাকাতেই হয়, কেননা, তার উদ্দেশ্য তো শুধু নিজেকে প্রকাশ করা নয়, রচনার মাধ্যমে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত এবং সংক্রমিত হয়ে যাওয়াও।

তাই লেখকের পক্ষে কেবল অভিধান-নিষ্ঠ হয়ে থাকা চলে না, মৃত ভাষায় কথা বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সচল সামাজিক জীবনের ভাষা লেখককে একদিক থেকে যেমন সহায়তা করে তেমনি অন্যদিক থেকে অনেকটা বন্দী-দশায়ও ফেলে; অন্ততঃ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। সচল সামাজিক জীবন লেখককে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ করে তোলে, এবং এই প্রতিক্রিয়াই তিনি কখনো প্রত্যক্ষভাবে কিংবা কখনো পরোক্ষভাবে শিল্পকৌশলে ভাষা দেন, তার পাঠকের মনে সেই প্রতিক্রিয়ার সঞ্চারণ ঘটাতে চান। পাঠককেও করে তুলতে চান প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ। কিন্তু লেখকের অর্থাৎ সাহিত্যিক-শিল্পীর অমন উদ্দেশ্য সব সময় উচ্চারিত থাকে না, কেননা, সৃষ্টির মুহূর্তে কোনো লেখকই অবশ্য এই মনে করে লেখনী ধরেন না যে, তার রচনাকর্মটি দিয়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে, এবং হবেই। বরং লেখার মুহূর্তে প্রকাশের তাগিদটাই মূলতঃ কাজ করে, যদিও প্রকাশের পর তা দিয়ে নানা উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে। কিন্তু লেখক যত প্রকাশোন্মুখ এবং প্রতিক্রিয়া-প্রবণ হোন না কেন, সৃষ্টির মুহূর্তে তিনিও এক-ধরনের নিয়ন্ত্রণের অধীন অর্থাৎ তাকেও সমাজের নিয়ন্ত্রণ, ভাষার নিয়ন্ত্রণ, আংগিক ও রূপরীতির নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে হয়। এবং হয় বলেই তিনি যেমন খুশী তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করতে

পারেন না। কিন্তু তবুও লেখক সজীব প্রাণসত্তার অধিকারী, আবেগ ও অনুভূতি-প্রবণ বলে এই সব নিয়ন্ত্রণ ভাঙতে চান, ভেঙে বেরিয়ে আসতে চান অবাধ মুক্তির রাজ্যে। তাই সৃজনকর্মে তার 'মেশিনের মতো' নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট ছকে যান্ত্রিক কলা-কৌশলে এক ও অভিন্নভাবে কাজ করা সম্ভব হয় না, সম্ভব হয় না অফুরন্তভাবে একই জিনিসের উৎসারণ। এবং এ কারনেই লেখক-শিল্পী নানা উপজীব্য আহরণ করেন, ভাষা ও রীতিভংগী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হন। এমনকি এ-ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে আভিধানিক ও নন্দনশাস্ত্রীয় সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লংঘন করেও, স্বাতন্ত্র্যের সাধনায় উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন।

এই অনুপ্রেরণা এবং 'স্বতন্ত্র হয়ে উঠার সাধনা' না থাকলে সৃষ্টির রাজ্যে কোনো বৈচিত্র্য আনয়ন সম্ভব হতো না, লেখক-শিল্পীরা হয়ে যেতেন 'শিল্পী' এই বিশেষ পরিচিতি থেকেই খারিজ। সন্দেহ নেই, লেখক-শিল্পীরাও সৃষ্টি কাজে কোনো-না-কোনো 'মডেল' অনুসরণ করেন। বিশেষতঃ পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগত তাদের সৃজনকাজে মডেল হিসাবে কাজ করে। সমাজ-সংসার থেকে, চারিপাশের প্রকৃতি থেকে তারা সৃজনী কাজে অনুপ্রেরণা ও আদর্শের আদল গ্রহণ করেন, সৃষ্টির ছাঁচ খুঁজে পান। কিন্তু এই—মডেল আদর্শের আদল কিংবা ছাঁচ নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকেন না, নিজের কল্পনা-প্রতিভার স্পর্শে তাকে প্রাণবান, সজীব ও ঐন্দ্রজালিকভাবে আকর্ষণীয় করে তোলেন। এবং এ-কারণেই পরিচিত জীবন ও জগত, পারিপার্শ্বিক-প্রকৃতি তাদের সৃষ্টকর্মে এমন অচেনা ও আবিষ্কারে মহিমামণ্ডিত হয়ে ওঠে। লেখক-শিল্পী—যিনি প্রকৃতই সৃজনধর্মী এবং ক্ষমতাধর, তিনি কখনো নিছক ফটোগ্রাফিক চিত্রায়নে খুশী থাকেন না। তিনি বাস্তবনিষ্ঠ হয়েও বাস্তবাতিরিক্ত দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে চান। ক্যামেরা বাস্তবের অতিনিষ্ঠ রূপকার; কেননা, ক্যামেরার নিজস্ব কোনো সৃজনীক্ষমতা নেই, যদিও ক্যামেরা যিনি চালনা করেন তার দৃষ্টি ও পরিচালন-দক্ষতা এবং সৃষ্টিধর্মী আকাংখা ক্যামেরার বাস্তবনিষ্ঠ ছবিকেও বৈচিত্র্যময়, আকর্ষণীয় ও ঐন্দ্রজালিক করে তুলতে পারে। প্রত্যেক মানুষের মনও ব্যাপক অর্থে একটি ক্যামেরা-বিশেষ।

প্রতি মুহূর্তেই জীবন-জগত ও পারিপার্শ্বিকের ছবি তাতে ধরা পড়ছে: যে দৃশ্য দেখা যায়, এবং যে দৃশ্য দেখা যায় না, অথচ হৃদয়

দিয়ে অনুভব করা যায়—এর সব কিছুই বন্দী হচ্ছে মনের ক্যামেরায়। কিন্তু সাধারণ ক্যামেরার মতোই, মানুষের মনের এই ক্যামেরার ছবি সবাই সমান কৌশলে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। এ-ব্যাপারে যার দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ বেশী, তার হাতেই ছবি তত জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। বাস্তব-জীবনের ছবিও ক্যামেরার কারসাজিতে (অর্থাৎ ক্যামেরাম্যানের দক্ষতায়) ভিন্ন ভিন্ন ক্যামেরায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ পায়। নিতান্ত ফটোগ্রাফিক হয়েও তা বাস্তবাতিরিক্ত মহিমা অর্জন করে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টি ও মনের ক্যামেরা যেহেতু যান্ত্রিক-ক্যামেরার মতো নির্দিষ্ট, স্থির ও নিবদ্ধ নয়, বরং সদা অনুভূতিপ্রবণ ও চঞ্চল, সে-কারণে এর প্রতিফলন এবং রূপায়ণ-ক্ষমতা অন্তহীন। বিশেষতঃ এই ক্যামেরার অধিকারী যদি হন কোনো কল্পনা ও সৃজনী প্রতিভাধর ব্যক্তি, তা হলে সে সম্ভাবনার কোনো সীমা-পরিসীমা থাকে না। সৃজনী-প্রতিভাধর মানুষের দৃষ্টিতে ও মনে জন্মগত-ভাবে সংস্থাপিত ক্যামেরায় বাস্তবের যে-ছবি প্রতিনিয়ত ধরা পড়ে, তাই তার নিজস্ব কৌশলে বন্দী হয়ে যায়, এবং পরিস্ফুটন-দক্ষতার গুণে আশ্চর্য ও অপরূপ হয়ে রূপ পায়। বস্তুতঃ এই 'ধরে' রাখা এবং 'ফুটিয়ে' তোলার যে দক্ষতা, তাকেই বলা যেতে পারে লেখক-শিল্পীর সৃজনক্ষমতা।

সাহিত্য-শিল্পে উপজীব্য-বিশেষতঃ কোনো বক্তব্য বিষয় প্রধান নয়, প্রধান তার শিল্পরূপ, অর্থাৎ শিল্পরূপায়ণ। যদিও উপজীব্য কিংবা বিষয়নিরপেক্ষ কোনো শিল্পরূপায়ণ সম্ভব হতে পারে না ; কেননা, বিশে-ষজ্ঞদের মতে, ভাব ছাড়া রূপের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। রূপ আছে অথচ ভাব নেই, সৃষ্টির-জগতে এমন ব্যাপার অসম্ভব। তবে, সেই ভাব বা উপজীব্য অস্পষ্ট, অনচ্ছ, জটিল কিংবা দুর্জ্ঞেয় হতে পারে। এবং লেখক-শিল্পীর সৃজন-ক্ষমতা অর্থাৎ উপজীব্য বা বক্তব্যবিষয়কে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতার ওপরই নির্ভরশীল তা কতখানি অস্পষ্ট, অনচ্ছ, জটিল কিংবা দুর্জ্ঞেয় হবে ; রচনার শিল্পরূপ কিভাবে নির্মিত হবে। শুধু সৃজনক্ষমতা নয়, লেখক-শিল্পীর মানস-গড়ন ও নিয়ন্ত্রণ নির্ধারণ করে উপজীব্য এবং প্রকাশের রূপরীতি। এ-কারণেই একই বিষয়বস্তু ভিন্ন ভিন্ন লেখ-কের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ পায়, এবং সব বিষয়বস্তুও সকলের রচনায় উপ-জীব্যে পরিণত হয় না। এমন কি একান্তরূপে বাস্তবনিষ্ঠ লেখকের রচ-নায়ও বাস্তবের শিল্পরূপায়ণ ঘটে তার দেখা, প্রকাশ এবং বিন্যাসের

স্বাতন্ত্র্য অনুসারে, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে। এই প্রকাশের ক্ষেত্রে রচনার আভিধানিক সংজ্ঞা, নন্দনতাত্ত্বিক অভিধা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তিনি কখনও হুবহু অনুসরণ করেন না, তার সৃজনক্ষমতার স্পর্শে তা এমন এক স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে যা একান্তরূপে কোনো 'সংজ্ঞা'র দ্বারা পরিমাপ করা কিংবা মূল্যায়ণের মতো নয়। কেননা, কোনো শিল্পের সংজ্ঞা নন্দন-শাস্ত্রে কিংবা অভিধানে যে-ভাবে নির্ধারিত থাকে, সৃষ্টির কাজ ঠিক হুবহু সে-ভাবে চলে না, কেননা, সৃজনের মুহূর্তে কোনো স্রষ্টাই নন্দন-শাস্ত্র অথবা অভিধান নিয়ে বসেন না, তিনি পরিচালিত হন তার অধীত জ্ঞান ধারণা ও শিক্ষা নিয়ে। এবং এই জ্ঞান, ধারণা ও শিক্ষাই তাকে সৃজনের মুহূর্তে নিয়ন্ত্রিত করে বলেই তার প্রকাশের স্বাধীনতাও ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু তবুও এই নিয়ন্ত্রণ 'শিল্পের নিয়ন্ত্রণ' বলেই, স্বেচ্ছাচার ও যথেচ্ছা-বিহার বন্ধ হয়ে গিয়ে সেখানে আরোপিত হয় এক ধরনের 'সংযম'—যা শিল্পের উৎসারণেরই সহায়ক। প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক-শিল্পী এই নিয়ন্ত্রণের অধীন বটে, কিন্তু তার ভাবনার রাজ্যে তার নিজস্ব ভুবনে তিনি একেবারেই স্বাধীন। এবং এই অবাধ স্বাধীনতার অধিকারী বলেই, তার ভাবনা কল্পনার উৎসারণ ও 'শিল্পরূপায়ণ' ঘটাতে গিয়েও, তিনি প্রচলিতের নিয়ম-নিগড় ভাঙতে চান, অভিধান ও নন্দন-শাস্ত্রে নির্ধারিত সংজ্ঞা কিংবা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হুবহু অনুসরণ না করে, হয়ে ওঠেন নতুনত্ব এবং স্বাতন্ত্রের সন্ধানী। কিন্তু ভাবনা-কল্পনার রাজ্যে লেখক-শিল্পীরা যতখানি স্বাধীন ও যথেচ্ছাবিহারী, প্রকাশের ক্ষেত্রে ততখানি হতে পারেন না, কেননা, প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের সামাজিক, ভাষাগত ও অন্যান্য কারণে অনেকটা প্রথাগতভাবে এবং ঐতিহ্য-অনুসারেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যেতে হয়, কখনো-কখনো বা নিজের অলক্ষ্যেই। এবং এই নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধে-উঠার ব্যাপারে, লেখক শিল্পীকে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করে তার ব্যক্তি-প্রতিভা। প্রতিভাধর লেখক-শিল্পীরাই পারেন প্রচলিতকে অনুসরণ করে, আবার প্রচলিতকেই অস্বীকার করে, নতুন রূপরীতির প্রচলনে সার্থকতার পরিচয় দিতে।

লেখক-শিল্পীর এই স্বাধীনতা ও সৃজনক্ষমতা থাকে বলেই তাদের রচনা প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র হয়ে যায়, একজন লেখক-শিল্পী ও আরেকজন লেখক শিল্পী থেকে ভিন্ন হয়ে যান। তাই তাদের হাতে সৃজিত অজস্র

রচনার মধ্যেও সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন রূপ মেলে না, প্রত্যেকটি রচনাই ভিন্ন ভিন্ন চেহারা পায়। বিধাতার অজস্র সৃষ্টির মধ্যে যেমন প্রত্যেক-টিই ভিন্ন ও স্বতন্ত্র, তেমনি লেখক-শিল্পীর সৃষ্টিতেও তা-ই। এজন্যই লেখক-শিল্পীরাও 'দ্বিতীয়-স্রষ্টা'। বিধাতার সৃষ্টিশালায় 'প্যাটার্ন'-এর কমতি নেই, তা অজস্র ও অফুরন্ত, এবং প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ। অনু-রূপভাবে লেখক-শিল্পীর সৃজনশালায়ও রয়েছে অজস্র ও অফুরন্ত 'প্যাটার্ন— প্রত্যেকটিই ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র। লেখক-শিল্পীরা যন্ত্র নন, এবং তাঁদের সৃষ্টিও নয় নিছক যন্ত্র-উৎসারিত অভিন্ন 'ছাঁচে' তৈরী; তাদের রচনা শিল্প বলেই এই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য।

কবি ও পাঠক

কবির সৃজনশক্তির স্পর্শ ও পাঠকের রসবোধ—এই দুইয়ে মিলেই কাব্যপাঠের আনন্দ। কবির যে কল্পনা ও অভিজ্ঞতা সৃজনশীলতায় কাব্য-রূপ লাভ করে, পাঠক তা থেকেই তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার—স্বাদ আহরণ করে; এ-ক্ষেত্রে কবি ও পাঠকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। কিন্তু পাঠক কবিকে প্রত্যক্ষরূপে পায় না, তাঁর রচনার সামগ্রিক অবয়বে কবির ব্যক্তিসত্তাটিকে অন্বেষণ করে। নিজের সৃষ্টিতে যে-কবি যত বেশী প্রতিফলিত হন, পাঠকের কাছেও তিনি তত ঘনিষ্ঠভাবেই ধরা দেন। কবির চিন্তা, অনুচিন্তা, ধ্যানধারণা ও ভাবানুভূতি রচনার দেহে নানাভাবে ও ভঙ্গীতে ছড়িয়ে থাকে; ক্ষেত্রবিশেষে তা ঋজু, জটিল ও অস্পষ্ট। এ কারণেই নানা কুহেলিকার আবরণ ভেদ ক'রে বহু-ভঙ্গিম কলাকৌশলের পথ ডিঙ্গিয়ে তবেই কবিমানসের সাক্ষাৎ পেতে হয়। এই সাক্ষাতের কাজটি অনেক সময় শক্তিমান কবি নিজেই সহজতর ক'রে তোলেন; অর্থাৎ তাঁর রচনায় তিনি এমন একটি অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার ছাপ রেখে দেন যা' পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। এই আকর্ষণে ধরা দিয়েই পাঠক কাব্যপাঠে ব্রতী হয় এবং কবিতার জটিল পথ অতিক্রম করে। কিন্তু কবি ও পাঠকের মানসিকতার ভিন্নধর্মিতা অনেকক্ষেত্রেই যথার্থ কাব্যপাঠ ও রসগ্রহণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, কবি হয়তো তাঁর রচনায় এমন একটি প্রচ্ছন্ন কুহেলিকা সৃষ্টিতে আনন্দ পান, যা' পাঠকের চোখে ধূসরতম বলেই মনে হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া থেকেই পাঠক আর তাঁর রচনার নতুন দিগন্ত অন্বেষণে ব্রতী হয় না। কাব্য-পাঠে পাঠকের এই বীতস্পৃহা সৃষ্টির মূলেও অনেক সময় কবির নিজস্ব ভূমিকা কম নয়—অর্থাৎ কবি তাঁর রচনায় সময় সময় এমন কিছু বাকভঙ্গীর অবতারণা করেন, যা পাঠকের বোধ কিংবা রসগ্রাহ্য নয়। এ বাকভঙ্গীর অবতারণা কবির কাছে হয়তো

তাঁর রচনার উৎকর্ষের প্রতীক, কিন্তু পাঠকের কাছে জটিলতার নিদর্শন। এই অপরিচ্ছন্ন জটিলতা কবির রচনায় নানাভাবেই প্রকাশ পেতে পারে; কখনো অপরিণত চিন্তার আবরণে, কখনো বা নবতর আঙ্গিকের কলা-কৌশলে। দুরূহ আঙ্গিকের ব্যুহভেদ ক'রে কবিমনের অন্তঃশীলা প্রেরণার নিকটবর্তী হতে যতটুকু অধ্যয়ননিষ্ঠা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের পক্ষে তা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু জটিল চিন্তার গ্রন্থি-উন্মোচনে পাঠক কেবল তখনই ব্রতী হতে পারে যখন কবির সৃষ্টি কোনো নতুন দিগন্তের ইশারা দেয়। উৎসের নিকটবর্তী হতে অনেক ক্ষেত্রেই চড়াই-উৎরাই অতিক্রমণের আবশ্যকতা অনিবার্য, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আনন্দপ্রাপ্তির নিশ্চয়তাই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আনন্দপ্রাপ্তির এই নিশ্চয়তা সত্যিকার কবির রচনায় বিধৃত। সামগ্রিক কবিতায় যে স্বজনশীলতার বিধৃতি তা হয়তো পাঠকের পক্ষে প্রাথমিক পঠন-পাঠনে অনুভব করা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু একটি সত্যিকার শক্তিশালী কবিসত্তার সাক্ষাৎ লাভ অসম্ভব নয়। কারণ কবিতার দেহে কবিমানসের পরিচয়-চিহ্ন অবশ্যই বিধৃত হয়ে থাকে।

কবির কল্পনা ও অভিজ্ঞতা থেকেই কাব্যের জন্ম; সে-অভিজ্ঞতা কবির মনে নানা প্রক্রিয়ার পরিণতি লাভ করে এবং একটি বিশেষ চেতন-মুহূর্তে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ-কারণেই কোনো কোনো ব্যতিব্যস্ত মুহূর্তে কিংবা গুঞ্জনমুখর পরিবেশেও কবির হাত থেকে মহৎ কবিতার জন্ম-লাভ সম্ভব। কবির এই অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে সঞ্চিত হয় না, কারণ অভিজ্ঞতার ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষের একার জিনিস, কাব্যক্ষেত্রে শ্রেণীগত অভিজ্ঞতার তেমন কোন মূল্য নেই: এ-কারণেই তা ব্যক্তিমনের গঠন অনুসারেই সৃষ্টিকর্মে অবয়ব লাভ করে। বৈজ্ঞানিক তাঁর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতার পেছনেই যুক্তির সমর্থন খোঁজেন এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের মধ্যেই সেই অভিজ্ঞতার মূল্য যাচাই করে থাকেন। কিন্তু কবির কাছে অভিজ্ঞতার ব্যাপারটি ভিন্নরূপে উপস্থিত হয়, অর্থাৎ কবি অভিজ্ঞতার পেছনে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কিংবা যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের সমর্থন খোঁজেন না বরং কবিতার মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতাকেই নতুন রূপে রূপায়িত করেন। এই নবরূপায়ণ-প্রচেষ্টায় কবির স্বজনীশক্তির ভূমিকায়ই সমধিক—অভিজ্ঞতাটি ভিত্তিভূমির কাজ করে মাত্র।

কবির সৃষ্টিতে তাঁর ব্যক্তিসত্তার যথার্থ প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই অনেক সময় তাঁর শিল্পকর্মের উৎকর্ষ নিরূপিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ কবির রচনায় যদি তাঁর ব্যক্তিত্বটি অনায়াসে প্রকাশের মাধ্যমে বর্তমান থাকে এবং পাঠকের কাছে তাঁর রূপ ভাস্বররূপে প্রতিফলিত হয়, তবেই তাঁকে সার্থকতম কবি বলা যেতে পারে। সত্যিকার ব্যক্তিত্ব যাঁর চরিত্রের মধ্যে প্রস্ফুটিত তাঁর সৃষ্টিতেও যে সে-ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছন্ন ছায়া লক্ষ্য করা যাবে, তাতে আর বিচিত্র কি! ব্যক্তিমনের ভাবানুভূতিই যখন সৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা, তখন সেই অনুভূতির প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তাটি যদি মাথা উঁচিয়ে না উঠতে পারে তা হ'লে অনুভূতির সার্থক প্রকাশ সম্ভব নয়। পরিবেশ ও বিশ্বচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে মহৎ শিল্পের বিকাশ ঘটে থাকলেও আসলে তা ব্যক্তিমনের লালনভূমিতেই পরিপুষ্ট। ব্যক্তি-মনের পরিপুষ্টি ঘটে তাঁর পরিবেশ, বংশগত উত্তরাধিকার, অধীত বিদ্যার অবদান ও সহজাত প্রতিভার বলে। এই গুণাবলী যাঁর মনে একটি নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় ও ক্রিয়া-পদ্ধতিতে পরিবর্ধিত, তাঁর মননশীলতাও তত বেশী তীক্ষ্ম। আর মননশীলতা যে ব্যক্তিত্বকে প্রখর করে তোলে তা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়। সে-কারণেই আবেগপ্রবণ কবির রচনায় ব্যক্তিত্ব যত বেশী বিস্তারী, মননশীল কবির রচনায় তা তত বেশী প্রখর। মননশীলতার সাথে বিশুদ্ধ আবেগের সংমিশ্রণ যেখানে ঘটেছে, শিল্পীর সৃষ্টি সেখানেই হয়েছে তত বেশী সজীব। কারণ মননের সাথে সীমিত আবেগের সমন্বয় না ঘটলে সৃষ্টি চিন্তা-দ্যোতক হয় বটে, বুদ্ধিগ্রাহ্য আবেদনও তার থাকতে পারে, কিন্তু সে-রচনা হৃদয়-গ্রাহী হয় না। এবং পাঠককে তা উল্লসিতও করে না। বলা বাহুল্য, এ উল্লাস, হাল্কা আবেগের কিংবা তারল্যমিশ্রিত উত্তেজনার উল্লাস নয়, বরং বলা যেতে পারে সৃষ্টির উদ্ভাসিত দীপ্তি। এই দীপ্তিই পাঠককে রচনার স্বাদ গ্রহণের জটিলতম পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এবং উপলব্ধির আনন্দ দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, যে-কোন শিল্পকর্ম, তা জীবনের সাথে যত ঘনিষ্ঠভাবেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, অনেকাংশেই কৃত্রিম। শিল্পে জীবন যত ঘনিষ্ঠভাবেই রূপায়িত হোক তা কোন কালেই বাস্তব জীবনের প্রতিরূপ নয়, কারণ শিল্প-সৃষ্টির পথটি জীবনের চেয়ে ভিন্ন যদিও জীবনঘনিষ্ঠতা তার একটি মহৎ গুণ। জীবনের খণ্ড-বিচ্ছিন্ন

ঘটনা, নানা টুকরো ছবি ও ভাবানুষঙ্গকে শিল্পায়িত করতে গিয়ে শিল্পী নানা মাধ্যমের অনুসরণ করেন। সে-ক্ষেত্রে জীবনকে রূপায়িত করার চেয়েও শিল্পসৃষ্টির তাগিদই তিনি বেশী অনুভব করে থাকেন। এ-কারণেই তাঁকে নানা কৃত্রিম পথের অনুসন্ধানী হতে হয়। এই কৃত্রিমতা যেমন শিল্পসৃষ্টির সহায়ক তেমনি প্রতিবন্ধকও। প্রতিবন্ধক এই কারণে যে, জীবনের ফটোগ্রাফিক প্রতিফলন যদি শিল্পের চাহিদা পূরণ করতে পারতো তা হলে শিল্পীর সৃষ্টির কাজটি যেমন সহজতর হতো, তেমনি পাঠকের রসগ্রহণও সহজসাধ্য হতো। যেহেতু ফটোগ্রাফী পুরোপুরি সৃজনধর্মী শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত নয়, সে-কারণেই শিল্পীকে নানা মাধ্যমের অন্বেষী হতে হয়েছে। এই অন্বেষার একমাত্র লক্ষ্য জীবনেব নানা উপাদানকে, প্রকৃতির অফুরন্ত প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য-সুষমাকে নতুন মহিমায় উপস্থাপিত করা। এই উপস্থাপন-প্রক্রিয়ায় শিল্পীরা ভিন্নধর্মী কিন্তু মূলতঃ একই লক্ষ্যের অভিসারী। এই লক্ষ্যে পোঁছার কাজে শিল্পীর উদ্ভাবনী-শক্তি সবচেয়ে বেশী সহায়ক; বস্তুতঃ এ-ক্ষমতাই হচ্ছে শিল্পীর সৃজনক্ষমতা। এ সৃজনক্ষমতাই তাকে গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে চলতে উদ্বুদ্ধ করে, নতুন সৃষ্টির কাজে অনুপ্রেরণা দেয় এবং সৃষ্টিকর্মকে মহত্তর মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। আর্টের যে-কোন শাখার স্রষ্টা সম্পর্কেই এ-উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য।

সত্যিকার কবির মূল লক্ষ্য সৃজনশক্তির চূড়ান্ত বিকাশ সাধন। কবিমানস ও প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্রে নানা স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন কবির সৃজনশক্তি একটি ধারাবাহিক পদ্ধতিতে বিকশিত হয়, আবার কারো কারো বিকাশে লক্ষ্য করা যায় আকস্মিকতার চমক। সমকালীন পাঠকের চোখে এ-আকস্মিকতা বিস্ময়ের সৃষ্টি করে, পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করে তোলে। আবার কারো কারো বিস্ময়কর আবির্ভাব শুধু ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েই থাকে, সমকালীন পাঠকের মনে কোনরূপ স্থায়ী রেখাপাতে সক্ষম হয় না। এর কারণ হয়তো এই যে, কবির সৃষ্টিক্ষমতার মতো পাঠকের রসগ্রহণ ক্ষমতারও একটি ধারাবাহিক বিকাশ আছে। এই ধারাবাহিকতার নানা স্তরে যেসব শিল্পী তাদের মনে রসের যোগান দেন, পাঠস্পৃহা পরিতৃপ্ত করেন, অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সাথে পাঠক-সম্প্রদায়ের একটা নৈকট্যের

সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ কারণেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বহু জটিল স্তরেও তাদের প্রচেষ্টা পাঠকের চোখে নতুনত্বের চমক নিয়ে ধরা দেয় না। কাব্যপাঠের একটা অভ্যস্ত রুচিকেই পরিতৃপ্ত করে মাত্র।

সাহিত্য-শিল্পের প্রবহমান ধারায় অভ্যস্ত পাঠকের কাছে ধারাবাহিকতা-বিচ্ছিন্ন অগ্রগতি তেমন আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয় না ; এ কারণেই অনেক সময় কোনো কোনো স্রষ্টার নতুন সৃষ্টি-প্রচেষ্টা অবহেলার বস্তুতে পরিণত হয়, এবং এ-অবহেলা অনেকক্ষেত্রে কালে কবি-মানসের অপমৃত্যুর কারণ হয়েও দাঁড়ায়। কিন্তু শক্তিমান শিল্পী পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন—পাঠকের রুচির মোড় পরিবর্তনই এ-সংগ্রামের লক্ষ্য। পাঠকের মনকে টেনে নেবার শক্তি নিয়ে যাঁর আবির্ভাব, কেবলমাত্র তেমন শক্তিমান কবির পক্ষেই এ সংগ্রামে উত্তরণ সম্ভব। স্বল্পশক্তিমান কবি স্বাভাবিকভাবেই নতুনত্বের সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হন, কারণ পাঠকের প্রবহমান রুচিকে পরিতৃপ্ত করার শক্তি ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা তাঁর অধিকারে নেই।

কবি যেমন তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে এবং ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যান, অনেকক্ষেত্রেই পাঠক তাঁর সমতালে পদক্ষেপ করতে পারে না, ফলে কবি ও পাঠকের মধ্যে একটি বড় রকমের বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়, ঠিক তেমনি পাঠকমনও ধীরে ধীরেই উন্নত রুচির অধিকারী হয়। এই রুচি ও রসবোধের পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তন, শক্তিমান সাহিত্যস্রষ্টার আবির্ভাব ও উন্নতমানের সাহিত্যের সংস্পর্শ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কবি-মানসের আকস্মিক বিকাশ সহজেই পাঠকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে, ফলে কবির এ-জাতীয় প্রচেষ্টা আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায় ; কিন্তু পাঠক-রুচির পরিবর্তন এতটা আকস্মিকভাবে সংঘটিত না হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ কবিমানসের বিকাশ একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু পাঠকরুচির পরিবর্তন একটি সামগ্রিক সামাজিক ঘটনা। সমাজ-মানসের সামগ্রিক উন্নতি না হলে এ পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে না। সাহিত্য পাঠের ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণ ও নেশা পাঠকের রুচিকে উন্নত ও তীক্ষ্ণ করে এবং এই উন্নতরুচির আকর্ষণ ও প্রেরণা থেকেই পাঠক জটিলতম রচনারও গভীরে প্রবেশ ক'রে রসাস্বাদনের চেষ্টা করে থাকে। পাঠকের মধ্যে সাধারণভাবে যখন পাঠ-

স্পৃহা প্রবল হয়ে ওঠে তখন সাহিত্যস্রষ্টার সৃষ্টিপ্রেরণাও উদ্বেল হয়ে ওঠার আকর্ষণ অনুভব করে, কারণস্রষ্টার সৃষ্টি-প্রেরণা থেকে শিল্পের জন্ম হয়ে থাকলেও তা সমঝদারের সমাদরের অপেক্ষা রাখে। পাঠকের অবহেলা স্রষ্টার মনে শুধু হতাশা ও বেদনাবোধই জাগ্রত করে না, অধিকন্তু সৃষ্টির তাগিদকেও স্তিমিত করে দেয়। পাঠকের জন্যে নয়, নিজের তৃপ্তির জন্যেই সৃষ্টি—এমন একদেশদর্শী চেতনা কোনো শিল্পীকেই সৃষ্টির ক্ষেত্রে খুব বেশী সহায়তা করে না। রচনার আঙ্গিক যতই জটিল ও দুরূহ হোক না কেন, তাতে যদি মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার স্পর্শ থাকে তবে তা একদিন পাঠকের রসপিপাসাকে অবশ্যই চরিতার্থ করবে এবং সে-পথেই তার শিল্পবিচারে উত্তরণ ঘটবে।

কবিতার মতো সূক্ষ্ম ও ভাবানুভূতিময় শিল্পের পক্ষে সব সময়েই পাঠকের সহৃদয় সহযোগিতা ও আনুকূল্য লাভ সম্ভব নাও হতে পারে, কারণ সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন এই শাখাটি যুগে যুগে পাঠক[illegible]র মনে বিচিত্র রসের আবেদন ও গঠনবৈচিত্র্যের আকর্ষণ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, তবে সবসময়েই তার সমাদর সমভাবে হয়নি। পাঠকের মনে রসসঞ্চারের ক্ষমতা সব কবিতারই এক রকম নয়, কারণ কেবলমাত্র সমকালীন সমস্যাকে উপজীব্য ক'রে যে কবিতার সৃষ্টি, পটপরিবর্তনের সাথে সাথে তার আবেদনও হারিয়ে যাওয়া সম্ভব। পাঠকের স্মৃতিতে সে-কবিতার একটা স্থান থাকে বটে, কিন্তু কালক্রমে তাও ইতিহাসের অন্তর্গত হয়। কবিতা যদি কোনো মহৎ জীবন-দর্শন-ভিত্তিক হয় এবং কবির জীবনবোধটি সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত হতে পারে, তবেই মাত্র সমকালীন পাঠকের প্রয়োজন মিটিয়েও কালোত্তীর্ণ হতে পারে—কারণ যে গভীর জীবনবোধ কবিতাটিতে রূপ লাভ করে তা যে কোন্ আঙ্গিক ও বাণীভঙ্গীর মধ্যেই প্রকাশিত হোক না কেন, পাঠকের মনে মহৎ আবেদন নিয়ে উপস্থিত হবেই। পাঠক সর্বযুগেই সাহিত্যে তার সমকালীন সমাজের প্রতিফলন চেয়েছে; এ-কারণেই সমস্যার নানা পরিবর্তনের সাথে সাথে পাঠকের চহিদারও পরিবর্তন ঘটে এবং পরিণামে তা সাহিত্যের রূপবদলকেই প্রভাবিত করে। যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যও এ-কারণেই অনেকটা যুগ-প্রতিনিধি। পাঠকের চাহিদা সর্বযুগেই কিছু পরিমাণে সাহিত্যের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, কিন্তু শক্তিশালী সাহিত্যস্রষ্টার আবির্ভাবেই

কেবলমাত্র সেই গণ্ডীবদ্ধ চেতনা মুক্তির নতুন স্বাদ পেয়েছে এবং সাহিত্য হয়েছে নতুন পথের অভিসারী। পাঠকের রুচি অনুযায়ী বাঁধাধরা পথ-পরিক্রমার অনিচ্ছাই যুগে যুগে শক্তিমান কবিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জটিল পথে ব্রতী করেছে। কারণ পুরানো এবং গণ্ডীবদ্ধ কাব্যপরিমণ্ডলে আটকে না থেকে সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করাই যে তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু এমন কবির আবির্ভাব কোনকালেই খুব একটা সাধারণ ঘটনা নয়। প্রবহমান কাব্যধারায় যে পলিমাটি সঞ্চিত হতে থাকে তাই হয়তো একদিন নতুনের আবির্ভাবকে সহজতর করে এবং কালক্রমে তাতে নতুন ফসলের স্পন্দন শোনা যায়। শক্তিমান কবির কাব্য-সাধনা পাঠককে তাঁর রচনার উৎকর্ষ ও প্রাচুর্যের মধ্যে দিয়েই সংগঠিত করে তোলে, কারণ উৎকৃষ্ট রচনার আকর্ষণে ধরা দেওয়া পাঠকের পক্ষেও একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। যুগবদলের সাথে সাথে কবি ও পাঠকের মধ্যে যে সাময়িক বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় তা সময়ের অগ্রগতির ফলে ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে। শক্তিমান কবি তাঁর রচনায় কেবল যুগের বাণীকেই রূপায়িত করেন না, অনাগত যুগের প্রতিধ্বনিও তাঁর কণ্ঠেই শোনা যায়, এ-কারণেই কবি তাঁর রচনায় ভবিষ্যতের যে আভাস দেন, তা-ই পাঠক-মনকে তৈরী করে তোলে। সমসাময়িককাল ও অতীতের সমস্ত মোহাচ্ছন্নতার প্রভাব তখন ধীরে ধীরে ওপর থেকে নিঃশেষিত হয়ে যেতে থাকে এবং তখনই মাত্র সে নিজের অনগ্রসরতার সামগ্রিক রূপটি উপলব্ধি করতে পারে। এ-উপলব্ধি থেকেই কবি ও পাঠকের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয় এবং কালে তা নৈকট্যের পথই প্রশস্ত করে দেয়।

১৯৬০

বাংলা কাব্যে বিদ্রোহের সুর

শিল্প-সাহিত্যে প্রধানতঃ দু'ভাবে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়ে থাকে। এক, উপজীব্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ; দুই, আঙ্গিকের বিবর্তনের ধারায়। কিন্তু যেহেতু বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ও অঙ্গাঙ্গী, সে কারণে শিল্প রচনার ক্ষেত্রে উপজীব্য নির্বাচনের ব্যাপারে যেমন নতুন বোধ ও মানস চেতনা কাজ করে, তেমনি এই উভয়বিধ সচেতনতা শিল্পীকে নতুন আঙ্গিকের অনুসন্ধানে অনুপ্রেরণা জোগায়। বাংলাকাব্যের বিবর্তনের ইতিহাসেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বিভিন্ন যুগে কাব্যরচয়িতাদের নতুন বোধ ও জীবনচেতনা শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাদেরকে নতুন আঙ্গিকের অনুসন্ধানে ব্রতী করেছে। কাব্য আঙ্গিকের সাথে কাব্যভাষার সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন, কবিরা আঙ্গিক এবং ভাষা—এই উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করেছেন। উল্লেখনীয় যে বাংলা কবিতার সুপ্রাচীন ইতিহাসে উপজীব্য, কাব্য আঙ্গিক এবং কাব্যভাষা পরিবর্তনের যে পরিচয়চিহ্ন যুগে যুগে স্বাক্ষরিত হয়েছে তার মূলে কাজ করেছে যুগ-সচেতন, নতুন বোধে উদ্বুদ্ধ এবং পরিবর্তন-প্রয়াসী কবিদের ব্যক্তি-প্রতিভা। প্রচলিত অর্থে যাকে বিদ্রোহের কবিতা কিংবা বিদ্রোহী মানসজাত শিল্পসৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হয়, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তেমন কবি এবং কাব্য-শিল্পের পরিচয় খুব বেশী একটা মেলে না। উল্লেখযোগ্য যে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে কবিতায় বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে একমাত্র ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং কাজী নজরুল ইসলাম কারাবরণ করেছিলেন, তাঁদের কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এদিক থেকে এ দু'জনই অনন্যতার দাবীদার।

কিন্তু তবুও বলা চলে যে, বিদ্রোহী মানসচেতনা সেই সুপ্রাচীন কাল

থেকেই বাংলা সাহিত্যের কবিদের মনে অন্তঃস্রোতের মতো প্রবাহিত হয়েছে, তাঁদের অন্তঃসত্তায় সক্ষ্মভাবে কাজ করেছে। শুধু বাংলা কবিতায় নয়, যে কোন দেশের কবিতাতেই লক্ষণীয় বিষয় যা, তা হলো এই যে, দীর্ঘকালের প্রবহমান ও প্রচলিত কাব্যধারায় অনুবর্তনের মধ্য দিয়ে উপজীব্যের এবং সেই সংগে আঙ্গিকের গতানুগতিক অনুসরণ যখন প্রায় নিয়তির মতো নির্ধারিত হয়ে যায়, তখনই এক বা একাধিক ব্যক্তি-প্রতিভা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করে। এই বিদ্রোহের দরুনই কবিতার উপজীব্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে এর আঙ্গিক এবং ভাষা-রীতিরও পরিবর্তন ঘটে, আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে বলতে গেলে এ সত্যও উচচারণ করতে হয় যে, শুধু কাব্যের উপজীব্য আঙ্গিক কিংবা ভাষারীতির ক্ষেত্রেই উল্লিখিত বিদ্রোহী চেতনা সীমাবদ্ধ থাকে না, তা উপমা-উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্পের জগতেও সম্প্রসারিত হয়। কবির ব্যক্তি-প্রতিভা এই বিদ্রোহী প্রবণতা ও চেতনার মূলে কাজ করলেও সামগ্রিক সমাজসত্তার পরিবর্তন, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের ভাঙ্গা গড়া, বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার তরঙ্গাভিঘাত এবং বিপ্লব-উপবিপ্লব কবির উচচারণে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু দৈশিক নয়, আন্তর্জাতিক জীবনস্রোত এবং তার পরিবর্তমান ধারাও এই বিদ্রোহী চেতনা ও সুরে তরঙ্গায়িত। বাংলা কবিতায় বিভিন্ন যুগে এই সুরই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

সমাজ প্রতিনিধি ও সমাজসত্তার প্রতীক হিসেবে যেমন কবিরা তাঁদের সংবেদনশীল মনের ফসল যে-কবিতা তাতে বিদ্রোহী সুরের অনুরণন জাগান, তেমনি পরিবর্তমান সমাজচেতনাও কবিদের চিন্তারাজ্যে ও মনো-ভূমিতে পরিবর্তনের স্পন্দন জাগিয়ে থাকে। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও এই উভয় রীতি ও ধারা কাজ করেছে। বিদ্রোহী মানসচেতনাসম্পন্ন কবিরা যেমন গতানুগতিক ধারার আগল ভেঙ্গে পরিবর্তনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি নতুন সমাজমানসও কবিদের স্থবির চিন্তারাজ্যে আলোড়ন-বিলো-ড়ন জাগিয়েছে। দেবদেবী-প্রভাবিত মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে মানব-সত্তার উদ্বোধন বস্তুতঃ কবিদের বিদ্রোহী চেতনারই ফলশ্রুতি। কবিদের নতুন ধ্যান-ধারণা ও নতুন চিন্তারীতি এর মূলে কাজ করলেও বস্তুতঃ মানবিক উদার অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল অনেকখানি বিদেশী ভাবধারা এবং

চিন্তারীতির তরংগাভিঘাতে। এ সত্য অনস্বীকার্য যে, বহিরাগত সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শেই বাংলা কাব্যের বিবর্তন ও গতিবেগ সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন বাংলা কাব্যে বৌদ্ধধর্ম ও সাংস্কৃতিক প্রভাব যে বিশিষ্ট চেহারার জন্ম দিয়েছিল তাতে পরিবর্তনের সূচনা সম্ভব হয়েছে বহিরাগত সংস্কৃতির সংস্পর্শের কল্যাণেই, শুধু সংস্পর্শই নয় সংঘর্ষও এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। মধ্যযুগে ইসলাম ধর্ম ও পারসিক সংস্কৃতির, এবং আধুনিক যুগে ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এবং সংঘর্ষে না এলে হয়তো বাংলাকাব্যের অমন মুক্তি সম্ভব ছিল না। ধর্মকেন্দ্রিক মধ্যযুগের বাংলা কাব্য শুধু বিষয় ও উপাদানগত দিক থেকেই সীমাবদ্ধতার শিকার ছিল না, রচনার আঙ্গিক এবং ভাষার দিক থেকেও তা ছিল গতানুগতিকতার শিকার। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই একদিন নতুন মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের কন্ঠে ধ্বনিত হল : সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' দেব-নির্ভর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এভাবেই একদিন বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছিল। আর এরই ফলশ্রুতি মানবসত্তার প্রতিষ্ঠা। উল্লেখনীয় যে, মুসলমান কবিরাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম মানবসত্তার প্রতিষ্ঠা ঘটান। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্য, চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অপেক্ষা প্রাচীন কিনা সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা এই যে, 'ইউসুফ জুলেখা'তেই সর্বপ্রথম মর্ত্যের মানুষের অর্থাৎ নরনারীর প্রেমকাহিনী বিধৃত হয়, দেবনির্ভর সাহিত্যে এ নিশ্চিতরূপেই বিদ্রোহী চেতনার ফসল।

এই মানবীয় বিশ্বাস এবং বিদ্রোহী চেতনাই বাংলা কাব্যের প্রথম আধুনিক রূপকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় ভিন্ন সুরের জন্ম দিয়েছে, মধুসূদন মধ্যযুগের আধ্যাত্মিকতা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মানসকেই কাব্যের উপজীব্য করে তুললেন, যদিও ঘটনা সংগ্রহের জন্যে তাঁকে রামায়ণের কাছেই যেতে হয়েছে। নবযুগের ধর্ম হিসেবে পৌরাণিক কাহিনীকে অবশ্য মধুসূদন নতুনরূপে উপস্থিত করেছেন, রাবণকে Grand Fellow হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টিকর্মে রাম-লক্ষ্মণ ম্লান জ্যোতি এবং বিভীষণ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসেবে ঘৃণ্য।" প্রচলিতের বিরুদ্ধে এভাবেই মধুসূদন বিদ্রোহের নিশান তুলে

ধরেছেন। শুধু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নয়, কাব্য আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও মধু-সূদনের বিদ্রোহীচেতনা স্পষ্ট। ভাষা ও ছন্দের অচলায়তন ভেংগে, রূপ-রীতিতে আন্তর্জাতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মহৎ ফলশ্রুতিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্রোহী মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্যকে সর্বপ্রথম প্রাদেশিকতার গণ্ডীমুক্ত করেছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও বিদ্রোহী মধুসূদনের কাব্যেও সাধা-রণ মানুষের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি, তাঁর কাব্যের নায়ক-নায়িকারা সদ্বংশজাত, স্বর্গে-মর্ত্যে তাঁদের অধিষ্ঠান। এই বিচারে রবীন্দ্রনাথেই ব্যাপক এবং গভীর অর্থে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের লক্ষণ। প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত মানসের রূপকার রবীন্দ্রনাথ এই পরিমণ্ডলেই তাঁর আধ্যাত্মিক ও মানবিক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, চেতনার নানা সূক্ষ্ম কারুকাজে বাংলা কাব্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও মহিমাময় করে তুলেছেন। উদার মানসচেতনায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ নানা কুসংস্কারের আগল ভেংগে কাব্য আংগিকের ও কাব্যভাষার পরিবর্তন সাধন করে নানা রূপরীতিতে মানবমুক্তির বাণীই উচচারণ করেছেন। মানুষের বিচিত্র অনুভূতির রূপকার হলেও রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ ব্যক্তিহৃদয়ের বহুভঙ্গিম প্রকাশরূপের দিকেই ঝুকেছেন। মধুসূদনে যে ব্যক্তিসত্তার বিজয় ঘোষিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথে তা ব্যক্তিহৃদয়ের বিচিত্র প্রকাশে বৈচিত্র্য-ময় হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ মধ্যবিত্তমানসের রূপকার হওয়ার দরুন, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, বেদনা-বিষাদ এবং সংগ্রামী চেতনা রবীন্দ্রকাব্যে তেমন স্বাক্ষরিত নয়; রবীন্দ্রনাথে বিদ্রোহের সুরও এক অর্থে দূরশ্রুত। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ নিজেই উচচারণ করে-ছিলেন, 'আমার কবিতা জানি আমি, গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।'

রবীন্দ্র-যুগের কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মানবিকতা ও মানুষে মানুষে সাম্যের গান গেয়েছেন, নিপীড়িতের সপক্ষে বাণী উচচারণ করেছেন। দঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্তেও চাপা বিদ্রোহ, ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয়েছে; কিন্তু এঁদের রচনায় ঠিক বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়নি, যা নজরুলে বলিষ্ঠভাবে উচচারিত। রবীন্দ্র-রোমাণ্টিকতার বিরুদ্ধে ত্রিশের কবিরা একদা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, এই বিদ্রোহের মূলে ছিল সর্বগ্রাসী রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব এড়িয়ে নতুন রূপ ও রীতিতে মানুষের জীবন ও জটিলতার, তার দুঃখ-বেদনার কাব্য রূপায়ণের মহতী ইচ্ছা।

ত্রিশের কবিদের এই বিদ্রোহী চেতনার দরুন বাংলা কবিতার এলাকা ব্যাপ্ত হয়েছে, তার ঐশ্চর্য-ভাণ্ডার হয়েছে অধিকতর পূর্ণ। প্রধাণতঃ মধ্যবিত্ত মানস এবং আধুনিক জীবন জটিলতার রূপকার কবিরা সাধারণ মানুষের এবং তাদের সুখ-দুঃখ, বেদনা বিষাদ ও সংগ্রামী চেতনার খুব একটা রূপায়ণ ঘটাননি। রাজনৈতিক দর্শন ও অর্থনৈতিক মুক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও প্রধানতঃ নাগরিক মানসের অধিকারী হওয়ার দরুন বৃহত্তর জনমানসের সাথে তাদের বিদ্রোহী চেতনার রাখিবন্ধন ঘটেনি। উল্লেখনীয় যে, তাঁদের কাব্য আঙ্গিকের এবং কবিভাষার দুরতিক্রম্যতাও এর জন্য দায়ী। কবিতায় দৈনন্দিন জীবনের এবং প্রাত্যাহক আলাপা-চারিতার ভাষা ব্যবহার করেও এই বাধা দূর করা সম্ভব হয়নি। অথচ রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে—রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী'র নিশান উড়িয়ে এসে তার বিপ্লবাত্মক কবিতা-গানের মাধ্যমে বৃহত্তর জন-মানসের কবি হিসেবে তাদের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিলেন। সাধারণ মানু-ষের জীবনের রূপকার এই কবি ধ্বনিত করে তুললেন বিদ্রোহের জ্বালাময়ী সুরকে। মাটির কাছাকাছি যে কবির জন্যে রবীন্দ্রনাথ কান পেতেছিলেন, পরবর্তীকালে সুকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে যেন তাঁর আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেল। তাই তিনি উচচারণ করলেন: 'বিদ্রোহ আজ, বিপ্লব চারিদিকে।' তাঁর কণ্ঠেও নজরুলের মতোই ধ্বনিত হলো ভাঙ্গার গান: কঠিন, কঠোর বিন্ধ্যাচল/অনেক ধৈর্যে আজো অটল/ভাঙো বিঘ্নকে করো শিকল পদাহত।

বস্তুত, বাংলা কাব্যে যুগে যুগে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হলেও নজরুল এবং সুকান্তের কবিতাতেই তা স্পষ্ট ভাষায়—কোনরূপ শিল্পের আড়াল না রেখে, অসংশয়ে উচ্চারিত। নজরুলানুসারী এবং সুকান্তের ধারাবাহী কবিদের রচনায়ও নানারূপে-নানাভাষায় এই বিদ্রোহী সুরই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

মধুসূদন : প্রথম আধুনিক

নতুন চিন্তা ও জীবনচেতনার রূপকার কবি তাঁর শিল্পসাধনার স্তরে স্তরে বাণীবহনের উপযোগী ভাষা ও আঙ্গিক নির্মাণ করে নেন। এই নির্মাণের কাজটি কবিপ্রতিভার স্তর, স্বাধর্ম্য ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে নানাভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে ; কাব্য-ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণে, স্বদেশীয় কাব্যরীতির বৈশিষ্ট্যের আদলে অনেকটা প্রথাগতরীতিতে যেমন এই নির্মাণের কাজ ক্রম-অগ্রসর হয়, তেমনি আবার বিদ্রোহীচেতনা ও বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন প্রতিভাধর কবির ব্যক্তি-প্রতিভার কল্যাণে এই নির্মাণের কাজটি প্রায় রাতারাতিও সম্পন্ন হয়ে যায়। যদিও এর পেছনে থাকে দীর্ঘদিনের মানস-প্রস্তুতি।

বাংলা কাব্যে নতুন জীবনচেতনা ও বোধের শিল্পরূপ নির্মাণের প্রয়োজনেই বিভিন্ন সময়ে প্রতিভাধর কবিরা বাণীবহনের উপযোগী ভাষা এবং আঙ্গিকের অন্বেষী হয়েছেন ; এই অন্বেষার পেছনে কবিদের ব্যক্তি-প্রতিভা যেমন কাজ করেছে তেমনি বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শও বিশেষ অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। এই সংস্পর্শের কল্যাণেই তাঁদের চেতনার বন্ধন-মুক্তি ঘটেছে, সত্তার দিগন্ত হয়েছে দূর-বিস্তৃত। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে কবিভাবনার যে রূপান্তর ও পরিবর্তন তার মূলে কবিদের ব্যক্তি-প্রতিভার অবদানের সাথে সাথে বিদেশী-সাহিত্যের সংস্পর্শের ভূমিকাও বর্তমান। দেবদেবী-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে মানবসত্তার উদ্বোধন এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা ; বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাবে যে, এর মূলে অনুপ্রেরণা, নতুন জীবনচেতনা ও বোধ জুগিয়েছে বিদেশী সাহিত্যপাঠের আনন্দময় অভিজ্ঞতা। সাহিত্য-শিল্পের পারস্পরিক প্রভাব এভাবেই মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত এবং ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে।

বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার দিকে তাকালে যে-দুটি তাৎপর্যময় ঘটনা নজরে পড়ে তা হলো, পারসিক সংস্কৃতির সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে মধ্যযুগের বাংলা কাব্য যে-মুক্তির পথ পেয়েছিল, ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষে আধুনিককালে অনুরূপ মুক্তির পথটিই ভিন্নরূপে উন্মোচিত হয়েছে। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে এই দুইটি সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের কল্যাণে বাংলা কাব্য বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হবার অধিকার ও প্রাণশক্তি অর্জন করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই বিকাশ, বিবর্তন ও সমৃদ্ধি যে বিদেশী ও বহিরাগত সংস্কৃতির কল্যাণেই সম্ভব হয়েছিল তা ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে বর্তমান বিশ্ব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং কল্যাণ-চিন্তাকে ধারণ করে নিতে সক্ষম হয়েছে তার মূলেও রয়েছে এই ঐতিহাসিক অবদানের ভূমিকা।

বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রভাব শুধু ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক দিকটিও গড়ে তোলে; অবশ্য এর মূলে কাজ করে আত্ম-প্রত্যয়শীল প্রতিভাধর কবি ও সাহিত্য-শিল্পীদের ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান। এই প্রতিভাধরেরা ঋণকেই পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করে নিজস্ব সাহিত্য সংস্কৃতির ভাণ্ডার ঐশ্বর্যপূর্ণ করে তোলে। ইংরেজী ভাষায় কাব্য-রচনার মহত্তর সুযোগ-সুবিধার কথা বলতে গিয়ে টি. এস. এলিয়ট বলেছেন যে, বিভিন্ন ভাষা ও উৎস থেকে প্রাণশক্তি আহরণ করে ইংরেজী ভাষা তার প্রকাশ-ক্ষমতা বহুগুণে বাড়িয়ে নিয়েছে। এই উক্তির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, ইংরেজী ভাষার ব্যাপক প্রকাশ-ক্ষমতার মূলে রয়েছে: দি ভ্যারাইটি অব দি এলিমেন্টস অব হুইচ ইংলিশ ইজ ম্যাইড আপ। ইংরেজী ভাষায় সমন্বিত এই বিচিত্র উপাদানের পরিচয়-দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, এর ভিত্তি-ভূমিতে রয়েছে জার্মান ভাষার প্রভাব। স্ক্যাণ্ডেনেভীয় এবং নর্মান ফ্র্যান্সের উপাদানও এর মধ্যে সমন্বিত হয়েছে। এছাড়াও আছে ল্যাটিনের ব্যাপক প্রভাব। ইংরেজী ভাষার ওপর শুধু উল্লিখিত ভাষাসমূহের 'ভাষাগত' প্রভাবই পরিলক্ষিত নয়। ইংরেজী এদের শব্দ-সম্ভার, বাকরীতি, ছন্দ ও প্রকরণ-কৌশল ইত্যাদি সবকিছুকেই আত্মসাৎ করেছে এবং এভাবেই নিজস্ব প্রকাশ-ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে।

টি. এস. এলিয়েটের এই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে যে মধ্যযুগে পারসিক সংস্কৃতি এবং আধুনিক যুগে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শুধু উপাদানগত দিক থেকেই সুসমৃদ্ধ হয়নি, ভাষার রূপরীতি এবং প্রকাশ-ক্ষমতার দিক থেকেও বলীয়ান হয়ে উঠেছে। ফারসী ভাষাব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা এর শব্দসম্ভার, বাক-রীতি এবং ছন্দ ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যকে অঙ্গে ধারণ করে নিয়েছে। ফলে বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এর বৈচিত্র্যও হয়ে উঠেছে বহু-ব্যাপ্ত। আধুনিক যুগে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং সমৃদ্ধিব ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। কিন্তু এর মূলে কাজ করেছে বাংলার বহু প্রতিভাধর কবির ব্যক্তি-প্রতিভার অবদান।

শিল্পবেত্তাদের মতে, কাব্যবিবর্তনের ইতিহাস প্রধানতঃ এর ভাষা ও আঙ্গিকেব পরিবর্তনের ইতিহাস। নতুন জীবনানুভূতি এবং মূল্যবোধের বিবর্তন ও উজ্জীবনের বাণীরূপ নির্মাণের প্রয়োজনেই কবি-শিল্পীকে নতুন আঙ্গিক, রূপরীতি ইত্যাদি অনুসরণ অন্বেষণ ও আবিষ্কার করে নিতে হয়; কিন্তু বিষয়বস্তুর নতুনত্ব, মৌলিকত্ব বলে যেমন স্বয়ম্ভু কিছু থাকতে পারে না, তেমনি আঙ্গিক এবং রূপরীতির মৌলিকত্ব বলেও একেবারে স্বয়ম্ভু কিছু থাকা সম্ভব নয়। কাব্যের বিষয়বস্তু, ভাষা, আঙ্গিক এবং রূপরীতি এমন কি উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রেও পারস্পরিক-প্রভাব এ-কারণেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। বাংলাকাব্যে সংস্কৃত ও ফারসী কাব্যের অনুবাদের পথ ধরে যেমন এইসব প্রভাব মুদ্রিত হয়েছে, তেমনি বহু কবির শিল্প-অন্বেষার সৃষ্টিশীল ফলশ্রুতি হিসাবেও তা স্বাক্ষরিত হয়েছে। মধুসূদনের পূর্বসূরী ভারতচন্দ্র কি ঈশ্বরগুপ্ত---এঁদের মধ্যে যে নতুন জীবনচেতনার পরিচয় লক্ষ্যগোচর তা যুগ-সন্ধির ফল হলেও, সাহিত্য শিল্পের পারস্পরিক প্রভাবও এর মূলে কম কার্যকর নয়।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে পূর্ব-যুগ ও আধুনিক যুগেব একটি সমন্বয় প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। এবং এ-কারণেই কেউ কেউ তাঁকে যুগ-সন্ধির কবি বলে থাকেন। কিন্তু যুগের স্বাভাবিক গতিধারায় ভারতচন্দ্রের কবি-মানসে

কিছুটা নতুন প্রয়াসের চিহ্ন দেখা গেলেও, তিনি প্রাচীনধারার অনুবর্তন না করে পারেননি। সংস্কৃত কাব্যরীতির প্রভাব তাঁর ওপর ছায়া বিস্তার করেছিল, কারণ সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল স্বাভাবিক ও সুগভীর। তাঁর কাব্যের শরীরে তা প্রভাবও বিস্তার করেছে। আরবী-ফারসী শব্দসম্ভার এবং ফারসী কাব্যরীতির ঐতিহ্যও যে ভারতচন্দ্রে সুগভীর প্রভাব ফেলেছিল তা-ও স্বীকার্য।

ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী কাব্য-ধারায় দেবদেবীর লীলা-বর্ণনা, অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ নিশ্চিতরূপেই কাব্যশরীরে একটি বিশেষ পরিচিতির লক্ষণ স্পষ্ট করে তুলেছিল। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে মানবীয় প্রেম-কাহিনী ও ঐতিহাসিক সত্যের স্পর্শ দীপ্ত হয়ে উঠেছে। এ-প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের মত, 'ভারতচন্দ্রের দেব-দ্বিজে বিশুদ্ধ ভক্তি কোনদিনই ছিল না। তিন যুগসন্ধির কবি, দেবতার মহিমা তাঁহাকে খুব মুগ্ধ করিতে পারে নাই—তাঁহার দৃষ্টি নামিয়া আসিয়াছিল মাটির পৃথিবীতে।'

ভারতচন্দ্রের দেব-দ্বিজে বিশ্বাস ছিল কিনা তা অবশ্য বলা যায় না, তবে তিনি যে কাব্যে মানবীয়তার আমদানী করেছিলেন তাতে যুগ-লক্ষণই প্রকট ছিল। বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, ছন্দবিচারের মাপকাঠিতেও ভারতচন্দ্রের কাব্যে নতুনত্বের অনুসন্ধান করা চলে। উপমা-উৎপেক্ষা এবং যমক-অনুপ্রাসের নির্বাচনেও ভারতচন্দ্র ছিলেন নিঃসন্দেহেই বিশিষ্ট। কিন্তু ভারত-চন্দ্রের কাব্যে কাহিনী-বর্ণনার যে বহু-বিস্তারী প্রচেষ্টা আছে, ভাবানুভূতির ততটা গভীরতা নেই, এ-ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্র সমকালীন পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব অতিক্রম করতে পারেননি। কিন্তু ভারতচন্দ্রের রচনায় বৈষ্ণব গীতিকবিতার আদর্শের প্রভাবও স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, যদিও সংস্কৃতের গুরুগম্ভীর কাব্যরীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। উল্লেখনীয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও মঙ্গলকাব্য এবং উনবিংশ শতাব্দীতেও বৈষ্ণব কবিতা (বিশেষত) আঙ্গিক এবং রূপরীতির দিক থেকে রচিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। বিশেষজ্ঞদের মতে 'ভারতচন্দ্রের চিন্তা-প্রবাহের খাতের মধ্য দিয়েই পরবর্তী শতাব্দীর বিভিন্ন সাহিত্য-প্রতিভার ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যসাধকদের

মনোরাজ্যে ভারতচন্দ্রের প্রভাব বিদ্যমান। মধুসূদন কেবল ভারতচন্দ্রের বাগ্‌বৈদগ্ধ্যই আত্মসাৎ করেন নাই। তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের সঙ্গীতের প্রভাবই সমধিক। ভারতের অনুসরণে রঙ্গলাল ভুজঙ্গ প্রয়াত ও মাল-ঝাঁপ পয়ারে অধিকতর মনঃসংযোগ করেছিলেন তাঁর "কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্যের মণিকা গোয়ালিনী হীরা-মালিনীরই প্রতিবিম্ব।' (ভারতচন্দ্র, শ্রী মদন-মোহন গোস্বামী)।

বাংলা কাব্যপাঠক দীর্ঘদিন দুটি লোকপ্রিয় কাব্যধারায় অবগাহন করে এসেছে। বৈষ্ণব-পদাবলী ও মঙ্গলকাব্য কাব্যরীতির দিক থেকে ভিন্নধর্মী হলেও আবেদনের শক্তিতে পাঠককে প্রায় সমভাবেই আকর্ষণ করেছে। ঈশ্বরগুপ্তের কালের পাঠক কাব্যপাঠের যে অভ্যস্তধারায় উজ্জীবিত ছিল তা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী এবং কবিগান ও পাঁচালীর ধারা। ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব পাঠককে সেই অভ্যস্তধারার প্রতি বিমুখ করে তোলেনি, ঐতিহ্যের সাথে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত নতুন দিকটি পাঠকের মনকে চকিত করে তুলেছিল। কবিওয়ালাদের ঐতিহ্যের সাথে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত থাকলেও ঈশ্বরগুপ্তের রচনার একান্তই সে-ভঙ্গী বা চারিত্র্য ছিল না। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতার ব্যঙ্গধর্মিতার পাশাপাশি তাঁর মনে একটা নিঃসঙ্গ নির্জনতা বোধও ঠাঁই করে নিয়েছিল। তার প্রমাণ মেলে তাঁর বিভিন্ন খণ্ড-কবিতায়। এবং এ কারণেই পাঠক সে-যুগে তার রচনায় কিছুটা নতুন স্বাদের সন্ধান পেয়েছিল।

ঈশ্বরগুপ্ত সমকালীন পাঠকের মর্জির তোয়াক্কা করেছিলেন এবং তাঁর অধিকারে ব্যঙ্গের শাণিত তরবারিও ছিল; এই দুইয়ের সম্মিলনে তিনি লোকপ্রীতি অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় নাগরিকতার স্পর্শ ছিল, যদিও নাগরিক চৈতন্যবোধ ও জীবন-জিজ্ঞাসা ছিল না। কবিওয়ালাদের ঐতিহ্যলালিত হওয়া সত্ত্বেও এই নাগরিকতার স্পর্শই তাঁকে আধুনিকতার দাবীদার করে তুলেছে। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক থেকে যতই আধুনিকতার সমীপবর্তী হোন না কেন, কাব্যের প্রকৃতি-ধর্ম এবং গঠনরূপের বিচারে কিন্তু তাকে যথার্থ আধুনিক বলা যায় না। নবীন সভ্যতার আবির্ভাবকে ঈশ্বরগুপ্ত স্বাগত জানাতে পারেননি, ইউরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাবের ফলে বাঙালীর চরিত্রস্খলন ঘটবে এবং

তা সমাজ জীবনকেই কলুষিত করবে এমন আশংকাই ঈশ্বরগুপ্তের ছিল এবং এ কারণেই তিনি পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিতে পারেননি। ফলে ঐতিহ্যসচেতন ঈশ্বরগুপ্তকে প্রাচীন সাহিত্যের ধারারক্ষীই থেকে যেতে হল, যথার্থঅর্থে আধুনিক তিনি হয়ে ওঠেননি, যদিও আধুনিককাল এবং জীবন থেকে তিনি সমকালীন বিষয় কাব্যের উপজীবী করে নিয়েছিলেন।

অন্যপক্ষে সমকালীন জীবন ও জীবন-সমস্যা থেকে উপজীব্য আহরণ না করেও এবং বিষয়বস্তুর জন্য রামায়ণ মহাভারতে হাত পেতেও মধুসূদন হয়ে উঠলেন আধুনিক বাংলা কাব্যের যুগন্ধর স্রষ্টা। বাংলা কাব্যপাঠক বস্তুতঃ মধুসূদনে এসেই যথার্থ অর্থে অপরিচিত কাব্যরীতির সাক্ষাৎ লাভ করল। মধুসূদন মধ্যযুগের আধ্যাত্মিকতা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসকেই কাব্যের উপজীব্য করে তুললেন, যদিও ঘটনা সংগ্রহের জন্য তাকে রামায়ণের কাছেই যেতে হল। রামায়ণ কাহিনীর 'মহৎ ও স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের ওপর ইলিয়ড কাহিনীর কঠিন ও দৃপ্ত-শৌর্যের রং ফলিয়ে, তিনি মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হলেন; এই প্রয়াসের ফলই 'মেঘনাদবধ কাব্য'। নবযুগের ধর্ম হিসাবে পৌরাণিক কাহিনীকে মধুসূদন নতুন রূপে উপস্থিত করেছেন, 'রাবণকে গ্রাণ্ডফেলো' হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টিকর্মে রাম-লক্ষ্মণ ম্লান জ্যোতি এবং বিভীষণ দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ঘৃণ্য।' এদিক থেকে লক্ষ্য করলে মধুসূদনে নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং সৃষ্টিপ্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। এই নতুন চিন্তা-ভাবনা এবং সৃষ্টিপ্রেরণার বাণীরূপ নির্মাণের প্রয়োজনই তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির সংস্পর্শে গিয়েছেন, সে সবে আকণ্ঠ অবগাহন করেছেন। সৃষ্টিশীল প্রতিভা যে সমস্ত আহরণ ও ঋণকে বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজস্ব সম্পদ এবং ঐশ্বর্যে পরিণত করে, মধুসূদনে আরেকবার তা নতুন করে প্রমাণিত হল। মধুসূদনের পূর্বসূরী ভারতচন্দ্র কি ঈশ্বরগুপ্ত—এঁরা কেউই নবচেতনার বাণী বহনের উপযোগী আঙ্গিক আবিষ্কার কিংবা নির্মাণের সৃষ্টিশীল প্রয়াসে ব্রতী হননি। মধুসূদনে অমিত্রাক্ষর রচনার যে সৃষ্টিধর্মী সাধনা তা শুধু ছন্দ নির্মাণের জন্যেই আত্মনিবেদন নয়, এ প্রয়াস আত্মসত্তার অনিবার্য উৎসারণের জন্যে পথসন্ধানের অন্য নাম। এই পথসন্ধান তিনি পেয়েছিলেন বিদেশী—বিশেষত ইউরোপীয় কাব্যপাঠের

আনন্দময় অভিজ্ঞতা থেকেই। অভিজ্ঞতাই প্রতিভাধর মধুসূদনের মনে অহংকারের জন্ম দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, এই অহংকারের মূলে ছিল পশ্চিম মহাদেশ হতে আহরিত নতুন সাহিত্যরস সম্ভোগের সহজ শক্তি। সেটা বিস্ময়ের বিষয়, কেননা তাদের পূর্বতন সংস্কারের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ছিল। অনেক কাল মনের জমি ঠিকমত চাষের অভাবে ভরা ছিল আগাছায়, কিন্তু তার অন্তরে অন্তরে সফলতার শক্তি ছিল প্রচ্ছন্ন ; তাই কৃষির সূচনা হওয়া মাত্রই সাড়া দিতে সে দেরী করলো না। পূর্বকালের থেকে তাঁর বর্তমান অবস্থার যে প্রভেদ দেখা গেল তা দ্রুত এবং বৃহৎ এই যেমন গদ্যে, পদ্যে তেমনি অসম সাহস প্রকাশ করলেন মধুসূদন। পাশ্চাত্ত্য হোমর-মিলটন রচিত মহাকাব্যসঞ্চারী মন ছিল তাঁর। তার রসে তিনি একান্তভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন বলেই তাঁর ভোগমাত্রেই স্তব্ধ থাকতে পারেননি।--- মধুসূদন সঙ্গীতের দুর্নিবার উৎসাহ ঘোষণা করবার জন্যে আপন ভাষাকেই বক্ষে টেনে নিলেন। যে যন্ত্র ছিল ক্ষীণধ্বনি একতারা তাকে অবজ্ঞা করে ত্যাগ করলেন না, তাতেই তিনি গম্ভীর সুরের নানা তার চড়িয়ে তাকে রুদ্রবীণা করে তুললেন। এ যন্ত্র একেবারে নতুন। একমাত্র তাঁরই আপনগড়া। কিন্তু তাঁর এই সাহস তো ব্যর্থ হল না। অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘন-ঘর্ঘরমন্দ্রিত রথে চড়ে বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম আবির্ভূত হল আধুনিক কাব্য 'রাজবদ্দুন্তধ্বনি'--কিন্তু তাকে সমাদরে আহ্বান করে নিতে বাংলাদেশে অধিক সময় তো লাগেনি। নবযুগের প্রাণ-বান সাহিত্যের স্পর্শে কল্পনাবৃত্তি যেই নবপ্রভাবে উদবোধিত হল অমনি মধুসূদনের প্রতিভা তখনকার বাংলা ভাষার পায়েচলা পথকে আধুনিক কালের রথযাত্রার উপযোগী করে তোলাকে দুরাশা বলে মনে করল না। আপন শক্তির ওপরে শ্রদ্ধা ছিল বলেই বাংলা ভাষার 'পরে কবি শ্রদ্ধা প্রকাশ করলেন ; বাংলা ভাষাকে নির্ভীকভাবে এমন আধুনিকতার দীক্ষা দিলেন যা তার পূর্বানুবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বঙ্গবাণীকে গম্ভীর স্বরনির্ঘোষে মন্দ্রিত করে তোলার জন্যে সংস্কৃত ভাণ্ডার থেকে মধুসূদন নিঃসংকোচে যেসব শব্দ আহরণ করতে লাগলেন সেও নতুন, বাংলা পয়ারের সনাতন দলবিভক্ত আল ভেঙে দিয়ে তার উপর অমিত্রাক্ষরের যে বন্যা বইয়ে দিলেন সেও নতুন, আর মহাকাব্য-খণ্ডকাব্য রচনায় যে

রীতি অবলম্বন করলেন তাও বাংলা ভাষায় নতুন। এটা ক্রমে ক্রমে, পাঠকের মনকে সইয়ে সইয়ে, সাবধানে ঘটল না; শাস্ত্রিক-প্রথায় মঙ্গলাচরণের অপেক্ষা না রেখে কবিতাকে বহন করে নিয়ে এলেন এক মুহূর্তে ঝড়ের পিঠে—প্রাচীন সিংহদ্বারের আগল গেল ভেঙে। (সাহিত্যের পথে, পৃঃ ২৪৪-২৪৬)।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকের পর সর্বপ্রথম 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' এ অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। 'মেঘনাদবধকাব্যে' এ প্রচেষ্টা সর্বাধিক সার্থক রূপ লাভ করে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে মধুসূদন বাংলা কাব্যের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছেন। অমিত্রাক্ষরে যতিপাতের বৈচিত্র্য থাকায় কাব্যের যে প্রবহমানতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাই নয়, নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথও প্রশস্ত হয়েছে। বাংলা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই বিপুল সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়ে গেছেন মধুসূদন। মধুসূদনপ্রবর্তিত এই নতুন রীতিকে অবলম্বন করে আধুনিক বাংলা কাব্য নতুন নতুন পথে অবিরাম পরিক্রমা করে চলেছে, 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন; 'মেঘনাদবধকাব্যে' এ পরীক্ষা সার্থকতর ফল-লাভ ঘটেছে। 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' যতিপাত হয়েছে প্রধানতঃ ৮ মাত্রার পরে, যদিও ২, ৩, ৪, ৭, ১০, মাত্রার যতিপাতের নিদর্শনও সুপ্রচুর। কিন্তু 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' পুরনো পয়ারে রীতিসান্নিধ্য যতটা লক্ষ্য করা যায়, 'মেঘনাদবধকাব্যে' তাও প্রায় অন্তর্হিত-এ কাব্যে আরও বলিষ্ঠ, অথচ প্রবহমান। এই প্রবহমানতাকে ভিত্তি করেই আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দো-বৈচিত্র্যের স্থষ্টি হয়েছে এবং পর্ব-বিভাগের যতিপাতের ও স্তবক-বিন্যাসের নানা বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। প্রথম আধুনিক মধুসূদন এ কারণেই বাংলা সাহিত্যের এক যুগন্ধর কবি-স্রষ্টা।

মাইকেলী 'অমিত্রাক্ষর'

নতুন বোধ ও জীবনচেতনার রূপকার মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতেই আঙ্গিকগত দিক থেকেও আধুনিক বাংলা কাব্যের সেই আদিপর্বেই ঐতিহাসিক বিবর্তন সাধিত হয়। মধুসূদন-পূর্ব কবিদের কারো কারো রচনায় চেতনাগত দিক থেকে কিছুটা নবীনতা এবং পরিবর্তন-প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও, কাব্য-আঙ্গিকের বিবর্তনধারার সাথে এর সুখকর সমন্বয়ের অভাবে তা তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ লাভ করেনি। বাংলা পয়ারের অন্ত্য-মিলের ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে মধুসূদনের পূর্বসূরী কবিরা মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণের কাব্যসাধনায় আত্মনিবেদিত হয়েছিলেন।

পরিবর্তিত সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে (মুসলমান রাজত্বের অন্তিমক্ষণ এবং ইংরেজ রাজত্বের পত্তন—এই দুইয়ের সন্ধিলগ্নে পাইতেছি কবি ভারতচন্দ্রকে) অষ্টাদশ শতকের কবি ভারতচন্দ্র কাব্যের ভাষা এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। মঙ্গল-কাব্যের ঐতিহ্যের ধারানুসারী হলেও, ভারতচন্দ্র যেহেতু মানবিকতা-বোধ ও উদার জীবনচেতনা স্থিত হয়েছিল, এবং যেহেতু তিনি 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে'---এই শিল্পবোধে উজ্জীবিত ছিলেন, সে কারণে তাঁর রচনায় ব্যক্তিপ্রতিভার অবদানে নানা বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, গীতিকাব্যের অভিনবত্ব আধুনিকতা ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চরিত্র-চিত্রনের নতুনত্ব এবং সংস্কারমুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিশিষ্ট লক্ষণ।

ভারতচন্দ্রের রচনায় 'নতুন ও পুরাতনের সেতুবন্ধ, পরিবর্তনের সুর-ঝংকার শ্রুত হয়েছিল। কাব্যের উপজীব্য আহরণের ক্ষেত্রে অবশ্য উত্তরসূরী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ভারতচন্দ্রের তুলনায় ছিলেন অধিকতর সমকালীনতা-নির্ভর। যদিও ভারতচন্দ্র 'মানুষের জন্যে নবদৃষ্টিভঙ্গীতে

কাব্য রচনা' করেছিলেন, তবুও মঙ্গলকাব্যের ধারারক্ষীই তিনি থেকে গেছেন। কিন্তু উত্তরসূরী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অপেক্ষা পূর্বসূরী ভারতচন্দ্র ছিলেন অধিকতর আঙ্গিক-সচেতন, কাব্য-আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও তাঁর অবদান বিশিষ্ট। ভারতচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে পরিবর্তিত যুগমানস এবং নতুন জীবনচেতনার রূপায়ণের জন্যে কাব্য-আঙ্গিকেরও পরিবর্তন অপরিহার্য। তখন পর্যন্ত অবশ্য যদিও বাংলা পয়ারের অন্ত্যমিল বর্জন করে এর কোনো পরিবর্তিত রূপ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, তবুও এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই নতুন জীবন চেতনা-সমৃদ্ধ প্রতিভাবান কবিরা নানা বৈচিত্র্যের আমদানী করেছিলেন। বিশেষতঃ 'ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ছন্দের অনুসরণে বাংলা ভাষায় কয়েকটি পদ লিখিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলীতে 'দশ প্রকার সংস্কৃত ও তদনুগ ছন্দ এবং আট প্রকার বাংলা ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।' উল্লেখনীয় যে ভারতচন্দ্রে প্রচলিত পয়ারের রীতি-সান্নিধ্য লক্ষ্যগোচর হলেও তাঁর মধ্যেই যতিপাতের নতুনত্ব আবিষ্কৃত। প্রাচীন বাংলা পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের পংক্তিতে সর্বত্র ৮ ও ৬ মাত্রায় যতিপাতই ছিল সাধারণ রীতি (উদাহরণ: মহাভারতের কথা / অমৃত সমান/কাশীরাম দাশ কহে / শোনে পুণ্যবান=৮+৬=১৪, ৮+৬=১৪) কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে এ রীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। ছান্দসিক-কবি ভারতচন্দ্র---যিনি তাঁর কাব্যে দশপ্রকার সংস্কৃত ও তদনুগ ছন্দ এবং আট প্রকার বাংলা ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তিনি প্রাচীন পয়ারের অনুসারী হলেও, এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুই-এক স্থলে কবি ব্যবহৃত পয়ার ছন্দে যতি-পতনের স্বাধীনতা লক্ষিত হয়, যথা--'কান্দে মেনকা রাণী: চক্ষুর জলে ভাসে। নখে নখ বাজায়ে: নারদমুনি হাসে।।' এবং 'নীল পদ্ম খড়্গ কান্তি সমুণ্ড খর্পর। চারি হাতে শোভে: আরোহণ শিরোপর' প্রথম শ্লোকে সপ্তম অক্ষরের পর এবং দ্বিতীয় শ্লোকে দ্বিতীয় ছত্রে যতিপাত হইয়াছে। অমিত্র ছন্দের মর্মকথা হইল অসম যতি। ভারতকাব্যে কৃচিৎ দৃষ্ট এই বন্ধনহীনতা অমিত্রছন্দের পূর্বদূত হিসাবে সম্ভবত গণ্য হইতে পারে (ভারতচন্দ্র, শ্রী মদনমোহন গোস্বামী পৃ: ২৭)।

পয়ার ছন্দে যতি-পতনের স্বাধীনতা ভারতচন্দ্র কাব্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির

প্রয়োজনেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর মতো ছান্দসিক ও ছন্দ-কুশলী কবির পক্ষে এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার কিংবা এমনিতেই হয়ে যাওয়া ঘটনা হতে পারে না। কিন্তু অভিনবত্ব-প্রয়াসী এবং ছন্দ-কুশলী হওয়া সত্ত্বেও ভারতচন্দ্র পয়ারের অন্ত্যমিলের বেড়া ভাঙতে পারেননি। তাঁর উত্তরসূরী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তো অন্ত্যমিলের যাদুতে সম্পূর্ণতঃই বশীভূত হয়ে গিয়েছিলেন। এর কারণ, ঈশ্বর গুপ্ত সমকালীন পাঠকের মর্জির তোয়াক্কা করেছিলেন, এবং এ দুর্বলতা সম্ভবত এ কারণেই প্রসার লাভ করেছিল যে, ধ্বনি-প্রকরণ ও অন্ত্যমিলের প্রতি তৎকালীন পাঠক ও শ্রোতার এক প্রবল আকর্ষণ ছিল। কবিওয়ালারা মিলের বাহাদুরী দেখিয়েই প্রধানত শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জনে সক্ষম হতেন এবং এ কারণেই কবিগানের সময় উপস্থিত বুদ্ধির জোরে তাঁরা যেমন নতুন নতুন যুক্তির অবতারণা করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতেন তেমনি শ্রোতাদের উৎকর্ণ রাখতেন অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রকাশ দেখিয়ে। কবিতার ছত্রান্তে যে কোন বর্ণের পারস্পরিক ধ্বনিগত মিলকেই শ্রোতৃমণ্ডলী কবিত্বশক্তির দিব্য-প্রকাশ হিসেবে ধরা দিতেন। মিলের প্রতি আকর্ষণ এবং মিলানুগত্য শুধু পাঠক-শ্রোতাদের নয়, কবিদের মনেও স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছিল। বস্তুতঃ, পংক্তি-শেষের অর্থাৎ শব্দান্তে যিনি পারস্পরিক ধ্বনিগত মিল-বিন্যাস করতে পারেন এবং এ ব্যাপারে সন্নিবেশ ঘটাতে পারেন নানা বৈচিত্র্যের, তিনিই প্রকৃত কবি--এমন একটা ধারণা সবার মধ্যে আসন গেড়েছিল। সন্দেহ নেই যে মিল-বিন্যাসে পারঙ্গমতা প্রদর্শন এবং বৈচিত্র্যের আমদানী কবি-শক্তির পরিচয়-বহ। কিন্তু এই তো কবি-কীর্তির একমাত্র নিদর্শন নয়। যথার্থ কবির পরিচয় দিতে গিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একদা প্রশ্ন করেছিলেন :

> কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
> শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
> সেই কি সে যম-দমী ?

এই প্রশ্নের উত্তরে মধুসূদন বলেছিলেন :

> সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
> যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন,
> অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি

ভবের সংসারে তার স্বর্ণ কিরণ।
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে,
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে ;
নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে।

কল্পনা-সুন্দরী যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন—তিনিই যে প্রকৃত কবি এই বোধ মধুসূদনে ছিল প্রাণবন্ত। শুধু শব্দে শব্দে বিবাহ-বন্ধন নয়, অন্ত্যমিলে যাদুকরী ক্ষমতা প্রদর্শনও নয়, কবির কাজ হচ্ছে কল্পনা-সুন্দরীর প্রতিষ্ঠা। 'আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে' সেই তো কবি। মধুসূদন জানতেন, 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি।' তাই তিনি বাংলা পয়ারের অন্ত্যমিলের বেড়া ভেঙে যতিপাতের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করলেন। পয়ার ছন্দে অসম-যতিপাতে অর্থাৎ যতিপাতের স্বাধীনতায় কবিতায় যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয় এ বোধ মধুসূদন-পূর্ব কোনো কোনো কবির ছিল; কিন্তু অন্ত্যমিল বর্জন করে কবিতায় যে প্রবহমানতা সৃষ্টি করা যায়, এই চেতনা তাঁদের স্পর্শ করেনি। মধুসূদনই প্রথম বাংলা কবিতার এই শক্তিকে আবিষ্কার করলেন।

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মধুসূদন 'পদ্মাবতী' নাটকের পর সর্বপ্রথম 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য'-এ অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেন। এ প্রসঙ্গে কবি 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় মঙ্গলাচরণে লেখেন: আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে যখন এ দেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগদেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্যরচয়িতা এতদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবে যে কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ কিছুই তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে না। 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' মধুসূদন অমিত্রাক্ষর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, কিন্তু 'মেঘনাদবধকাব্যে' ঘটেছে এর সার্থকতম ফললাভ। 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যে যতিপাত

প্রধানতঃ ৮ মাত্রার পরে, যদিও ২, ৩, ৪, ৭, ১০ মাত্রায় যতিপাতের নিদর্শনও সুপ্রচুর ; কিন্তু 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য'-এ পুরনো পয়ারের রীতি-সান্নিধ্য যতটা লক্ষ্য করা যায়, 'মেঘনাদবধকাব্যে' তাও প্রায় অন্তর্নিহিত। এ কাব্য আরো বেশী বলিষ্ঠ, অথচ প্রবহমান।

প্রচলিত পয়ার ছন্দের বেড়া ভেঙে প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত অর্থাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিষ্ঠা ঘটাতে গিয়ে মধুসূদনকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। শুধু রাম-লক্ষ্মণকে কাব্যে হীনবর্ণে চিত্রিত করার অপরাধে নয়, পয়ারের বেড়া-ভাঙার অপরাধেও মধুসূদন সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন। হেমচন্দ্রের বক্তব্যেও এর পরিচয় মিলে : 'প্রথমে কত লোক কতই ভয় দেখাইয়াছিল---কতই নিন্দা করিয়াছিল, অমিত্রছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্য---বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয় তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা। ---পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত---। মধুসূদনের নিজের বক্তব্যেও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতি সমকালীন কাব্য সমালোচক ও পাঠক সমাজের অনীহা ও বিরূপতার পরিচয় মেলে। তিনি নিজেও বলেছেন : এরূপ পরীক্ষার ফল সদ্য-পরিণত হয় না। 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্যের ভূমিকায় মধুসূদন এ-কথা বলেছিলেন। 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে এ-পরীক্ষার ফল অপেক্ষাকৃত পরিণত। অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় দিতে গিয়ে ছান্দসিক সমালোচকেরা বলেন : বাংলার ছন্দমাত্রের বিশেষত অমিত্রাছন্দের শক্তি কোথায় ? কেবল অক্ষরের সংখ্যা অথবা মাত্রার মধ্যে নহে। যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের এবং সবল ও দুর্বল উচ্চারণের প্রবহনার মধ্যে, তেমনি বিরাম-যতির প্রয়োগ মধ্যেই অমিত্রছন্দের প্রধান শক্তি (মধুসূদন, শশাংকমোহন সেন) মধুসূদন অমিত্রাক্ষর রচনায় চৌদ্দ অক্ষরের গণ্ডী অতিক্রম করেননি, এক হিসাবে এদিক থেকে তিনি পুরনো পয়ারের রীতি অনুসরণ করেছেন, কিন্তু এতে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছেন অন্ত্যমিল বর্জন করে এবং যতি-স্থাপনের নতুন রীতি অনুসরণ করে। এর ফলে কাব্যে শুধু গতিবেগই সঞ্চারিত হয়নি, উপরন্তু ওজগুণেরও প্রসার ঘটেছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'যেন তেন প্রকারের চৌদ্দ অক্ষরে অন্ত্যমিলহীন পংক্তি রচনা করিলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ হয় না। অমিত্রাক্ষর রীতির প্রাণবন্ত

প্রবহমানতা, ভাবগত ছেদ ও শব্দগঠন রীতির মধ্যে অমিত্রতা প্রবর্তনের দরুন ছন্দধ্বনির উর্মিলতা। (আবদুল কাদির)

অমিত্রাক্ষর-ছন্দের এই প্রাণবস্তু সম্পর্কে সচেতন এবং অবহিত ছিলেন বলেই মধুসূদনের পক্ষে প্রকৃত অমিত্রাক্ষর রচনা সম্ভব হয়েছিল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরে বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শশাংক মোহনসেন বলেছেন, হ্রস্ব-দীর্ঘ উচচারণের স্থানিক বিনিয়োগ এবং বিরাম যতির প্রয়োগ মধ্যেই যেমন মধুছন্দের প্রধান শক্তিরহস্যটি মিলিবে, তেমনি মধুসূদনের রচনায় সংস্কৃত শব্দবাহুল্যের রহস্যটিও এ স্থানে মিলিবে---- অদ্বিতীয় ছন্দকবি মধুসূদন প্রাকৃত বাংলার অরাজক এবং একাকার রাজ্যে কেন যে অধিক পদচারণা করিতে চাহেন নাই, পরন্তু, বর্ণগৌরবময় আর্যশব্দের বনিয়াদী ক্ষেত্রে বরঞ্চ অতিরিক্ততা দেখাইতেও ভালবাসিয়াছেন, তাহার রহস্যও এ স্থানে মিলিবে। মধুসূদনের উত্তর-সূরী কবিরা অমিত্রাক্ষর রচনা করতে গিয়ে পয়ারের অন্ত্যমিলের বেড়া ভেঙেছেন, যতি-পাতেও অসম মাত্রা অনুসরণ করেছেন, কিন্তু এই ছন্দের অন্তর্গত প্রবাহকে পুরোপুরি ধরতে পারেন নি। ফলে এঁদের রচনায় পুরনো পয়ারের রীতি-সান্নিধ্যই অনুভূত হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বৃত্র সংহার' কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন: মাইকেল মধুসূদন সর্বাঙ্গে বাংলা কাব্য রচনার অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদবিন্যাস করিয়া বঙ্গ-ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। আমি তৎপ্রদর্শিত পথ যথাযথ অবলম্বন করি নাই।---পয়ারের যতি সংস্থাপনের যেরূপ প্রথা আছে তাহার অন্যথা করি নাই; কেবল শেষ ছয় অক্ষরের সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করিয়াছি।

শুধু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নন, উত্তরসূরীদের মধ্যে যাঁরাই অমিত্রা-ক্ষরে কাহিনীকাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের কেউই মধুসূদনের মতো সর্বাঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুসরণ করেননি। নবীনচন্দ্র সেন, কায়কোবাদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখের কেউই কাব্যরচনায় আগাগোড়া অমি-ত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেননি; কাব্যে তাঁরা ভিন্ন রীতির ছন্দ অনুসরণ এবং স্তবক বিন্যাস করেছেন।

শশাংকমোহন সেনের ভাষায়, 'স্বাধীন চরণা যতির মধ্যেই যে অমিত্রাক্ষরের প্রধান ছন্দ। উহার সঙ্গীত অধিবাসী-আত্মা এবং আত্মার

অধিবাসী সঙ্গীত। অমিত্রছন্দ সকল ছন্দের অন্তর্নিবাসী অব্যক্ত আদ্যচ্ছন্দ, আর্যশক্তি এবং আদ্যশক্তি।' তাঁর মতে, 'অমিত্রছন্দে দাঁড়াইলেই সহজে বোঝা যায় কে কবি, কে অকবি।'

মধুসূধন এই কবি-অকবি-র পরীক্ষায় আপন শক্তিতেই উত্তীর্ণ, সর্বাধিক সাফল্যের অধিকারী কবি-স্রষ্টা।

কবিতায় গ্রামীণ-জীবন

আমাদের সাহিত্যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই পল্লী-জীবনের চিত্র ও গ্রামীণ মানুষের আশা-আকাংখার ছবি নানা রূপে ও রেখায় ধরা দিয়েছে। এসব ছবিতে যেমন এদেশের প্রাকৃতিক রূপৈশ্বর্য ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য-সুষমা প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি ভৌগোলিক পরিবেশ ও নিসর্গের পটে বিচরণশীল মানুষের আশা-আকাংখা, হাসি-কান্না, বিরহ-বেদনা এবং সংগ্রামী জীবনধারার বিচিত্র ছবিও প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু কবি-শিল্পীরা জীবনের নিছক ফটোগ্রাফিক চিত্ররূপ রচনা করেন না, নিজেদের আবেগ-অনুভূতি, ইম্যাজিনেশন বা কল্পনা-প্রতিভার সহায়তায় অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বিষয়বস্তুকেই নতুনরূপে তুলে ধরেন এবং তাতে সঞ্চারিত করেন সৃষ্টির মহিমা, সে কারণে পল্লী-জীবনের চিত্র রচনায়ও আমাদের কবি-শিল্পীরা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির প্রশ্রয় দিয়েছেন, আর এ কারণেই তাঁদের রচনায় ব্যক্তি-প্রতিভার তারতম্য ও সীমাবদ্ধতা অনুসারে পল্লীজীবনের চিত্র বিচিত্র হয়ে ধরা দিয়েছে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন আখ্যানকাব্যে, লোক-কাহিনীতে, গীতিকায়, ছড়ার ছন্দে, বারোমাস্যায় ও পল্লীগীতিতে। পল্লীজীবন ও গ্রামীণ মানুষের জীবন-ধারার পরিচয় তুলে ধরা কিংবা ঐশ্বর্যময় পল্লী-প্রকৃতির রূপ-সুষমা বর্ণনা এ সব রচনার মূল উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রেমের কাহিনী বর্ণনায়, সামাজিক মানুষের দ্বন্দ্ব-সংশয়, ঈর্ষা, বিদ্বেষ-ষড়যন্ত্রের চিত্র তুলে ধরার ফাঁকে ফাঁকে কবিদের সামাজিক অভিজ্ঞতা কল্পনা প্রতিভার স্পর্শে সজীব হয়ে ধরা দিয়েছে। অখ্যানকাব্যে শুধু আমাদের পল্লী-জীবন ও সেখানকার মানুষের আশা-আকাংখা এবং বিরহ-বেদনার প্রতিফলনই ঘটেনি সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবৈশিষ্ট্যের পরিচয়ও দীপ্ত হয়েছে।

ভৌগোলিক রূপ-পার্থক্যে যে মানুষের জীবনধারার পার্থক্যকেও স্পষ্ট করেছে, আমাদের প্রাচীন উপাখ্যান ও আখ্যান-কাব্যে রয়েছে তারই অনির্বাণ পরিচয়। শুধু জীবনধারার ভিন্নতা নয়, জীবনাদর্শের ভিন্নতাও এ সব কাহিনী-কাব্যে এবং সে সবের চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় এদেশের গ্রাম-জীবন ও গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংখা, বিরহ-বেদনা ও চিরন্তন রোমান্সের সজীব চিত্র অংকিত হয়েছে। সংগ্রামের প্রেরণা, দুঃখ ও বেদনার তীব্রতা এবং সর্বোপরি প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্যের মধ্যে এক অপার আশায় বুক বেঁধে জীবনধারণের দুঃসাহসী প্রয়াস এ সব কাহিনী কাব্যকে দিয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। আর তারি পটভূমিকায় রূপায়িত হয়েছে চিরজয়ী মনুষ্যত্ববোধ। কাব্যবেত্তাদের মতে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলার মানুষের জীবন এমন সুচারুরূপে আর কোথাও রূপায়িত হয়নি। প্রাচীন কাব্যে ও পুঁথি-সাহিত্যে পল্লী প্রকৃতি ও জীবনের খণ্ড চিত্র রূপায়িত হয়েছে, কারণ পল্লীর জীবন-নির্ভর কাব্য রচনা এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। ইঙ্গিতে আভাসে, প্রত্যক্ষে পরোক্ষে সে সব কাব্যে যে জীবনের শুভসূচনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল আধুনিক কালের কবিতায় ঘটেছে তারই ব্যাপকতর ও সুন্দরতর বিকাশ। আমাদের সাহিত্যে বন্দে আলী মিয়া, জসীমউদ্দীন প্রমুখের রচনায় রয়েছে তারই উজ্জ্বল পরিচয়। পল্লী-প্রকৃতি ও জীবন-নির্ভর কবিতা রচনায় বন্দে আলী মিয়া জসীমউদ্দীনের অগ্রণী হলেও এ ক্ষেত্রে জসীমউদ্দীনের দীর্ঘদিনের সাধনা ও সাফল্য তাঁকে একটি বিশেষ পরিচিতি ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বন্দে আলী মিয়ার 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনামূলক খণ্ডচিত্রে বিধৃত হয়েছে পদ্মাপারের মানুষের সৌন্দর্যবোধ, জীবনতৃষ্ণা, প্রেম-বিরহ-ভালোবাসা ও বেঁচে থাকার সংগ্রামী প্রয়াসের কাহিনী। বন্দে আলী মিয়া শুধু পদ্মার তীরবর্তী ময়নামতীর চরের অপার সৌন্দর্যই অঙ্কন করেন নি—সেই সঙ্গে তাদের খণ্ড ক্ষুদ্র দুঃখ বেদনার ছবিও এঁকেছেন। তবে বন্দে আলী মিয়ার কবিতায় অতীতের সুখ-স্মৃতি এবং রূপময় দিনের কাহিনীই প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। তাঁর ভাষায়:

জ্যোৎস্না-চাদর ছড়ায়ে পড়েছে ময়নামতীর চরে
বালিগুলো তার ভাঙাকাঁচ গুড়ো ঝিকি-মিকি ঝিকি করে

আধো ঘুম আর আধেক স্বপন—
নয়নে মউজ মাখা
বটগাছ যেন বুড়ো সন্ন্যাসী আঁধারের কাঁথা ঢাকা।

জসীমউদ্দীনের কবিতায় পল্লী-প্রকৃতি ও মানুষের জীবনধারার ছবি রূপ পেয়েছে আরও ব্যাপকতর, ঘনিষ্ঠতর ও সুন্দরতর রূপে। তিনি শুধু খণ্ড-কবিতায় ও গানে পল্লী-জীবনের রূপচিত্র অংকন করেন নি, বিভিন্ন আখ্যান ও কাহিনী-কাব্যে এবং গীতি-নাট্যেও এদেশের পল্লী প্রকৃতি ও গ্রাম-জীবনের বৈচিত্র্যময় ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি যেমন কবিতায় সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের ছবি এঁকেছেন তেমনি রূপ দিয়েছেন বেদেদের জীবন ধারার চিত্রও। তাঁর 'নক্সীকাঁথার মাঠ' 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' 'সখিনা' ইত্যাদি কাহিনী-কাব্যে যেমন গ্রাম-জীবনের ছবি রূপায়িত, তেমনি 'রাখালী' 'বালুচর' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের খণ্ড কবিতায়ও গ্রামজীবন নানা রূপ ও রেখায় বিধৃত। তিনি যেমন রোমান্টিক দৃষ্টিতে পল্লীর নিসর্গ-চিত্র অংকন করেছেন, তেমনি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংখা ও বিরহ-বেদনার ছবি। জসীমউদ্দীনের বর্ণনায়:

উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
যোজন জুড়ি
জলের উপরে ভাসিছে ধবল
বালুর পুরী।

ধানক্ষেতের বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এইভাবে:

'পথের কেনারে পাতা দোলাইয়া করে সাদা সংকেত
সবুজে হলুদে সোহাগ ঢুলায়ে আমার ধানের ক্ষেত'

কিন্তু জসীমউদ্দীন শুধু রোমান্টিক দৃষ্টিতেই গ্রামজীবনের ছবি প্রত্যক্ষ করেননি, তিনি সেখানকার রূঢ় বাস্তবতাকেও প্রত্যক্ষ করেছেন:

রাত থম থম স্তব্ধ নিঝুম, ঘোর ঘোর আন্ধার
নিশ্বাস ফেলি, তাও শোনা যায়, নাই কোথা সাড়া কার।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা
করুণ চাহনি ঘুম ঘুম যেন ঢুলিছে চোখের পাতা

শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে।
(পল্লী-জননী।)

গাঁয়ের চাষীরা মিলিয়াছে আসি মোড়লের দলিজায়
গল্পে গানে কি জাগাইতে চাহে আজিকার দিনটায়
কেউ বসে বসে বাখারী চাঁচিছে কেউ পাকাইছে রশি
কেউবা নতুন দোয়াড়ীর গায়ে চাকা বাঁধে কসি কসি
কেউ তুলিতেছে বাঁশের লাঠিতে সুন্দর করে ফুল
কেউবা গড়িছে সারিন্দা এক কাঠ কেটে নির্ভুল।
মাঝখানে বসে গাঁয়ের বৃদ্ধ করুণ ভাটির সুরে,
আমীর সাধুর কাহিনী কহিছে সারাটি দলিজা জুড়ে।

কিন্তু পল্লী-জীবনের অমন আয়াসী চিত্র অধুনা আর লক্ষযোগ্য নয়। এখন পল্লীর মানুষও কঠিন জীবন-সংগ্রামের শিকার। নানা সমস্যার জালে বন্দী। জসীমউদ্দীনের কবি দৃষ্টি এ সত্যও স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর 'মাটির কান্না' ও 'সখিনা' কাব্যগ্রন্থে রয়েছে এই মানস সজাগতা এবং চেতনারই পরিচয়। 'দেশ' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলছেন :

ক্ষেতের পরে ক্ষেত চলেছে, ক্ষেতের নাহি শেষ
সবুজ হাওয়ায় দুলছে ও কার এলো মাথার কেশ।

× ×

তারি মাথায় থোকা থোকা দোলে ধানের ছড়া।
মার আঁচলের পরশ যেন সকল অভাব-হরা।
সেই ফসলে আসমানীদের নেই কো অধিকার
জীর্ণ পাজর বুকের হাড়ে জ্বলছে হাহাকার।"

জসীমউদ্দীনের পর আমাদের সাহিত্যে রওশন ইজদানী ও আবদুল হাই মাশরেকীর কবিতায় পল্লী-জীবনের চিত্র ধরা দিয়েছে। রওশন ইজদানী কাহিনী-কাব্য, খণ্ড কবিতা ও গানে পল্লীর জীবনচিত্র অংকন করেছেন।

আবদুল হাই মাশরেকীর কবিতায় অপেক্ষাকৃত আধুনিক আঙ্গিকে বিধৃত হয়েছে পল্লী-জীবনের ছবি। মঈনুদ্দীন, আজহারুল ইসলাম, আজিজুর রহমান প্রমুখ পূর্বসূরীদের রচনায়ও পল্লীর জীবনচিত্রের সাক্ষাৎ মেলে।

একালের কবিদের রচনায় পল্লার জীবনচিত্র ও পরিবেশের বদলে নাগরিক জীবন-সমস্যা জটিলতা ও মানস সংকটই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। রোমান্টিক পরিবেশের বর্ণনায়, কখনো কখনো বা অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান জীবন জটিলতা ও সমস্যা থেকে মুক্তির আন্তরিক কামনায় আমাদের কবিরা গ্রামজীবনের শরণ নিয়েছেন এবং গ্রামে ফিরে যাবার আকাংখা প্রকাশ করেছেন। তবে এ সত্যও তাঁদের রচনায় ধরা দিয়েছে যে গ্রামজীবন আর আগেকার মত নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং শান্তির আধার নয়, সেখানেও নানা সমস্যা এবং জটিলতা মুখ-ব্যাদান করে আছে। 'একটি ঐতিহাসিক ভ্রমণ' শেষে তাই আহসান হাবীবের কন্ঠে ধ্বনিত হয়েছে:

এই সেই গ্রাম।
তবু যেন সেই গ্রাম নয়।
পঁচিশ বছর ধরে চেনা সেই গ্রাম
ঢেকে গেছে ইটবিয়াই নগরীর মত।

সময় ও সমস্যার স্তূপে চাপাপড়া অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনে খানিকটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে আবুল হোসেন বলেছেন:

আমাদের দেশ আছে
শুনেছি কবির সুরে।
হাল কাঁধে 'চাষী যায় ক্ষেতে
ধান ভানে ধান ঝাড়ে
কালো চোখ কালো চুল
কিশোর কিষাণী
খালে বিলে পদ্মা মেঘনায়
দাঁড় টানে মাঝি
জাল ফেলে জেলে।
ছবি আছে সচিত্র মাসিকে।

কিন্তু আবদুর রশীদ খান ফেলে-আসা গ্রাম-জীবন সম্পর্কে অতখানি রসিনিক বা হতাশাবাদী নন; তাই তাঁর কন্ঠে ধ্বনিত:

খেয়াঘাট।
সরু গলি।
তারপর আমাদের গ্রাম।
পলাতক ইতিহাস আবার পেলাম।
পথে পথে চেনা হাসি। প্রাণের প্রীতির বিনিময়।
সমস্ত আকাশ হলো আমার সঞ্চয়।

হাবীবুর রহমান গ্রামের অপার ঐশ্বর্যে বিমুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন:

সকালের সূর্য আজ কী সোনা ছড়িয়ে দিলো হেমন্তের মাঠে,
পল্লীর দুলালী বধূ কী মায়া বুলিয়ে দিল পুকুরের ঘাটে।
মুঠি মুঠি কাঁচা রোদ মাঠ ভরে দিয়ে গেল ঐশ্বর্য অক্ষয়;
শ্যামলী গায়ের মেয়ে ঘাট জুড়ে রেখে গেলো কালো পরিচয়।
মাঠ দেখে ভরে ওঠে বুক
ঘাট দেখে নয়ন উন্মুখ।

আশাবাদীর সুরে আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন:

এই যে তোমার বিন্নী ধানের মাঠ
এই যে তোমার দোয়েল শ্যামার দেশ
চম্পা, তুমি কোথায়? রাজ্য পাট?
স্বপ্ন দেখি আজও তোমার কেশ।

ফজল শাহাবুদ্দীনের কবিতায় মফঃস্বল ভ্রমণের চিত্র ধরা পড়েছে এই ভাষায়:

'অগ্রহায়ণের শেষ। শীতের নির্জন সন্ধ্যা,
মফঃস্বলের ছোট্ট ষ্টেশনে নামলাম ট্রেন থেকে
নতুন যায়গা
এখানকার কাউকে চিনি না আমি।

×

রেললাইনের এপারে শহর। ওদিকে নীরব ধানকাটা মাঠ।
মাঠের শেষ প্রান্তে, গ্রাম আর মাঠ মিলে গেছে যেখানে

সেখানে আগুন জ্বলছে, বিষণ্ন নাড়ার আগুন।
ধোঁওয়া-উড়া গ্রাম।
ষ্টেশনের অদূরে যেখানে জলাভূমির পাশে ঝোপ-জঙ্গল
আর হিজলের দীর্ঘছায়া
সেখান থেকে ভেসে আসছে এলোমেলো শেয়ালের ডাক।'

শামসুর রাহমানের 'মা' কবিতায় গ্রামীণ সংসারের একটি চিত্র রচিত হয়েছে এইভাবে:

'ছিলেন নিভৃত গ্রামে। সর্বক্ষণ সংসারের খুঁটিনাটি কাজে
স্বপ্ন, আসমানে রৌদ্র কাঁপে, মেঘের পানসি ভাসে
কখন যে ক'টা বাজে
থাকে না খেয়াল কিছু। দৃশ্য খুবই চেনাশোনা, মৃদু রঙমাখা,
নানা সূক্ষ্মসূত্রে গাঁথা ; চুলোয় চাপানো হাঁড়ি, পুঁই শাক ঢাকা
মাছ পড়ে গোটা দুই শিক্ষক-স্বামীর পাতে। লাউয়ের মাচায়
কখনো রাখেন চোখ, কাঁঠাল গাছের ডালে
হলদে পাখি, লেজটি নাচায়
ঘন ঘন, বেলা বাড়ে। ইঁদারার পানিতে গোসল সেরে
কাঁচা-পাকা চুলে
চালান কাঁকই আর ভাবেন খোকন স্কুলে
নামতা মুখস্থ করে। বৈয়মে রাখেন নক্সীপিঠা, মনে পড়ে
বড় ছেলেটির কথা, চোখ যার বড় বেশী জলজ্বলে পড়াশোনা
করে যে শহরে।

নাগরিক জীবন-জটিলতায় পরিশ্রান্ত-ক্লান্ত আল মাহমুদ উচ্চারণ করেছেন:

'বত্রিশ সায়েদাবাদ, ঢাকা--এই বিষণ্ন দালানে
তেমন জানালা কই যাতে বাঁকা নদী দেখা যায়?'

তাই, আল মাহমুদের কণ্ঠে জাগে 'ফেরার পিপাসা'

ফিরে যেতে সাধ জাগে, যেন ফিরে যাওয়ার পিপাসা
জাগায় সুদূর স্মৃতি: মায়ের আঁচল ধরে টেনে
দেখায় দূরের নদী, ওইতো হাটের নাও মাগো
দক্ষিণা বাতাসে দ্যাখ ভেসে যাচ্ছে সমস্ত সোয়ারী''

প্রত্যাবর্তনের পর তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এই দৃশ্য :

দেখো, জয়নুলের ছবির মত ঘরবাড়ী, নারী—
উঠোনে ঝাড়ছে ধান, ধানের ধূলোয় ম্লান শাড়ি—
গতর উদোম করে হাতে লেপা মাটির চত্বরে
লাঞ্ছিত নিশেন হয়ে পড়ে আছে যেন অনাদরে।
প্রাণের রঙের মত পরাজিত প্রেমের কেতন
আবার তুলতে চাই পলাতক আমরা ক'জন
মানুষের বাসস্থান, লাউ মাচা নীলাম্বরী নিয়ে
আমরা থাকতে চাই ;

আধুনিক নগর-জীবনের জটিলতা ও সমস্যায় ক্লান্ত আবদুস সাত্তার উচচারণ করেছেন নিভৃত গ্রামে ফিরে যাবার অনাবিল বাসনা :

সেই ভালো ফিরে যাবো গ্রামের নিভৃতে।
যেখানে মোমের মতো শিয়রে মায়ের স্নেহ জ্বলে
পিতার অনন্ত প্রেম বিস্তৃত মাঠের
শ্যামল শস্যের চারা দিনে দিনে বাড়ে
ঘাসের সবুজে ঘন আকাশের নীল আর প্রাণের সুষমা ;
অশেষ শ্রান্তির শেষে প্রিয়ার অমৃত হাত ওঠে
শীতল জলের পিপাসায়
সুখের গভীরে
সেই ভালো।

[বেতার-কথিকা]

'শুদ্ধতম কবি' : সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা

কবিরাই কবিতার প্রকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক কিনা—এ নিয়ে মতদ্বৈধতার অবকাশ আছে; কিন্তু সৃষ্টিধর্মী সমালোচক মাত্রই যে কবিহৃদয় ও কবিদৃষ্টির অধিকারী, এ-সত্য নিঃসংশয়েই উচ্চারণ করা চলে। কবিতা নামীয় বিশেষ আঙ্গিকের রচনায় শুধু উপজীব্যবিষয়, ভাব বা বক্তব্য ভাষা পায় না, সেই সঙ্গে বিষয়াতিরিক্ত রূপসৃষ্টিও প্রাধান্য পায়। কবিতায় ভাবের মাহাত্ম্য প্রাধান্য বিস্তার করবে, না রূপের মনোহারিতা দৃষ্টিগ্রাহ্য হবে তা নির্ভর করে কবিমানস ও কবিতাজননের বিশেষ প্রক্রিয়ার ওপর। কবিতায় কোন বিশেষ ভাব বা বক্তব্য প্রকাশের অবলম্বন হিসাবে রূপরচনার কাঠামোরূপে কাজ করে; সেই ভাব বা বক্তব্যকে অবলম্বন করে কবির স্বপ্ন-কল্পনা, ভাবনা-বেদনা আবেগ-অনুভূতি সবকিছুই এমন অনির্বচনীয়রূপে ধরা দেয় যে, ভাব বা বক্তব্য গৌণ হয়ে যায়, সৃষ্টির মহিমায় যা' অপরূপ বলে মনে হয় তা সেই ঐন্দ্রজালিক রূপরচনা।

ভাব বা বক্তব্য-বিষয়কে অন্তরালে রেখে, কখনো কখনো আশ্চর্য কবিকৌশলে রচনার উপজীব্যকে অন্তরালবর্তী করে নিয়ে চেতনার কারু-কর্মী কবি গড়ে তোলেন তার নিজস্ব স্বপ্ন-কল্পনার জগৎ; ভাষার বিশেষ রীতিভঙ্গীর আড়ালে, উপমা চিত্রকল্প, রূপক-প্রতীক এবং অন্যসব সৃষ্টি-ধর্মী অনুষঙ্গের সহায়তায় বক্তব্যবিষয়কে করে তোলেন হৃদয়গ্রাহী। কবিমাত্রই কোন-না-কোন বক্তব্য বা বাণী বহন করেন; নিজস্ব ভাবনা বেদনা, অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-চেতনাকে রূপায়িত করেন কবিতানামীয় বিশেষ আঙ্গিকের রচনায়। ব্যক্তিগত, সামাজিক, দৈশিক, আন্তর্জাতিক—যে-কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা কিংবা চিন্তা-চেতনাই হোক না কেন, কবির অনুভূতিশীল হৃদয়মানসে তা ধৃত হয় শিল্পীর নিজস্ব চেতনার রঙে, তার রচনায় তা রূপায়িত হয় শিল্পের অপরূপ এবং অনির্বচনীয়

কলাকৌশলে। ব্যক্তি-প্রতিভা ও ব্যক্তিমানসের বিশেষ গঠন, ধরন-ধারণ ও আত্মপ্রকাশের রীতি-ভংগিমা অনুসারে এ-কারণেই প্রায় একই বক্তব্য শিল্পীতে-শিল্পীতে ভিন্ন রূপ নেয়, বক্তব্য বা বিষয়াতিরিক্ত শিল্পমহিমা তুল্য-মূল্য পায়। শুধু রূপসৃষ্টি কিংবা শিল্পরচনার ক্ষেত্রেই নয়, উপজীব্য বিষয় আহরণের ব্যাপারেও ব্যক্তিপ্রতিভার ধরন এবং ব্যক্তিমানসের প্রবণতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে; এ-কারণেই ব্যক্তিগত, সামাজিক, দৈশিক কিংবা আন্তর্জাতিক সব ধরনের অভিজ্ঞতা, চিন্তা-চেতনা এবং তরঙ্গাভিঘাত কবিমাত্রকেই একইভাবে ও রূপে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত এবং শিল্প রচনায় আত্মনিবেদিত করে না।

কিন্তু বিষয়, ভাব বা বক্তব্য যা-ই হোক না কেন, কবিতার এবং ব্যাপক অর্থে যে-কোনো শিল্পকর্মের বিচারে প্রধান বিচার্য-বিষয় যা', তা-হলো স্বপ্ন-কল্পনা ও সৌন্দর্যের পথ ধরে সৃজনশীলতার স্পর্শে তা অপরূপ মহনীয়তা অর্জন করেছে কিনা। যদি করে---তা হলে সেই শিল্পকর্মের অন্তর্গত ভাব বা বক্তব্যবিষয় চিরপুরাতন হয়েও অভিব্যঞ্জনায় চিরনবীন, প্রাক্তন অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়েও আবেদনশীলতায় যেন সদ্যজাত। আসলে কবিতায় কিংবা বলা যেতে পারে যে-কোনো ধরনের শিল্পরচনায় উপজীব্য বা বক্তব্যবিষয়ের নূতনত্ব মূলতঃ তার উপস্থাপনা এবং প্রকাশ-কৌশল ও রূপেরই নতুনত্ব। এই নতুনত্বকে আসতে হয় সৌন্দর্যের রূপে, কল্পনার পথ ধরে। কবিতায় বিষয়ের গুরুত্ব এবং রূপের মনোহারিত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন :

> হতে পারে কবিতা জীবনের নানা রকম সমস্যার উদ্‌ঘাটন, কিন্তু উদ্‌ঘাটন দার্শনিকের মতো নয়, যা উদ্‌ঘাটিত হল তা যে-কোনো জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে, যদি তা না দেয় তা হলে উদ্‌ঘাটিত সিদ্ধান্ত হয়তো পুরানো চিন্তার নতুন আবৃত্তি, কিংবা হয়তো নতুন কোনো চিন্তাও (যা হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে,) কিন্তু তবুও তা কবিতা হল না, হলো কেবলমাত্র মনোবীজ রাশি। কিন্তু সেই উদ্‌ঘাটন—পুরানোর ভিতর সেই নতুন কিংবা সেই সজীব নতুন 'যদি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করতে পারে, আমার সৌন্দর্যবোধকে আনন্দ দিতে পারে, তা

> হলে তার কবিতাগত মূল্য পাওয়া গেল; আরো নানা রকম মূল্য সে সবের কথা আগে আমি বলেছি—তার থাকতে পারে, আমার জীবনের ভিতর তা আরো খানিকটা জ্ঞানবীজের মতো ছড়াতে পারে, আমার অনুভূতির পরিধি বাড়িয়ে দিতে পারে, আমার দৃষ্টিস্থূলতাকে উঁচু মঠের মতো যেন একটা মৌন সূক্ষ্ম শীর্ষ আমাদের আস্বাদ দিতে পারে; এবং কল্পনার আভায় আলোকিত হয়ে এ সমস্ত জিনিস যত বিশাল ও গভীরভাবে সে নিয়ে আসবে কবিতার প্রাচীন প্রদীপ—ততই নক্ষত্রের নতুনতম কক্ষ-পরিবর্তনের স্বীকৃতিও আবেগের মতো জ্বলতে থাকবে।
>
> [কবিতার কথা]

বিশুদ্ধ কবি-অভিজ্ঞতায় জীবনানন্দ কবিতানামীয় শিল্পরচনায় বিষয়-মাহাত্ম্যের গৌরব নয়, বলা যেতে পারে স্বপ্ন ও সৌন্দর্য-কল্পনার পথ ধরে সব কিছুকেই যথার্থ শিল্প হয়ে ওঠার গৌরবকেই তুল্যমূল্য দিয়েছেন। কারণ তিনি জানেন এবং মানেন 'কবির সিদ্ধিও তার নিজের জগতে; কাব্যসৃষ্টির ভিতরে।' জীবনানন্দের ধারণা ও অভিজ্ঞতায়:

> অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবি-প্রতিভার কাছেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্মও নেই—কিংবা সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ-সমস্ত জিনিস যেন এ সমস্ত জিনিস নয় আর; এ সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন—কবির হাতে আর নয়।

অর্থাৎ কবি সমাজ বাসিন্দা এবং সজীব প্রাণসত্তা ও প্রতিক্রিয়া-উন্মুখ চিত্ত হিসাবে দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম সব কিছুকেই তাঁর কাব্যের বিষয়ীভূত এবং অন্তর্গত করে নিতে পারেন, কিন্তু সব কিছুকেই আসতে হবে সৌন্দর্যের রূপে, কল্পনাকে তৃপ্তি দিয়ে। বিষয়মাহাত্ম্যে নয়, শিল্পরূপের মাহাত্ম্যেই কাব্যে এসব কিছুর মূল্য, আর এ-কারণেই কাব্যের বিচার এবং দর্শন রাজনীতি ও ধর্ম—এ সবের বিচার এক এবং অভিন্নরূপে হবার নয়। কাব্যে যদি দর্শন-রাজনীতি-সমাজনীতি-ধর্ম

প্রাধান্য পায়, শিল্পরূপের মহিমা গৌণ হয়ে যায় তা-হলে, নীতি-হিসাবেই সেসবের মূল্য, কাব্য হিসাবে নয়।

কিন্তু কাব্য বিষয় বা ভাব-নিরপেক্ষ কোনো অবাস্তব রূপ-রচনাও নয়, কাব্য বিষয় বা ভাবকে অবলম্বন করে, অপরূপ কবি-কৌশলে তাকে অন্তরালবর্তী করে নিয়ে এক আশ্চর্য রূপসৃষ্টি।

জীবনানন্দের ভাষায় :

> কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দু'রকম উৎসারণ ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণতঃ যা জানি তা' রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না , কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তিবোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।

কবির কল্পনা-প্রতিভা কিভাবে কবিতায় রূপ পেয়েছে, জীবনের রূপকার এবং চেতনার কারুকর্মী যে-কবি তিনি কি কৌশলে 'কবিতা' ও 'জীবন'—এই একই জিনিসের দুই রকম উৎসারণ ঘটিয়েছেন—সে-সবের বিচারই আসলে কবিতার শিল্পরূপের বিচার। কবিতা যেহেতু বিষয় বা ভাব-নিরপেক্ষ কোনো রূপ-রচনা নয়, সে কারণে কাব্যের শিল্পরূপের বিচারেও বিষয় বা ভাবের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই আসে, কিন্তু সৃজনধর্মী এবং কল্পনা-প্রতিভার অধিকারী সমালোচকই পারেন কবিতার বিষয়াতিরিক্ত কিংবা বিষয়কে একাত্ম করে নিয়ে গড়ে ওঠা কাব্য-শিল্পের প্রকৃত স্বরূপ-সন্ধান এবং তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করতে। সৃজনধর্মী ও কল্পনা-মনীষা-সম্পন্ন সমালোচক কাব্যভাব বা বিষয়ের অন্তরালবর্তী রূপ ও সৌন্দর্যের জগতে হানা দিয়ে তার নানা রহস্যের স্তরভেদ করে গভীরতর উদ্ভাবনায় কাব্যকে চিনিয়ে দেন, তার সৃষ্টির জগতে রূপ ও সৌন্দর্যের ভুবনে আমন্ত্রণ জানান, পাঠকের হাত ধরে সেই অপরূপ রাজ্যে নিয়ে যান।

'শুদ্ধতম কবি' শীর্ষক আলোচ্য-গ্রন্থে স্বয়ং কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দ দাশের কবিতা-কল্পনা রাজ্যে পাঠককে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ত্রিশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির বৈচিত্র্যময় বিশাল ভুবনে সহৃদয়তায়

হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছেন। পাঠককে জীবনানন্দ দাশের কবিতার রূপৈশ্বর্যের সঙ্গে--বলা যেতে পারে এই কবির 'নতুনতা' কিংবা তাঁর 'নতুন সজীবতা'র সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দ আলোচ্য কবির 'কবি-মানসের ক্রমাগত পরিবর্তন' এবং রচনার বিষয় বিবর্তন-এর দিকে পাঠকের, বলা যেতে পারে কল্পনা-মনীষাসম্পন্ন পাঠকের, দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যদিও 'জীবনানন্দ দাশের কবিতার শারীর-বৃত্তিক' আলোচনা, এবং তাঁর 'বিশিষ্টতাকে' ছেঁকে তোলাই মান্নান সৈয়দের লক্ষ্য এবং অন্বিষ্ট। সমগ্র গ্রন্থে মান্নান সৈয়দ কবিতার শারীরবৃত্তিক' আলোচনায় এবং জীবনানন্দের 'বিশিষ্টতাকে ছেঁকে তোলার' প্রয়াসে কি রীতিভঙ্গীর অনুসরণ করেছেন ও কোন মানস-প্রবণতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদেই রয়েছে তার অনির্বাণ নিশানা। 'শুদ্ধতম কবি' শিরোনামের এই পরিচ্ছেদে মান্নান সৈয়দ এই বিশেষ কবি-অভিধার কোনো নিরূপিত সংজ্ঞা দেন নি, কিংবা এর কোনো সূত্র নির্দেশ করেন নি। জীবনানন্দ দাশের কবিতার চারিত্র্য নির্ণয় প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায়-প্রযুক্ত 'শুদ্ধতম কবি' অভিধানই 'প্রযোজ্য' বিবেচনায় মান্নান গ্রহণ করেছেন। অন্নদাশংকর রায় জীবনানন্দ কাব্যের কোন কোন বৈশিষ্ট্যের নিরিখে এবং বিচার বিবেচনায় তাঁকে 'শুদ্ধতম কবি' অভিধায় ভূষিত করেছেন তা আমাদের অজ্ঞাত। মান্নান সৈয়দও সে বিষয়ে আলোকপাত করেন নি। যদিও তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, 'বস্তুতঃ কোনো একটি-দুটি শব্দে কোনো কবিকে চিহ্নিত করাই মুশকিল।' কিন্তু মুশকিল হলেও সমালোচকেরা বিশেষ বিশেষ কবিকে বিশেষ বিশেষ অভিধায় চিহ্নিত করেন, পাঠকসমাজেও কবিরা—অর্থাৎ তেমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কবিরা বিশেষ চারিত্র্যের কিংবা প্রবণতার কবি হিসেবে পরিচিত এবং গৃহীত হয়ে যান, যদিও সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে সেগুলো তেমন সুপ্রযুক্ত কিংবা যথার্থতা জ্ঞাপক হয় না। সংজ্ঞা না দিলেও 'শুদ্ধতম কবি' অর্থে মান্নাম সৈয়দ কবির যে-সব গুণের দিকে ইশারা করেছেন তা আলোচ্য পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য :

> সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি—কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের

সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকিরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে ; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না, যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়, নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টির অবকাশ পায়।

এই কেউ কেউ কবিকেই মান্নান সৈয়দ 'শুদ্ধতম কবি' বলে গ্রাহ্য করেছেন এবং অনুসন্ধান করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন কিভাবে তাদের হৃদয়ে কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা রয়েছে। এইসব শিল্পীসুলভ এবং বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গুণাবলী জীবনানন্দ দাশের কবিতায় লক্ষ্য করেছেন বলেই সম্ভবতঃ তিনি এই কবিকে 'শুদ্ধতম কবি' অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। নিজের রোমাণ্টিক স্বপ্ন ও সৌন্দর্য-কাতর কবিসত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে স্বয়ং জীবনানন্দ দাশ 'ঝরা-পালক' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আমি কবি,--সেই কবি'তে সেই সুদূর কালেই বলেছেন :

আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরা পালকের ছবি।
আনমনা আমি চেয়ে থাকি দূর হিঙুল মেঘের পানে।
মৌন নীলের ইশারায় কোন কামনা জাগিছে প্রাণে।
বুকের বাদল উথলি উঠিছে কোন কাজরীর গানে!
দাদুরী কাঁদানো শাঙন দরিয়া হৃদয়ে উঠিছে দ্রবি'।
স্বপন সুরার ঘোরে
আখের ভুলিয়া আপনারে আমি রেখেছি দিওয়ানা করে'।

কাব্যরচনার প্রথম পর্বেই জীবনানন্দ দাশে রোমাণ্টিক স্বপ্নলোকে পরিভ্রমণ ও কল্পনার গহনে যাত্রা এবং বাস্তবের পাটে ফিরে আসার দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন ঠাঁই করে নিয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মানস-চেতনা ও বেদনাবোধের পরিচয় আরও স্পষ্ট গাঢ়বদ্ধ হয়েছে 'নীলিমা' শীর্ষক কবিতায় :

রৌদ্র-ঝিলমিল,/উষার আকাশ, মধ্য নিশীথের নীল,/অপার ঐশ্বর্যবেশে দেখা দাও তুমি বারে বারে/নিঃসহায় নগরীর কারাগার-প্রাচীরের পারে।----

> চরণে জড়ায়ে গেছে শাসনের কঠিন শৃঙ্খল,—/হে নীলিমা নিষ্পলক, লক্ষ্য বিধি-বিধানের এই কারাতল/তোমার ও মায়াদণ্ডে ভেঙেছ মায়াবী/জনতার কোলাহলে একা ব'সে ভাবি/কোন দূর যাদুপুর রহস্যের ইন্দ্রজাল মাখি,/বাস্তবের রক্ততটে আসিলে একাকী।

'জনতার কোলাহলে একা বসে ভাবনার' এই বিশেষ মানস-প্রবণতা জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আজীবন নানারূপে ও রঙে ধরা দিয়েছে। এই মানস-প্রবণতার নিরিখেই সম্ভবতঃ বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ দাশকে 'নির্জন' 'নির্জনতম' কবি আখ্যা দিয়েছিলেন। কবিজীবনের প্রাথমিক-পর্বে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুলের কাব্যধারায়—বিশেষতঃ নজরুলের সমাজ-নির্ভর উচ্চকণ্ঠ কবিতায় জীবনানন্দ দাশ বিশেষরূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু সমাজ-সত্তাকে অঙ্গীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও রোমাণ্টিক মানসপ্রবণতার দরুণ, 'রৌদ্র ঝিলমিল উষার আকাশ, মধ্যনিশীথের নীল' বারবার 'অপার ঐশ্বর্যবেশে' জীবনানন্দের কবিদৃষ্টিতে ধরা দিয়েছে। কবি-মানসের এই যে দ্বন্দ্ব এবং টানাপোড়েন তাকেই আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, 'অন্তর্বৃতি বহির্বৃতির সমস্যা'। এই উভয়বিধ সমস্যার ঐতিহাসিক ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> মাইকেলে বহুকথিত ক্লাসিকতা রোম্যাণ্টিকতার সমস্যা—ফলতঃ অন্তর্বৃতি বহির্বৃতিরই সমস্যা, উনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখ্যতঃ অন্তর্বৃত, বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলতঃ বহির্বৃত; তেমনি বহির্বৃতি প্রধান হয়েও নজরুল ইসলামের একাংশ অন্তর্বৃত, যেমন অন্তর্বৃতি মুখ্য হয়েও জীবনানন্দের আধখানা বহির্বৃত। (পৃঃ ১০)

আসলে 'অন্তর্বৃতি ও বহির্বৃতি'র এই সমস্যা কবি-মানসের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং টানা-পোড়েনেরই সমস্যা। সামাজিক সমস্যাবলী ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কবি কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর রচনার উপজীব্য করে নিচ্ছেন, তার প্রকৃতি অনুসারেই নিণিত হয় এইসব সমস্যার চারিত্র্য। সমাজ-সচেতন এবং সংবেদনশীল কবি হিসাবে নয়, বস্তুতঃ সামাজিক-নায়ক হিসাবে কবি বহির্বৃত হচ্ছেন কিনা তার উপরও নির্ভর করে কবিতায় বহির্বৃত কিভাবে রূপ পাচেছ তার চারিত্র্য। ঈশ্বর গুপ্তের কাছে কবিতা শুধু শিল্প নয়, সমাজ-সংস্কারেরও হাতিয়ার। এ-কারণেই বহির্বৃতিই তাঁর

মৌল কবিচারিত্র্য। বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা তারও পরবর্তী কাজী নজরুল ইসলামের রচনায়ও কবির দ্বৈতভূমিকার পরিচয় পাই। সেখানে এঁরা শুধু কবি নন, সমাজের কল্যাণকামী দিশারী পুরুষও। কিন্তু সমাজ-সত্তার সাথে কিছুটা পরিমাণে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জীবনানন্দ দাশের ভূমিকা ঠিক অনুরূপ নয়। আবদুল মান্নান সৈয়দ যাকে বলেছেন 'ভিজে সামাজিক বেদনা, রূঢ় সামাজিক ব্যঙ্গ, কঠিন সামাজিক বাস্তব বেদন-ব্যঙ্গ-বাস্তব' ইত্যাকার বিষয়াবলীকেও জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় ফলিয়ে তুলেছেন সামাজিক দায়িত্ব চেতনায় নয়, বরং বলা যেতে পারে কবিসত্তারই উন্মীলন অথবা উৎসারণ হিসাবে। নজরুলে এসব এসেছে সামাজিক দায়িত্ব সচেতনতা এবং কর্তব্যবোধের পথ ধরে—নজরুলের সৃষ্টি-ধর্মী প্রতিভা এসবকে অনায়াসে করে তুলেছে কাব্য-ঐশ্বর্যমণ্ডিত, কিন্তু জীবনানন্দ দাশ কবিতাকে সামাজিক-দায়িত্ব পালন কিংবা কল্যাণ সাধনের হাতিয়ার মনে করেননি, তিনি কবিতাকে দেখেছেন জীবনেরই ভিন্নরূপ উৎসারণ হিসাবে---স্বপ্ন-কল্পনা ও সৌন্দর্যের পথ ধরে যার উদ্ভাসন এবং অমিত বিস্তার। জীবনানন্দের কবি প্রকৃতি ও মানস-চেতনায় এই স্বাতন্ত্র্য-স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন:

> মহাজাগতিক, মহাসময় বা অপর সব জীবনানন্দীয় ভ্রমণ একটি শুদ্ধতার কেন্দ্র থেকে রওনা দ্যায় : রবীন্দ্রনাথের মতো কল্যাণশীল নয় হয়তো, কিন্তু আত্মস্খলনকামী—এবং সেই আত্মস্খলনের মধ্য দিয়েই নিখিল-মুক্তি নিঃশব্দে তার দাবি পেশ করে, জয়ী হয়। সেই শুদ্ধ কেন্দ্র কবি-হৃদয়ের নান্দনিক বৃত্তচক্র---যেখানে এসে মেশে জীবনের স্বতো-সমস্যা-সংবেদন, যে শুদ্ধ-চক্র থেকে ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে পড়ে কবিতা চারপাশে: মহাজগৎ মহাসময়ের প্রতি প্রতিন্যাস, সমাজ-রাজনীতির প্রতি প্রতিন্যাস, অস্তিত্ব ও 'চেতনার প্রতি প্রতিন্যাস, দীপ্তি-ভিক্ষা-অন্ধকার-ভিক্ষা-সমস্তই সেই শুদ্ধ কেন্দ্রনাভি থেকে উচ্ছ্রিত।
>
> (পৃ: ১৪)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই 'শুদ্ধ' কবিসত্তার উন্মীলন এবং কবিতারূপী শিল্পের উৎসারণ কিভাবে ঘটেছে তা-ই আন্তর-অনুসন্ধানী এবং বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টির আলো ফেলে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতররূপে উদ্ভাসিত

করে তোলাই আবদুল মান্নান সৈয়দের লক্ষ্য, তাই জীবনানন্দ কবিমানসের অন্তর্মুখী প্রবণতা এবং চেতনা, সেই সঙ্গে তাঁর বিশুদ্ধ শিল্পগত ধ্যান-ধারণা অর্থাৎ কবিতাশিল্প জীবনানন্দে কিভাবে গড়ে উঠেছে, সমসাময়িকদের প্রভাববলয় থেকে কিভাবে বেরিয়ে এসে তিনি নিজের শিল্প ভুবন গড়ে নিয়েছেন, তাই স্তরে স্তরে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দের শিল্পধারণা---বিশেষভাবে কবিতা শিল্পের গঠন ও উৎসারণ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ববোধ ও মনোভঙ্গী তাঁর কাব্য-শিল্পের রসাস্বাদন এবং শিল্প রূপের বিচার-বিবেচনায় নিশ্চিতরূপেই সহায়ক। অন্তর্বৃত্তি-বহির্বৃত্তির সমস্যা কিভাবে জীবনানন্দে রূপ পেয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত অন্তর্বৃত্তিই জীবনানন্দকে অধিক অধিকার এবং গ্রাস করেছে তা' অনুধাবনের জন্যেও জীবনানন্দের শিল্পগতবোধ এবং ধ্যান-ধারণা সহায়ক। আগেই বলেছি, জীবনানন্দ কবিতায় জীবন ও জগতের সব কিছুই ছাড়পত্র দিতে রাজি, কিন্তু ঠিক হুবহু জীবন ও জগতের প্রতিরূপ হিসাবে নয়, সামাজিক কিংবা মানবিক কল্যাণ সাধনের অভীপ্সায়ও নয়, চেতনার কারুকাজ হিসাবে—শিল্পের উদ্ভাসন এবং উৎসারণ হিসাবে, কারণ, তিনি জানেন 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুই রকম উৎসারণ।' এই অনুভূতির দরুনই জীবনানন্দ শিল্পের দাবী হয়েছে মুখ্য, রূপরচনায় শিল্পিত বিন্যাসের সৃজনী প্রয়াস পেয়েছে প্রাধান্য। তাই আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন:

> শুধু মাত্র কবিতা ও কবিতা বিষয়ক ভাবনা বেদনায় নিবেদিত এই কবি যেন কবিতা সুন্দরীর কাছেই আপাদমাথা বিক্রয় করে বসে আছেন। (পৃ: ১৫)

জীবনের দাবীর প্রতি পিঠ ফিরিয়ে নয়, বরং এইসব দাবীকে অঙ্গীকার করে নিয়ে এবং শিল্পের দাবীকে অধিক মূল্য দিয়ে জীবনানন্দ ক্রমাগত একটি নিজস্ব রীতিভঙ্গী গড়ে তোলার দিকে নিবিষ্ট হয়েছেন, তাই কেবলমাত্র শিল্প এবং বিশুদ্ধ শিল্পই হয়েছে তাঁর অভীষ্ট। এ-কারণেই সব কিছুকেই প্রত্যক্ষ করার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টি জীবনানন্দকে গড়ে নিতে হয়েছে। এই জীবনানন্দীয় কবিদৃষ্টির পরিচয় দিতে গিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ লিখেছেন:

এই-তো জীবনানন্দ, যিনি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিস্থাপনা করেন না কিছুতেই—

নদী জলের ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করেন শম্বর-নীল গাই-হরিণের যাতায়াত, কিংবা চিতল-হরিণীর স্থিরমূর্তি। এই স্থৈর্য-চাঞ্চল্য নদীজলে নয়, কবির হৃদয়-দর্পণের মধ্য দিয়েই প্রতিফলন স্বীকার করে নেয়।

(পৃঃ ১৪)

শুধু কি তাই, নিজের স্বপ্ন-কল্পনা, ভাবনা-বেদনা ও সৌন্দর্য-কল্পনাকে ভাষা দেবার জন্যে জীবনানন্দ :

নিজের জন্যে বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি নব্য শব্দান্বয়---নতুন ললিত মধুর মোহন শব্দাবলি এনে ঘর সাজিয়েছিলেন। মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতার সময় ভাষা থেকে জীবনানন্দের কবিতার সময় ভাষা স্বাতন্ত্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; - - -আবার মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতা-নায়িকা থেকে জীবনানন্দের কবিতা-নায়িকা খুব স্বাভাবিকভাবেই পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। - - -আমরা দেখেছি বর্ণ ও শব্দ ব্যবহারে তাঁর সঞ্জীবনী সার্থকতা। - - -উপমাতেই কবিত্ব জীবনানন্দের এই এ্যারিষ্টটলীয় সিদ্ধান্তের পটপরিসরে তাঁর কবিতা স্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর অবিরল উপমা প্রয়োগের একপাশে আছে নূতন দৃষ্টিগ্রাহ্য উপমা, অপর পাশে আত্মিক উপমা---যার সৃজনে বাংলা কবিতাবহে জীবনানন্দ একক ও তুলনাহীন,- - -অথচ যে সাহজিক সাধনা ইএটস-এর কাব্যে দ্রষ্টব্য, জীবনানন্দে তার স্থান দখল করেছে স্বসমুখ উৎসারণ। স্বতঃস্ফূর্তির এই সাক্ষ্য রয়েছে কবির অন্তমিল বিন্যাসে : অধিকাংশক্ষেত্রে মিলের অনিয়মিতিকেই নিয়মে দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন তিনি---স্বভাবী এই মিল-পদ্ধতি অনেক জায়গায় দুই লাইনে স্তব্ধ হয়ে যায়নি, তিন লাইনের ত্রিত্ব মিলে পর্যবসান মেনেছে যদিও কোনো নিয়ম সৃষ্টি না করে। - - -অথচ এরই ভিতরে কোথাও-কোথাও অনুসৃত মিল বিন্যাসের দূররীতি। - - -প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামণ্ডল নিঃসৃত হয়ে এসেছে তাঁর কবিতা। - - -উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, নরত্বারোপ। আর চিত্রকল্প? কথা বললেই তিনি চিত্রকল্পের ইন্দ্রজাল সৃজিত হয়ে যায়। আছে কল্পনার সর্বমুখ সচ্ছলতা : পরাবস্তবতার ব্যবহার কবিতা সত্যের ব্যবহার। - - -আবৃত্তপদ, গীতলতা, চিত্রলতা---সব ক্রমশঃ স্তিমিত শমিত হয়ে এসেছে জীবনানন্দের কবিতাধারায়। এ শুধুমাত্র

> বহিঃসমর প্রভাবের ফল নয়, কবির আন্তঃসময় সম্পাতীও বটে : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি অনুভূতির শবলিত ইন্দ্রধনু এক একটি রং ঝরিয়ে দিচ্ছিলো যেন। দেখা দিয়েছে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার, কবিতার বাণীবিন্যাসে গদ্যভঙ্গি। (পৃঃ ১৪-২০)

সংক্ষিপ্তরূপে—কোথাও কোথাও বা একটি কি দুটি বাক্যবন্ধে এবং বিশেষণ প্রযুক্ত-শব্দে আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দ দাশের কবিমানস কবি স্বভাব, কাব্যশিল্পও 'স্বরূপ হেঁকে তুলতে চেয়েছেন। বস্তুতঃ উপরে তাঁর বক্তব্যের যে উদ্ধৃত রেখারূপ তুলে ধরা হয়েছে তাতে তিনি জীবনানন্দের যে কবিচারিত্র্য বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করেছেন তা এক অর্থে যে কোন সৃজনশীল কবি শিল্পীরই চারিত্র্য এবং শিল্প-লক্ষণ। শব্দ-ব্যবহারে, ভাষা-নির্মাণে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প রচনায় জীবনানন্দের 'বিশিষ্টতা, এবং শিল্পরূপের বিশেষ সার্থকতা কোথায় তার কিছুটা ইঙ্গিত ইশারা মান্নান সৈয়দ প্রথম পরিচ্ছেদেই দিয়েছেন। কিন্তু এসবের বিস্তৃত উপস্থাপনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং কবিতা-নির্ভর আলোচনা স্থান পেয়েছে ভিন্ন-ভিন্ন পরিচ্ছেদে। বর্ণ, শব্দ, একটি অব্যয় নিয়ে, বাংলা ছন্দোমুক্তি ও জীবনানন্দীয় সূত্র, ইংরেজী কবিতা ও জীবনানন্দ, কল্পনার তিন কণ্ঠ, কবিতাসত্য, পরাবাস্তবতা, ইতিহাস-ভূগোলের শোভাভূমি ইত্যাদি শিরোনামের আলোচনায় জীবনানন্দীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় অপেক্ষাকৃত ব্যাপক পটভূমিতে তুলে ধরা হয়েছে। অবশ্য প্রথম পরিচ্ছেদে 'শুদ্ধতম কবি'র পরিচয়-রেখা নির্মাণের সময়েও আবদুল মান্নান সৈয়দ এ-সবের সংক্ষেপিত প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে ভোলেননি। কবির প্রধান কাজ শিল্পরচনা—অর্থাৎ রূপনির্মাণ। এই নির্মাণে কবির অবলম্বন শব্দ—প্রাণহীন নিরুত্তাপ শব্দ নয়, শব্দের সাহায্যেই কবি রূপ রচনা করেন, চিত্ররূপ ফুটিয়ে তোলেন। চিত্ররূপময়তার দিকে জীবনানন্দের বিশেষ আকর্ষণ ও প্রবণতার পরিচয় দিতে গিয়ে আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন :

> জীবনানন্দ দাশ, যাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে রূপের প্রতি সম্মান প্রকাশিত, স্বাভাবিক ভাবে ঐ বর্ণময় বর্ণের দ্যুতিময়তা আরাধ্য হবে তাঁর। তাঁর যাবতীয় কবিতায় উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষিত, বিশেষতঃ

রূপবান কবিতা নিচয়ে একটি উজ্জ্বল-কোমল বর্ণ ব্যবহৃত। কবির বিভিন্ন কাব্যপর্যায় থেকে উপযুক্ত রূপবান কবিতার একটি চয়নিকা তৈরি করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে সাক্ষ্য। (পৃঃ ২৩)

তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে সাক্ষী হিসাবেই মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দের কিছু কবিতাংশ উপস্থিত করেছেন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর কবিতায় 'বর্ণময় বর্ণের দ্যুতিময়তা' কিভাবে রূপ পেয়েছে, তা দেখিয়েছেন। আসলে বর্ণময়তার প্রতি জীবনানন্দের আকর্ষণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এবং 'বনলতা সেন'-এ বিশেষ দৃষ্টিগ্রাহ্য হলেও, প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'-এ তার সূচনা। 'মধ্যনিশীথের নীল,' 'হে নীলিমা নিষ্পলক' 'ডুবে যায় নীলিমায়' 'শঙ্খশুভ্র মেঘপুঞ্জ' 'ধবল কাশের দলে' 'কোন্ এক সুনীল দরিয়া' 'সবুজ ঘাসের কোমল গালিচা পাতি' 'রাঙা নার্গিস কালো পশ্‌মিনা চুলে'—নানা রঙের এরকম উল্লেখ ও বিচিত্রবিধ ব্যবহার জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' এ দৃষ্টিগ্রাহ্য। বস্তুতঃ, রঙ এবং বর্ণের প্রতি আকর্ষণ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং নজরুল ইসলামে প্রবল। রূপচেতনা যেমন এঁদেরকে 'বর্ণময় বর্ণের দ্যুতিময়তা'র দিকে টেনেছে, তেমনি কবি-কল্পনাও রঙের রাজ্যে নিয়ে গেছে। বিশেষতঃ নজরুলে বর্ণের প্রতি আকর্ষণ জন্মেছে সম্ভবতঃ অনেকটা ফারসী কবিতার ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারসূত্রে। রঙ ও বর্ণের বিভাস ফারসী কবিতার শুধু কবি-কল্পনার ঐশ্বর্যের পরিচয়বাহী নয়, বরং সজীবতারই দ্যোতক। সত্যেন্দ্রনাথ বিশেষতঃ মোহিতলাল ও নজরুলের রঙ ও বর্ণের ব্যবহার অনেকখানি অলংকারিত, কিন্তু জীবনানন্দের তুলনামূলকভাবে নিরাভরণ। এর মূলে কাজ করেছে জীবনানন্দের শব্দ চয়ন ও ব্যবহার কৌশলের ভিন্নধর্মিতা। নজরুলের কিশোর কালের কবিতাতেই রং ও বর্ণের সমাবোহ লক্ষ্য করা যায়: 'পানের পিকে রাঙা হিঙুল বরণ/আকুল অধর আলতা রাঙা চরণ,' কিংবা 'কালো আমি'র হ'ল সুন্দরী এক মেয়ে/রঙটি গো তার হিঙুল-বরণ দুধে আলতার চেয়ে/বনের মেয়ে বাহির হল সেজে সবুজ ভূষায়/আঙুর-পাকা লাবণ্য আর ডালিম ফুলের লাল/আসমানী নীল ফিরোজা রং ছিল তোমার তনু ঘিরে।' পরবর্তীকালের কবিতায়: 'আসমানের ঐ আঙরাখা/খুন-খারাবীর রঙ-মাখা,' 'আসমানে ঐ ভাসমান

যে মস্ত দুটো রং-এর তাল/একটা নিবিড় নীল সিয়া আর একটা খুবই গভীর লাল'---কিংবা দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুশীতে সে বাগে-বাগ,/ পশ্চিমে নীল 'লোহিতে'র খুন জোশীতে রে লাগে আগ,/মরু সাহারা গোবীতে সবজার জাগে দাগ।' উদ্ধৃত কবিতাংশের কোনটিই প্রত্যক্ষতঃ রং বা বর্ণের সমারোহের কিংবা রূপচিত্র রচনার কবিতা নয়, কিন্তু কল্পনা-প্রতিভার ঐশ্চর্য এবং প্রাণ-সজীবতার প্রয়োজনেই এসবে রঙ ও বর্ণের অমন ব্যবহার। জীবনানন্দে প্রথম দিকের কবিতায় রং ও বর্ণ অনেকটা এভাবেই এসেছে, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি কবিতাকে চিত্ররূপময় করে তুলতে গিয়ে রং ও বর্ণের ভিন্নরূপ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সেখানেও 'নীল 'সবুজ' 'হলুদ' এসবেরই পৌনঃপুনিক প্রাধান্য। আলংকারিকতার বদলে নিরাভরণতার দিকে, উজ্জ্বল কোমলতার দিকে জীবনানন্দের দৃষ্টি ছিল প্রোথিত। আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর আলোচনায় যে-কয়টি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন তাতেও এর পরিচয় মিলে। 'বর্ণে'র আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি শব্দ-ব্যবহাররীতি এবং বিশেষতঃ 'যুক্তবর্ণ' ব্যবহারের জীবনান্দীয় কৌশল সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গটিই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে 'বাংলা ছন্দোমুক্তির জীবনানন্দীয় সূত্র' শীর্ষক পরিচ্ছেদে। যুক্তবর্ণের ব্যবহার প্রসঙ্গে মান্নান সৈয়দ বলেছেন:

> যুক্তবর্ণের বিরলতা জীবনানন্দ দাশের কবিতার অপর একটি সাধারণ লক্ষণ। তাঁর টানা ও এলানো ভঙ্গিতে এই যুক্তবর্ণবিরলতা একটি সুর সৃজন করেছে; এমনকি যুক্তবর্ণকে অনেক সময় ভেঙে স্বতন্ত্র বর্ণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়: এটা তাঁর শ্রুতিবিশুদ্ধতাই প্রমাণ করে। (পৃঃ ২৪)

লক্ষণীয় যে, জীবনানন্দের কবিতায় 'টানা ও এলানো' ভঙ্গিটি তাঁর পরবর্তী কাব্যসাধনায় ক্রমান্বয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে। 'ঝরাপালক'-এ কোনো কোনো কবিতার ক্রমপরিবর্তমান কবিমানসের লক্ষণ হিসাবে যদিও তা দৃষ্টিগ্রাহ্য। তাঁর প্রথম-পর্বের কবিতায় অলংকরণপ্রবণতার অনুষঙ্গ হিসাবে শব্দ-চয়ন রীতিও হয়েছে অনুরূপ। ধ্বনি-গাম্ভীর্য, এবং শব্দের ব্যঞ্জনার বদলে ওজনের দিকেই এ-সব কবিতায় জীবনানন্দের দৃষ্টি:

বসুধার অশ্রু-পাংশু আতপ্ত সৈকত, / ছিন্নবাস, নগ্নশির ভিক্ষুদল,

নিষ্করুণ এই রাজপথ,/ লক্ষকোটি মুমুক্ষুর এই কারাগার,/ এই ধূলি,---ধূম্রগর্ভ বিস্তৃত আঁধার/ডুবে যায় নীলিমায়,/---স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখিপাতে/--শুভ্র মেঘপুঞ্জ, শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে; / ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক, /তোমার চকিত স্পর্শে হে অতন্দ্র দূর কল্পলোক।

[নীলিমা]

এ-ধরনের কবিতায় গুরুগম্ভীর এবং 'ওজনদার শব্দ-সমবায় শব্দাড়ম্বরেরই জন্ম দিয়েছে, জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য যে নিমজ্জমানতা---তা এ'তে কোনো-রূপ রসাবেশ সৃষ্টি করে নি। অথচ এই কাব্যগ্রন্থেই জীবনানন্দের পরিবর্তিত কবি-স্বরূপের লক্ষণ দেখা গেছে কোনো কোনো কবিতায়:

১। ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,/---ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার---/রাঙা আপেলের মত লাল যার গাল/চুল যার শাঙনের মেঘ--আর আঁখি/গোধূলির মত গোলাপী রঙিন/, আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে--স্বপ্নে কতদিন

২। সেদিন এ ধরণীর/সবুজ দ্বীপের ছায়া---উতরোল তরঙ্গের ভিড় মোর চোখে জেগে' জেগে ধীরে ধীরে হোল অপহৃত,---/কুয়াশায় ঝরে-পড়া আতসের মত।

'ঝরাপালক'-এর দুটি কবিতাংশ থেকে যে উদ্ধৃতি উপস্থিত করা হলো, তা থেকে স্পষ্টই অনুভব করা যায় যে, জীবনানন্দ ক্রমান্বয়ে যুক্তবর্ণের ব্যবহার কমিয়ে, কথ্যরীতির শব্দ ও বাক্যবন্ধের মধ্যে সাধুরীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে তাঁর কবিতার 'টানা ও এলানো' ভঙ্গিটি গড়ে তুলেছেন। শুধু জীবনানন্দে নয়, সমসাময়িককালে রচিত অজিত দত্তের কোনো কোনো কবিতায়ও এই সাধুরীতির ব্যবহার, এলানো-টানা ভঙ্গি এবং রূপকথার রাজ্যে মানসপরিভ্রমণ লক্ষণীয়। উদাহরণ:

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপঙ্খী নাও,/যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,/ কুঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে/চুল এলায়েছে যেথা, কালো আঁখি সুদূরে উধাও,

[পাশাবতী]

আবদুল মান্নান সৈয়দ ছন্দের আলোচনায় যেমন তেমনি 'শব্দ'—এর আলোচনায়ও জীবনানন্দ দাশের বিশেষ মানসপ্রবণতার বিশিষ্টতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি অবতারণা করেছেন কিছুটা তুলনামূলক আলোচনার। রূপান্বেষী কবি জীবনানন্দ দাশের শব্দ-চয়ন ও শব্দ-ব্যবহার প্রসঙ্গে মান্নান সৈয়দের মন্তব্য :

> জীবনানন্দের চয়নিকায় ছিলো ললিত, মধুর, রঙিন শব্দ—কেবল তার বিন্যাস সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল থেকে আলাদা ও নিজস্ব। এই পৃথকতার মূল অবশ্য বিভিন্ন বিষয়-প্রবেশের কারণে।
> (পৃঃ ২৭)

জীবনানন্দের গুরু-গম্ভীর ও ওজনদার শব্দচয়নের বদলে কিভাবে ললিত মধুর-রঙিন শব্দচয়নপ্রবণতা প্রশ্রয় পেয়েছে তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি। মান্নান সৈয়দও সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুলের কবিতাংশের পাশাপাশি জীবনানন্দের কবিতাংশ উদ্ধৃত করে স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং বলেছেন :

> জীবনানন্দীয় আলাদা বিন্যাসের দুটি উপকরণ লভ্য ক্রিয়াবাচক শব্দ ও বিশেষণ শব্দের নূতন ও বিস্ময়কর ব্যবহার। বাংলা ক্রিয়াপদের দীনতা, অন্তত এই একজন কবি, খানিকটা ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দেশজ শব্দব্যবহার যেমন তেমনি দেশজ ক্রিয়াপদ প্রয়োগও কবি শিল্পদক্ষ : জীবনানন্দ ক্রিয়াপদ দু'রকম প্রয়োগ করেছেন : একদিকে দেশজ ক্রিয়াপদের সুপ্রয়োগ , আর-দিকে সব রকম ক্রিয়াপদের অপ্রত্যাশিত অপিচ অনুপম প্রয়োগ। (পৃঃ ২৭-২৯)

এ-প্রসঙ্গেই মান্নান সৈয়দ বিশেষণ-প্রযুক্তির জীবনানন্দীয় বিশিষ্টতার আলোচনা করেছেন, শব্দান্বয়ের নূতন কুশলতা অর্থাৎ যাকে বলে বিচ্ছিন্ন অনেক সময় বিরোধী-বিপ্রতীপ, উদাহরণ-মালার একত্রসন্নিপাত, তা উদাহরণসহযোগে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, কাব্যরচনার প্রাথমিক পর্বে জীবনানন্দ-সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের দ্বারা বিশেষভাবে আশ্লিষ্ট—বলা যেতে পারে মোহিত-প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিশেষতঃ উপজীব্য বিষয় নির্বাচন ও আহরণে, ছন্দো-নির্মাণে, শব্দব্যবহারে, উপমা উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্প নির্মাণে এবং রীতিভঙ্গীর

অনুসরণে নজরুলের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মনে হয় নজরুলীসূত্রেই 'বিচিছন্ন'—অনেক সময় বিরোধী-বিপ্রতীপ উদাহরণ মালার একত্রসন্নিপাতের এই মানস-প্রবণতা জীবনানন্দে বর্তেছিল। 'বিদ্রোহী' কবিতার ব্যক্তিসত্তার প্রতীকে এবং প্রথম-পুরুষে আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে নজরুল এমনিভাবে বিচ্ছিন্ন, অনেক সময় বিরোধী-বিপ্রতীপের সন্নিপাত ঘটিয়েছেন। একই উচ্চারণে তিনি বলেছেন: আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি শ্মশান/আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন/আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা, আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি/আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর আমি শ্যামলিমা ছায়া-ছবি'—এমনি ধরনের বিরোধী-বিপ্রতীপের অজস্র সমাহার 'বিদ্রোহী'তে লক্ষণীয়। জীবনানন্দে এসবের উদাহরণ উপস্থিত করতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ উদ্ধৃত করেছেন সে-সব দৃষ্টান্ত সেগুলো আসলে কবির ঐশ্বর্যপূর্ণ শব্দভাণ্ডারের পরিচয় যতখানি না, তার চেয়েও বেশী আধুনিক জীবনচেতনা ও মানস-সজাগতার। পানগাছ, ঘোলামদ, বেশ্যালয়, সেঁকো-কেরোসিন কিংবা গন্ধর্ব, নাগ, কুকুর, কিন্নর, পঙ্গপাল ইত্যাদি কাব্যে কোনো অভিনব শব্দব্যবহার নয়, যদিও বিরোধী-বিপ্রতীপের একত্রসন্নিপাতের উদাহরণ। জীবনানন্দের শব্দ-সম্পদের কথা বলতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ দেশজ-শব্দ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যদিও জনসমাজে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দের উল্লেখ করেন নি। অথচ শুধু শব্দ-ব্যবহারে নয়, উপমা চিত্রকল্পেও জীবনানন্দ নজরুলের মতোই এই ঐতিহ্যের নিপুণ ব্যবহার করেছেন, অবশ্য পরবর্তীকালে জীবনানন্দে এর তেমন ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায়নি। 'শাঙন-দরিয়া,' 'স্বপন-সুরা,' 'রেখেছি দিওয়ানা করে' 'নাচে জিঞ্জির' 'খেয়ালের খোশ পেয়ালা' 'গজল গানের রেওয়াজ' 'খুন রোশনাই' এমনি ধরনের অজস্র শব্দের ব্যবহার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় রয়েছে। এমন কি 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন:

> মহামৈত্রীর বরদ তীর্থে-পুণ্য ভারতপুরে, পূজার ঘণ্টা মিশিছে হরষে নামাজের সুরে সুরে। /আহ্নিক হেথা সুরু হয়ে যায় আজান বেলার মাঝে,/মুয়াজ্জেনদের উদাস ধ্বনিটি গগনে গগনে বাজে;/জপে ঈদ-গাতে তসবী ফকির, পূজারী মন্ত্র পড়ে,/সন্ধ্যা উষায় বেদবাণী গায়

কোরানের স্বরে স্বরে ;/সন্ন্যাসী আর পীর/মিলে গেছে হেথা,—মিশে গেছে হেথা মসজিদ, মন্দির।

অন্য একটি কবিতায় আছে :

দীর্ঘ দিবস ব'য়ে গেছে যারা হাসি অশ্রুর বোঝা/চাঁদের আলোকে ভেঙেছে তাদের রোজা ;/আমার গগনে 'ঈদরাত' কভু দেয়নি যে হায় দেখা,/পরাণে কখনো জাগেনি 'রোজা'র ঠেকা।

[জীবন-মরণ দুয়ারে আমার]

কাব্যে বিষয়-অনুসারে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথ মোহিতলালে সুপ্রচুর ; কিন্তু জীবনানন্দ-কাব্যে অনুরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্ত যে উল্লেখনীয় তাও আমরা লক্ষ্য করলাম। আবদুল মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দের শব্দ-ব্যবহারের যে নিপুণ ও ব্যাপক আলোচনা করেছেন তাতে এ-দিকটির আলোচনা'ও প্রত্যাশিত ছিল।

আবদুল মান্নান সৈয়দ 'একটি অব্যয় নিয়ে' শীর্ষক পরিচ্ছেদে জীবনানন্দের কবিতায় 'তবু'—এই অব্যয়ী শব্দের ব্যাপক ও বিচিত্রবিধ ব্যবহারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। 'তবু' অব্যয়ী শব্দটি অনেক সময় 'এইসব সত্ত্বেও' কথাটির স্থান দখল করে—বিশেষত বিশ্লেষণমুখী রচনায়। আবদুল মান্নান সৈয়দ: 'তবু তাঁর মানসতা ছিলো সরলরৈখিক—আত্ম-দ্বৈরথদীর্ণ নয়,' (পৃঃ ৩৩)। কবিতা বিশ্লেষণধর্মিতার চারিত্র্য অর্জন করলেই সাধারণতঃ 'তবু' কিংবা 'হয়তো' জাতীয় শব্দের সহায়তা গ্রহণ করে—কখনো কখনো সন্দেহ-কে চারিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনেও এমন ব্যবহার অপরিহার্য হয়। জীবনানন্দ কেন কাব্যে 'তবু' ব্যবহার করেছেন এবং পৌনঃপুনিকভাবেই ব্যবহার করেছেন তা কবির অন্তর্লোক-মনোলোকের গভীরে আলো ফেলে মান্নান সৈয়দ দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে হয় না যে এই 'তবু' অব্যয়ী শব্দের ব্যবহার 'এই সব সত্ত্বেও' কিংবা বিপরীত ঘটনাক্রমের বিবরণ হিসেবে নিছক ব্যবহারের জন্যেই ব্যবহৃত না হয়ে অধিক কোনো তাৎপর্য বহন করে এনেছে। বরং মনে হয় এই ব্যবহাররীতির একঘেঁয়েমী কবিতাকে করে তুলেছে কিছুটা ক্লান্তিকর। কবিতায় 'টানা-এলানো' ভঙ্গির প্রশ্রয়ই 'তবু' অব্যয়ী-শব্দের অমন পৌনঃপুনিক ব্যবহারের জনয়িত্রী কিনা তা-ও অবশ্য

ভাববার বিষয়। প্রথমদিকে বর্ণনায়ই জীবনানন্দের অধিকতর তৃপ্তি, বর্ণনা থেকে তিনি ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণের দিকে ঝুঁকেছেন। তার সূচনা-পর্বের কবিতায় 'তবু' জাতীয় অব্যয়ী শব্দের ব্যবহার প্রশ্রয় পায়নি, যদিও 'হয়তো' এই সন্দেহ-সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক ইতিহাস-চেতনায় নয়, বলা যেতে পারে কল্পলোকে মানস-পরিভ্রমণসূত্রে এক ধরনের অতীত-যাত্রায় জীবনানন্দ দাশ উচ্চারণ করেছেন:

> সেদিনও এমনি মেঘের আসরে জ্বলেছে পরীব বাসরবাতি,/হয়তো সেদিনও ফুটেছে মোতিয়া, ঝরেছে চন্দ্রমল্লী পাতি।/হয়তো সেদিনও নেশাখোর মাছি গুমরিয়া গেছে আঙুর বনে,/হয়তো সেদিনও আপেলের ফুল কেঁদেছে আকুল হাওয়ার সনে।
>
> [চাঁদিনীতে]

বর্তমানের পটে জেগে 'চাঁদনীতে' কবি উপলব্ধি করেছেন এই সত্য; এই ইতিহাস সত্য:

> বেবিলন কোথা হারায়ে গিয়েছে,---মিশর-'অসুর' কুয়াশা কালো,/ চাঁদ জেগে আছে আজো অপলক,---মেঘের পালকে ঢাকিছে আলো।/ সে জানে কত পাথরের কথা, কত ভাঙা-হাট মাঠের স্মৃতি।/কত যুগ কত যুগান্তরের সে ছিল জ্যোৎস্না, শুক্লা-তিথি '

'ইতিহাস-ভূগোলের শোভাভূমি'র আলোচনা এবং বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মান্নান সৈয়দ বলেন: মোহিতলালের স্বপ্নের একাংশও দেখা গেলো ইতিহাসে প্রোথিত, যেমন নজরুলেরও একভাগ। এঁদের এই ইতিহাস ভূগোল-বিহার অধিকাংশ সময়ে আরব্য পারস্য সন্দীপনে উজ্জ্বলিত। খানিকটা জ্ঞান থেকে (সত্যেন্দ্রনাথে প্রধানতঃ), খানিকটা সংবাদচাঞ্চল্য (নজরুলে প্রধানত), খানিকটা স্বপ্নাকাঙ্খায় (মোহিতলালে প্রধানতঃ)---এঁরা ইতিহাস-ভূগোলের নব-নবীন পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত কাজ করেছিলো এক স্বপ্নাভাস, এক কল্পলোকের নিমন্ত্রণ। এই স্বপ্নকল্পনালোকে জীবনানন্দ দাশও ছিলেন নিমন্ত্রিত।- - -ব্যাবিলন-মিনেভ-এর স্বপ্ন তাঁর তৎকালীন কবিতাতেই (ঝরাপালকে) মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।'' বনলতা সেন' কবিতায় জীবনানন্দ বলেছেন, হাজার বছর ধরে আমি পথ

হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে/সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে/অনেক ঘুরেছি আমি/বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে/সেখানে ছিলাম আমি/আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে।' কিন্তু তুলনায় 'ঝরাপালক' পর্বের কবিতায় জীবনানন্দ দাশের ইতিহাস-ভূগোলের পরিধি ছিল আরও ব্যাপক, তাই তিনি ব্যক্তিস্বরূপে উচ্চারণ করেছিলেন: 'আমারে দেখেছে সে যে আসীরীয় সম্রাটের বেশে/আমি ছিনু 'ক্রুবেদুর' কোন দূর 'প্রভেন্স' প্রান্তরে/স্পেইনের 'সিয়েরয়ে' ছিনু আমি দস্যু-অশ্বারোহী।---কিন্তু তা-সত্ত্বেও বিশ্বের প্রান্তর থেকে বাংলার প্রান্তরে ছিল তাঁর পরিক্রমা। বাংলার মাঠে-ঘাটে ফিরেছিনু বেণু হাতে একা/গঙ্গার তীরে কবে কার সাথে হয়েছিল দেখা।'

লক্ষণীয় যে, বিশ্ব ইতিহাস-ভূগোল আর ঐতিহ্যের পরিক্রমা থেকে তিনি ক্রমান্বয়ে এসেছেন ভারতীয় ইতিহাস-ভূগোল ও ঐতিহ্যের পটে, ক্রমে ক্রমে একেবারে বাংলার প্রান্তরে। এই পরিক্রমা ও প্রত্যাবর্তনের স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ বলেছেন: 'উজ্জ্বল এক দীর্ঘশ্বাস, এক নস্টালজিয়া, 'রূপসী বাংলা' প্রাক্তন-ধূসরতাকে যেন রূপসী করে তুললো। ইএটস যেমন একদিন আয়ার্ল্যাণ্ডের দেশ-পুরাণকে ব্যাপক গভীর-ভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, জীবনানন্দ তেমনি 'রূপসী বাংলা'র 'চারিদিকে বাঙালীর ভিড়/বহুদিন কীর্তনভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচা-লীর/পরম নিবিড় ছন্দে,' ধ্বনিত ঝঙ্কৃত করে তুলেছেন। ঠিক শিক্ষিত লোকের নয়---বাংলার সব লোকজ কল্পকাহিনী ভিড় করে এলো: ফড়িং কাঁচপোকা-প্রজাপতি আর আম-লিচু-কাঁঠালের উজ্জ্বল-চঞ্চল পটভূমিকায় আস্তীর্ণ হয়ে এলো লোককাহিনীর ধনপতি-শ্রীমন্ত বেহুলা-লহনা আর রূপকথার কঙ্কাবতী-শঙ্খমালা-চন্দ্রমালা-মানিকমালা। সমস্তে জুড়ে রইলো ইএটস-এর মতো নাট্যিক-কবির নয়---লিরিক-কবির এক স্বপ্নকল্পনা, এক বিষাদবাতাস। এবং এরই ভিতর দিয়ে জীবনানন্দ সম্পন্ন করলেন ইএটস-প্রোক্ত 'আধুনিক মানসের আত্ম-আবিষ্কার। (পৃ: ১১)

কিন্তু লক্ষণীয় যে, ইয়েটস যেভাবে আয়ার্ল্যান্ডের 'দেশপুরাণকে' ব্যাপকভাবে বলতে গেলে কেলটিক সংস্কৃতিকে কাজে লাগিয়েছেন, 'রূপসীবাংলা'র কবি জীবনানন্দ অন্তত: 'রূপসী বাংলা'য় ঠিক সেভাবে কাজে লাগান নি। রূপসী বাংলায় নস্টালজিয়া, স্মৃতিচারণ, বিষাদ-বাতাস

এবং সর্বোপরি প্রাক্তনে নিমজ্জমানতা আছে, কিন্তু ইয়েটসের কাব্যের মতো নতুনের পটে পুরাতনের উত্তেজনা কিংবা উজ্জীবন নেই। জীবনানন্দ যেখানে নস্টালজিয়া-আক্রান্ত, সৌন্দর্য ও স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পিত, সেখানে ইয়েটস 'আধুনিক মানসের আত্ম-আবিষ্কার'এর সাথে সাথে কালসচেতনতা এবং নবজীবনবোধ উজ্জীবিত। যে-অর্থে ইয়েটসে রেনেসাঁস বর্তমান, সে-অর্থে জীবনানন্দে কোনো নবনির্মাণ নেই। রূপকে-প্রতীকে ইয়েটস প্রাক্তন এবং পুরাণের পটে বর্তমান জীবন-অভীপ্সা রূপায়িত করেছেন, কিন্তু জীবনানন্দে বর্তমান কালের মানুষ অনুপস্থিত। ইয়েটস যে-ভাবে লোক-কাহিনীকে বর্তমান জীবনচেতনার বাণী-বাহক করে তুলেছেন, লিরিক-কবি জীবনানন্দ সেভাবে লোক-পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটাননি। আবদুল মান্নান সৈয়দ উভয়ের কবি-চারিত্র্য, মানসপ্রবণতা এবং পুরাণের নবরূপায়ণ-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য-বিষয়ে শুধু ইঙ্গিতধর্মী নয়, কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করলে প্রতি-তুলনার সাদৃশ্য-সূত্রটি আরও স্পষ্ট হতে পারতো। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল- নজরুলের 'ইতিহাস-ভূগোলের' বিহার প্রসঙ্গে মান্নান সৈয়দ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন---তাঁর মন্তব্য এতটা সংক্ষিপ্ত এবং ইঙ্গিতময় যে, এতে তাঁদের 'ইতিহাস-ভূগোল' বিহারের প্রকৃতি স্পষ্ট হয় নি। নজরুলের 'ইতিহাস ভূগোল' বিহার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য: "খানিকটা স্বপ্নাকাঙক্ষায় (মোহিতলালে প্রধানত), এঁরা ইতিহাস-ভূগোলের নব-নবীন পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন।"---কিন্তু এই উচ্চারণে তিন-কবির পরিক্রমা-পথ ও পদ্ধতির স্বরূপ স্পষ্ট হয় না। বিশেষতঃ নজরুল 'খানিকটা সংবাদচাঞ্চল্যে' ইতিহাস-ভূগোল-বিহারে গেলেও তা নিছক স্বপ্নাকাঙক্ষার মধ্যেই সীমায়িত নেই। নজরুল ইতিহাস-ভূগোলের পরিক্রমায় গেছেন ঐতিহ্যের শরণ নিয়েছেন শুধু স্বপ্নলোকে যাত্রা হিসাবে নয়, ইতিহাস ভূগোলের পটে বর্তমান জীবন-চেতনা ও সমস্যাকে রূপ দেবার জন্যে নব উজ্জীবনের আকাঙক্ষায়। বিশেষতঃ তাঁর আরব-পারস্য ভ্রমণ-কেন্দ্রিক কবিতায় স্বদেশের মানুষের উজ্জীবনের আকাঙক্ষা প্রবলভাবে স্ফুরিত। ইতিহাসের নায়কদের, বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার তিনি শরণ নিয়েছেন শুধু প্রশস্তি-রচনা কিংবা চরিত্র-চিত্রণের জন্যে নয়, বর্তমান কালের পটে নবচেতনার সঞ্জীবনের জন্যেও। এভাবেই তিনি সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। তাঁর ইতিহাস-ভূগোলের-বিহার নতুন তাৎপর্য অর্জন করেছে।

বিদেশী-কবিতার সমৃদ্ধ-অংশ কবি-মাত্রকেই উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত করে তাঁর কল্পনা-প্রতিভার বিকাশে সাহায্য জোগায়। শুধু উপজীব্য-বিষয়ের দিক থেকে নয়, এই পরিগ্রহণ রচনার আঙ্গিক এবং রীতিভঙ্গীর দিক থেকেও ধনাত্মক-বিবেচিত হতে পারে। বাংলা--কাব্যে সৃষ্টিশীল-পরিগ্রহণ শুধু মাইকেলকে নয়, রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্র-পরবর্তী-কবিদের মনো-বিকাশ এবং কল্পনা-প্রতিভার বিকাশ বিশেষভাবেই সহায়তা করেছে। নজরুলে ব্যাপকভাবে ফারসী কবিতার প্রভাব, কিয়ৎ-পরিমাণে ইংরেজী কবিতার এবং ত্রিশের কবিদের রচনায় ইংরেজী ও ফরাসী কবিদের প্রভাব মনোবিকাশের ধারায় এবং কল্পনার পাখা-বিস্তারে কিভাবে সহায়তা করেছে তা সুবিদিত। ইংরেজী-কবিতা বিশেষতঃ ইয়েটস, শেলী, কীটস, হুইটম্যান, অ্যালান পো, ডিলান টমাস-প্রমুখের কবিতা যে জীবনানন্দকে প্রভাবিত এবং নবসৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল তা সমালোচকেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে সম্ভবতঃ জীবনানন্দের এই 'পরিগ্রহণ' সম্পর্কে তথ্য-উপস্থাপনামূলক বিস্তারিত আলোচনা করেন। জীবনানন্দ দাশ-সম্পর্কিত দুয়েকটি দীর্ঘ-প্রবন্ধে মরহুম কবি হুমায়ুন কবিরও এ-বিষয়ে তীক্ষ্ণ-আলোকপাত করেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দ আলোচ্য গ্রন্থে ইংরেজী-কবিতা থেকে জীবনানন্দের পরিগ্রহণ বিষয়ে 'ইংরেজি কবিতা ও জীবনানন্দ' শীর্ষক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় ব্যয় করেছেন। বিষয়ের তাৎপর্যে এই পরিচ্ছেদটি নতুন নয়, তবে উপস্থাপনার স্বাতন্ত্র্যধর্মীরীতিতে এই পরিচেছদের আলোচনাও মনোজ্ঞ। যদিচ সংক্ষিপ্ত, তবুও পারস্পরিক ও তুলনামূলক আলোচনায় মান্নান সৈয়দ জীবনানন্দের কল্পনা-প্রতিভার বিকাশে, সৌন্দর্য-কল্পনার সংগঠনে কিভাবে ইংরেজী-কবিতার সমৃদ্ধ- অংশ সহায়তা করেছে এবং স্বীকরণের পথ দেখিয়েছে তা তুলে ধরেছেন। পরিশেষে তাঁর মন্তব্য :

> বিস্তীর্ণ এই প্রভাবপ্রচয় তাঁব নিজের ভিতর পরিপাক ক'রে নিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ ; তাই—যতো দিক থেকেই আলো এসে পড়ুক তাঁকে প্রকৃতিস্থ, স্বরচিত ও আত্মনিবাসী মনে হয়। (পৃঃ ৬২)

কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছে, ইংরেজী-কবিতার এই পরিগ্রহণ জীবনানন্দে সর্বক্ষেত্রেই যতখানি ঋণাত্মক হয়েছে, ঠিক ততখানি ধনাত্মক হয়নি, কারণ

প্রতি-তুলনায় এবং পাশাপাশি সংস্থাপনে লক্ষ্য করা যায়, কোন-কোন কবিতায় জীবনানন্দ যেন অনুবাদের ঊর্ধ্বে অন্য কোন তাৎপর্য কিংবা ব্যঞ্জনা উপস্থিত করতে পারেননি। কারণ, ইংরেজী-কবিতার ভাব বা বক্তব্যবিষয় স্বীকরণের ক্ষেত্রে সৃষ্টিধর্মী কবি জীবনানন্দ যদিও অনেক চমৎকার উপমা-উৎপ্রেক্ষা- চিত্রকল্প উপহার দিয়েছেন, তবুও মূল কবিতার বক্তব্য-বিষয়ই যেন অনূদিত হয়েছে বাংলা-কবিতাটিতেও। উদাহরণ: So the blindman sees best—ডিলান টমাসের এই গভীর ও ব্যাপক উপলব্ধির---ব্যঙ্গাত্মক উচ্চারণের অনুবাদ নয় কি জীবনানন্দের 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দ্যাখে তারা''---এই উপলব্ধি ও উচ্চারণ? নজরুলও হুইটম্যান থেকে অনুরূপ 'পরিগ্রহণ' করেছেন, কিন্তু নজরুলের বিশেষত্ব এই যে তিনি বক্তব্য বিষয়কে স্বদেশ ও স্বকাল-চেতনায় নতুনভাবে সংস্থাপিত করে নিয়েছেন। হুইটম্যানের Pioneer নজরুলে হয়েছে 'অগ্রপথিক'---কিন্তু নতুন কাল ও সমাজপটে সংস্থিত। জীবনানন্দে এই 'পরিগ্রহণ' এর ধনাত্মক-দিকটা মান্নান সৈয়দের আরও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ছিল।

জীবনানন্দের কবিতায় কিভাবে 'পরাবাস্তবতার' লক্ষণ সংক্রমিত হয়েছে সে-বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ পরাবাস্তবতার প্রকৃতি এবং চারিত্র্য লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন: 'স্বপ্ন, দিবা স্বপ্ন, কল্পনা, প্রকল্পনা, আকল্পনা; অচেতন থেকে জাগ্রত কখনো, কখনো চেতন-অচেতন-অবচেতনের তিন মানসকক্ষে নির্বাধ যাতায়াত; ফলত অনন্ক ও যুক্তিরহিত: এইসবই পরাবাস্তবতার পরম প্রসঙ্গ। --- পরাবাস্তব কবিতা ইমেজোচ্ছল, ব্যক্তিগত বাকপ্রতিমা ও বর্ণে, প্রাতিস্বিক উপমারূপকে ভরপুর।'' (পৃ: ৭২-৭৩) জীবনানন্দের কবিতায় পরাবাস্তবতাব সংক্রাম দেখাতে গিয়ে মান্নান সৈয়দ গেঅর্ক ট্রাকল-এর 'নৈশচিত্র এবং জীবনানন্দের 'রাত্রি' কবিতা দুটি পাশাপাশি উপস্থিত করেছেন--- প্রতিতুলনায় পরাবাস্তবতার সাযুজ্য অন্বেষণ করেছেন। কিন্তু কবিতা দুটি পাঠ করলে এই উপলব্ধি এবং বোধই মনে জন্মায় যে, জীবনানন্দের 'রাত্রি' কবিতাটি সুর-রিয়ালিজমের নয়, বরং বলা যেতে পারে রিয়ালিজমেরই এক মনোহর চিত্র। কারণ 'হাইড্রাণ্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল/একটি মোটরকারা গাড়লের মতো গেল কেশে/নিতান্ত

নিজের সুরে তবুও তো উপরের জানালার থেকে গান গায় / আধো জেগে ইহুদী রমণী / ফিরিঙ্গী যুবক ক'টি চলে যায় ছিমছাম থামে ঠেস দিয়ে / এক লোল নিগ্রো হাসে/ হাতের ব্র্যায়ার পাইপ পরিষ্কার করে'—এইসব বর্ণনা বস্তুতঃ নগরীর এক বাস্তব চিত্র। কবিতাটিতে মনোহর চিত্রকল্প : 'এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে / তিনটি রিকসা ছুটে মিশে গেল শেষ গ্যাসল্যাম্পে / মায়াবীর মতো জাদু বলে'—এবং কল্পনা-সমৃদ্ধ উপমা : 'একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে, নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মতো'—ইত্যাদি আসলে বাস্তব নগর চিত্রকেই ফুটিয়ে তোলার জন্যে সৃজিত। পরাবাস্তবতার লক্ষণ যে 'আপাত অসংলগ্নতা' 'স্বপ্ন-মগ্নতা' ও 'জাগর চৈতন্য' আলোচ্য কবিতা-টিতে আসলে তা-ও অনুপস্থিত। মান্নান সৈয়দের চেতনা এবং বোধেও তা ধরা পড়েছে, তাই তিনিও বলেছেন :

> রাত্রি কবিতার বিরুদ্ধে একজন সমালোচক স্তবকগুলির অলগ্নতার অভিযোগ এনেছিলেন। আপাতদৃষ্টে তাই : অলগ্ন, সিঁড়িহীন ও পরম্পরারহিত। কিন্তু সমগ্র কবিতাটি পড়ে উঠলে সমগ্র একটি অভি-ঘাত সৃজিত হয় না কি ? নৈশচিত্রাবলীর মধ্য দিয়ে এক অর্থাভাস দ্যোতিত নয় কি ? অবিচ্ছিন্ন বাকপ্রতিমাচয় কি মনে হয় না একটি স্বর্ণসূত্রে গুচ্ছীকৃত হলো ? (পৃঃ ৭৫)

আসলে আলোচ্য-পরিচ্ছেদে মান্নান সৈয়দ পরাবাস্তবতার সংক্রামের লক্ষণ এবং উদাহরণ হিসেবে জীবনানন্দের যে-সব কবিতা, কবিতাংশ এবং পংক্তির উল্লেখ করেছেন, আমার বিবেচনায়, সেগুলো আসলে কল্পনা-প্রতিভারই অবদান এবং কবিতা-সত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। 'কবিতা-সত্য' ও তো মূলতঃ কল্পনা-প্রতিভারই সৃষ্টি। মান্নান সৈয়দ এ-সবকেই পরাবাস্তবতার লক্ষণ বলে বিবেচনা করেছেন, তাই তাঁর মন্তব্য :

> 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী' কবিতা গ্রন্থদ্বয়েই কবিতা সত্যময় কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন অধিকপরিমাণে। ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে কবিতা সত্যের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই, তবে ইতিহাস-চেতনা কবিতা-সত্য উপলব্ধির পথে কবিকে সাহায্য করেছিলো। ঐ কবিতা সত্যই কবিকে পরাবাস্তব কবিতার নিকটে নিয়ে গিয়েছিলো। (পৃঃ ৭২)

আলোচ্য গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশের কবিতার 'শারীরবৃত্তিক' আলোচনায় এবং কবিতার শিল্পরূপের বিচারে আবদুল মান্নান সৈয়দ এমনিভাবে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে পরিক্রমা করেছেন, বিভিন্ন কবিতার বহিরঙ্গে ও আন্তরভাগে বিশ্লেষণী-দৃষ্টি ও উদভাবনী-আলো ফেলে জীবনানন্দের সৃজনকর্মে কিভাবে উপজীব্য বিষয় ও বক্তব্য, জীবনবোধ ও চেতনা নানা রূপরীতিতে স্বপ্ন-কল্পনার পথ ধরে শিল্পিত-বিন্যাস পেয়েছে, সৃজন করে এনেছে উপমা-উৎপ্রেক্ষা চিত্র-কল্পের অনুপম উপহার—তাও দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর আলোচনা বিষয় নিরপেক্ষ নয়, কিন্তু কবিতার বিষয়ের চেয়ে এর শিল্পরূপের স্বরূপ-বিশেলষণেই তাঁর প্রচেষ্টা অধিক নিয়োজিত। এদিক থেকে মান্নান সৈয়দের 'শুদ্ধতম কবি' অনন্য-বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও কবিমানসসম্পর্কিত আলোচনায় এর আগে এমন ব্যাপকভাবে অন্য কেউ কবিতার বহিরাঙ্গিক ও আভ্যন্তরীণ রূপৈশ্বর্যের পরিচয় এমন সূক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর পর্যায়ে এমন নৈপুণ্যের সাথে উদঘাটন করেন নি। তাঁর রূপ-সন্ধানী দৃষ্টি এবং সৃষ্টিধর্মী আলোচনা জীবনানন্দ দাশের বহুলপঠিত এবং নানাভাবে আলোচিত কবিতাকেও পাঠকের সামনে নতুন তাৎপর্যে উপস্থাপিত করে, নতুন রসাস্বাদ জোগায়। জীবনানন্দ দাশের কল্পনা-প্রতিভা মান্নান সৈয়দের আলোচনার সাহায্য-সূত্রে পাঠকের কল্পনা-প্রতিভাকে উজ্জীবিত করে—তার সৌন্দর্য-কল্পনাকে পরিতৃপ্তি দেয়। এখানেই মান্নান সৈয়দের গ্রন্থের সৃজনধর্মী বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ-সব দুর্লভ গুণ সত্ত্বেও, আমার বিবেচনায় তাঁর রচনারীতির অন্যতম ত্রুটি এর অতি 'সংক্ষেপন'—অনাবশ্যক ইঙ্গিতধর্মিতা। সমগ্র গ্রন্থে তিনি জীবনানন্দের কবিতা এবং প্রসঙ্গ-সূত্রে কবিতা-বিষয়ে অনেক বক্তব্য এবং মন্তব্য উপস্থিত করেছেন, কিন্তু তুলনামূলক আলোচনায়, প্রতি-তুলনায়, কবিতা ও কবি-মানসের প্রকৃতিধর্ম এবং পালাবদলেব স্বরূপ বিশ্লেষণে, সমগ্র বাংলা কাব্যের—বিশেষতঃ জীবনানন্দের পূর্বসূরী এবং সমসাময়িক কবিদের কবিমানস ও কবিতার প্রাসঙ্গিক আলোচনায় তিনি তাঁর বিচিত্রবিধ মন্তব্যের এবং উল্লেখের প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ উপস্থিত করেননি। ফলে, মন্তব্যের এবং উল্লেখের প্রাসঙ্গিকতা, সম্বন্ধসূত্র ও যথার্থতা সর্বক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য এবং অনুভবযোগ্য হয়ে উঠে না। মনে হয়, তাঁর গদ্যরীতির চারিত্র্যধর্ম এবং 'স্বতন্ত্র হয়ে উঠা'র সাধনাও এর

জন্যে অনেকখানি দায়ী। মান্নান সৈয়দের গদ্য সৃষ্টিধর্মী, কিন্তু বড় বেশী ভঙ্গী-প্রধান। প্রত্যক্ষ বক্তব্যকে কিছুটা পরোক্ষে উপস্থাপনই যেন তার প্রবণতার অন্তর্গত। বক্তব্যে সর্বত্র অভিনবত্ব, বিশ্লেষণে নবীনতা না থাকলেও, তিনি গদ্যরীতিতে এই অভিনবত্ব এবং নবীনতা যেন চারিয়ে দিতে চান। তাই, 'জীবনানন্দ দাশের মুখ্য অবলম্বন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, কিন্তু তা সত্ত্বেও, অন্যান্য ছন্দে যে তিনি কবিতা রচনা করেন নি তা নয়।''— এই অতি সরল বক্তব্য বিষয়কে মান্নান সৈয়দ উপস্থিত করেন এই ভাষায় ও ভঙ্গিতে: মুখ্য অবলম্বন তাঁর, জীবনানন্দ দাশের, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ; তত্রাচ অপরাপর ছন্দেও যে তিনি কবিতা রচনা করেন নি তা নয়।' (৩ পৃঃ)। শুধু ইংরেজী-বাক্যবন্ধের অনুসরণ নয়, ইংরেজী শব্দের রূপান্তরের দিকেও তাঁর প্রবল-প্রবণতা। তাই তিনি 'অর্থপূর্ণ' না লিখে 'অর্থগর্ভবতী, লেখেন, উজ্জ্বলকে নির্দ্বিধায় বানিয়ে নেন উজ্জ্বলন্ত। বাক্যবন্ধের এই জটিলতা, শব্দগঠন ও ব্যবহারের এই ইংরেজিয়ানা নিঃসন্দেহে তাঁর রচনার পাঠককে কিছুটা ক্লান্ত করে। কিন্তু ধৈর্য না হারিয়ে কেউ যদি তাঁর গদ্য রচনার স্তরে স্তরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন তাহলে তিনি খুঁজে পাবেন সৃষ্টিধর্মী গদ্যের অনুপম উপহার:

> জীবনানন্দে এই ভিতরটান, এই কল্পনার ব্যবহার রেল লাইনের মতো সমান্তরাল নয়—বরং এতোদিনকার মৃত্তিকাবদ্ধ রেল লাইন ছেড়ে তাঁর কল্পনার পাগল ট্রেনগাড়ী অপরিচিত দেশে নেমে যায়, যেখানে এমন কি বাংলাদেশের নিসর্গপ্রকৃতির মধ্য থেকে অন্য এক স্বপ্ন-স্বর্গাভাস উঁকি মারে।

—কিন্তু তবুও বলবো, মান্নান সৈয়দের গদ্যরীতি তাঁর বক্তব্যকে সর্বক্ষেত্রে সাধারণ পাঠকের মনে গ্রাহ্য হতে দেয় না, তার চেতনায় সংক্রমিত করে না। এ নিঃসন্দেহে গদ্যের—বিশেষতঃ বক্তব্যপ্রধান গদ্যের প্রধান ত্রুটি। গদ্য—তা' যতই শিল্পরচনা হোক না কেন, কিছু না কিছু বক্তব্য উপস্থিত করে। অতএব, এ-জাতীয় গদ্যের রূপ সরল অথচ সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়াই প্রার্থিত।